# বিদ্রোহী জাতক

শফীউদ্দীন সরদার

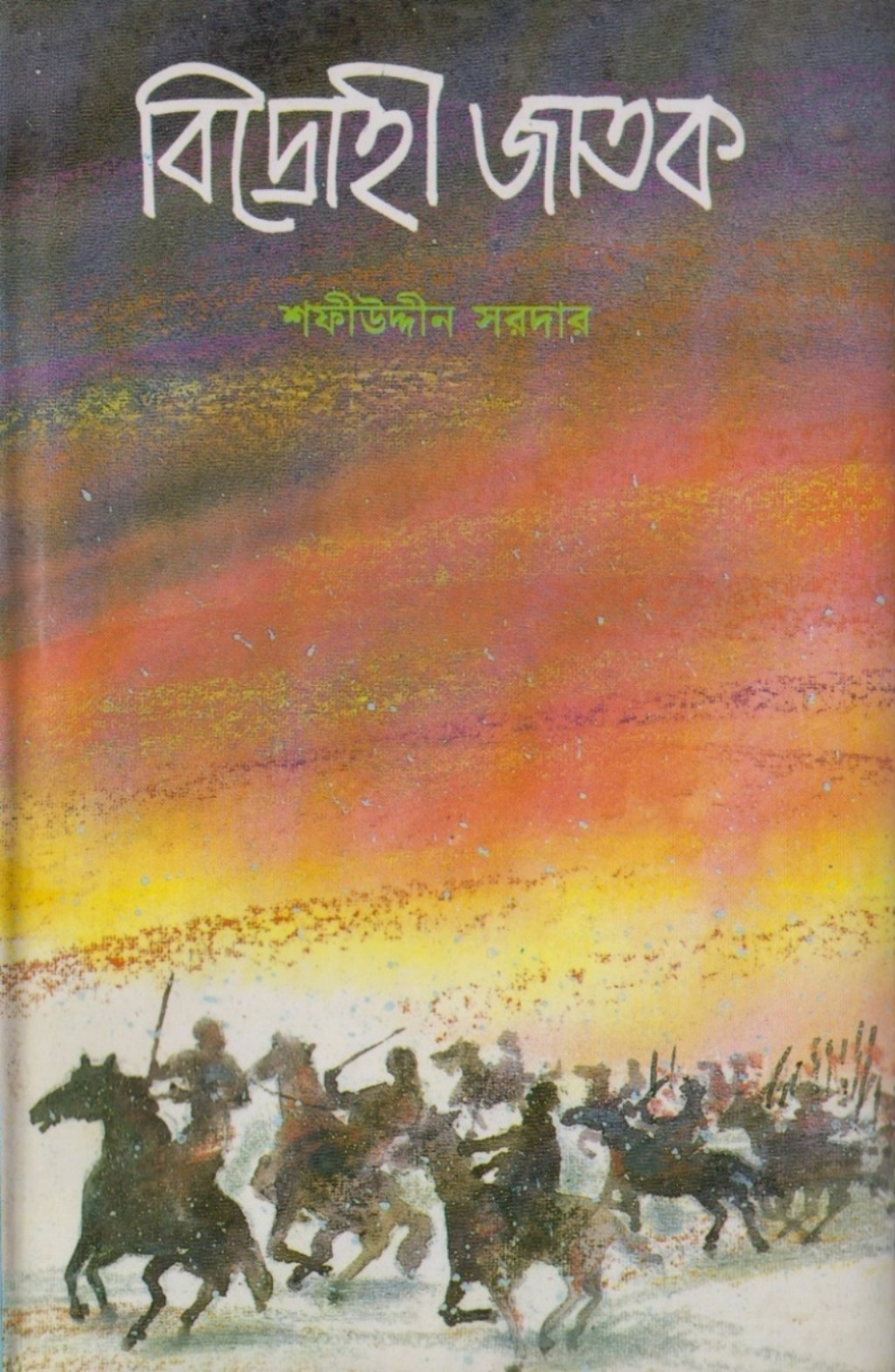

পারিবারিক গ্রন্থাগার
জামরীনা বিনতে [illegible]

# বিদ্রোহী জাতক

সৌজন্য কপি

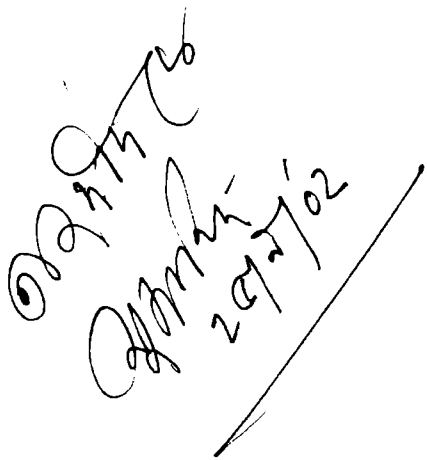

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

# বিদ্রোহী জাতক

শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

বিদ্রোহী জাতক
শফীউদ্দীন সরদার
**প্রকাশক**
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৪০২৪১০
**প্রথম প্রকাশ**
ভাদ্র ১৪০০
আগস্ট ১৯৯৩
বাসাপ প্র- ৫০
**প্রচ্ছদ**
হামিদুল ইসলাম
**মুদ্রক**
মিনার্ভা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
**দাম**
একশত পঞ্চাশ টাকা (সাদা)
আশি টাকা (নিউজ)

Bidrohi Jatak
by Sofiuddin Sorder
Published by
Abdul Mannan Talib
Bangla-Shahitta Parishad
171, Bara Magh Bazar, Dhaka-1217
**Price :**
Taka : 150.00 (white)
80.00 (News)

www.pathagar.com

## বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত
## অন্যান্য উপন্যাস

| | |
|---|---|
| অরণ্যে অরুণোদয় | জামেদ আলী |
| লাল শাড়ী | জামেদ আলী |
| মুনীরা | জামেদ আলী |
| আল্লার পথের সৈনিক | নাজিব কিলানী |
| রক্তরঞ্জিত পথ | নাজিব কিলানী |
| রায় নন্দিনী | ইসমাইল হোসেন শিরাজী |
| জেগে আছি | নূর মোহাম্মদ মল্লিক |

www.pathagar.com

www.pathagar.com

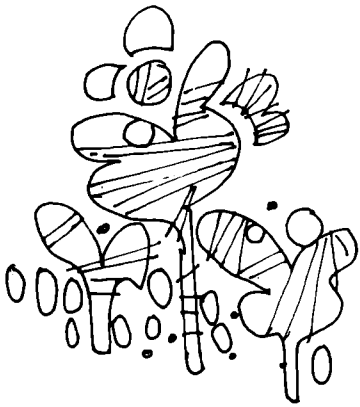

# বিদ্রোহী জাতক

শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ১

এইযে, শুনুন! শুনতে পাচ্ছেন?

জি, আমাকে বলছেন?

আপনি ছাড়া আর কেউ আছে এখানে?

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে নজর দিলো তাজউদ্দীন। দেখে নিয়ে বললো–নাতো, আর কেউ নেই।

তটিনীর হাসি পেলো। আলতোভাবে দাঁতের তলে ঠোঁট ফেলে বললো–তাহলে আপনাকেই বলছি।

সুবেহ্ সাদিকের সাথে সাথেই তাজউদ্দীন হররোজ ঘুম থেকে ওঠে। ফজরের নামাজ আদায় করে কয়েক কদম হাঁটে। আঁধারটা ফিকে হয়ে এলেই সে মজবুত হয়ে তাঁতের পাশে বসে। শুরু হয় খটাশ্ খটাশ্ আওয়াজ। বৈঠকখানার বারান্দায় একাই বসে কাপড় বোনে তাজউদ্দীন। নও–মুসলিম মরিয়ম ওরফে মমতা বিশ্বাসের সংসারে সে বসে বসে খেতে চায়না। খেটে খেতে চায়।

তটিনী বিশ্বাস পাশের ঘরেই শোয়। তাঁতের এই খটাশ্ খটাশ্ আওয়াজে হররোজ ঘুম ভাঙ্গে তটিনীর। পয়লা পয়লা তটিনী বিশ্বাস বিরক্তি বোধ করতো। এখন আর করে না। এখন তার সয়ে গেছে। ঘুম ভাঙ্গলে আবার সে পাশ ফিরে শোয়। আর একদফা ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা উঠলে ওঠে। আজও তাই করলো। কিন্তু আজ আর কিছুতেই ঘুম চোখে এলো না। গতরাতের ঘটনায় কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। এপাশ ওপাশ করতে করতে অনেক সময় কেটে গেল। উদীয়মান সূর্যের বিচ্ছুরিত আভায় পূব আকাশ রোশনাই হয়ে উঠলো। শয্যা ছেড়ে অগত্যা উঠে এলো তটিনী। চোখে–মুখে পানি দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঘটনাটা সঠিকভাবে জানার জন্যে সে তার জেঠা মশাইয়ের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।



www.pathagar.com

তাজউদ্দীনের সামনে দিয়ে পথ। কিছুটা কৌতূহলের বশেই সে তাজউদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। লোকটা যে একেবারেই-না-লায়েক, কান্ডজ্ঞানহীন নির্বোধ, সে তা জানতো। তার প্রশ্নের জবাবে সে যখন চারদিক দেখে নিয়ে বললো-না, সে ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তটিনীর হাসি পেলো। সে হাসিমুখে বললো-তাহলে আপনাকেই বলছি।

হাতের কাজ বন্ধ করে তাজউদ্দীন নড়ে চড়ে বসলো। বললো-আমাকে? জি, বলুন!

তটিনী বললো-গতরাতে হাতেম খাঁর বাড়িতে ফৌজী হামলা হয়েছিল, জানেন?

জি, জানি।

তারা নাকি ওপাড়ার মুসল্লীদের খতম করতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কে একজন কোথা থেকে এসে তামাম ফৌজীলোকদের একাই লাঠিপেটা করে গ্রাম থেকে নামিয়ে দিয়েছে-কথাটা কি ঠিক?

খানিকটা ঠিক।

মানে?

একা সে অতটা পারতো না। মুসল্লীরাও লাঠি হাতে তার পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছিল বলেই সে পেরেছে।

ঐ এক কথাই হলো। লোকটা আগেই এসে সেপাইদের পাল্টা হামলা না করলেতো মুসল্লীরা লাঠি ধরার সাহসই পেতোনা!

তা হয়তো পেতোনা।

তাজ্জব! কোথা থেকে এলো লোকটা?

অন্ধকারের মধ্যে কেউ সেটা ঠাহর করতে পারেনি।

কেউ কেউ আবার বলছে-লোকটা নাকি অনেকটা আপনার মতো দেখতে!

তাই বলছে?

তাইতো কেউ কেউ বলছে!

তটিনী মুখ টিপে হাসতে লাগলো। কোন দিকে না চেয়ে তাজউদ্দীন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে বললো-তাহলে তো আমার নসীবটা খুব শানদার, না কি বলেন?

কেন?

এতবড় একটা তারিফের হকদার হওয়ার মওকা-

সে গুড়ে বালি!

তটিনী বিশ্বাস উপেক্ষার সাথে বললো। তাজউদ্দীন প্রশ্ন করলো কেন?

হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ইষৎ ঝাঁকুনি দিয়ে তটিনী বিশ্বাস বললো-তারিফের হকদার হতে গেলে কিছুটা হিম্মত থাকা চাই। আপনাকে তেমন হিম্মতদার কেউ ভাবলে তো?

কেউ তা ভাবে না?

তারা কি কেউ পাগল?

তাহলে আর বলছে কেন?

www.pathagar.com

কতকটা আপনার মতো দেখতে, সেই কথা বলছে। আপনিই সেই লোক–সেটাতো কেউ বলছে না।

তাজউদ্দীন আবার একটু নড়েচড়ে উঠলো। বললো–তাহলেও আমাকে ভাগ্যবান বলতে পারেন।

কি করে?

কোন ঝুটঝামেলা এসে আমার ঘাড়ে চাপছে না।

ক্ষণিকের জন্যে তটিনী বিশ্বাস নীরব হয়ে গেল। এক নজরে কিছুক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে বললো–যতটা বোকা ভাবতাম, ঠিক ততটা বোকা নন দেখছি। কিছু হুশবুদ্ধিও আছে!

তটিনীর অধরে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। তাজউদ্দীন বললো–জি?

তটিনী এবার খানিকটা হুকুম করেই বসলো। বললো–চোখকান খোলা রাখবেন সব সময়। দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে এখন।

অতঃপর সে হন হন করে তার জেঠা মশাইয়ের বাড়ির দিকে চলে গেল।

মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে বাংলামূলুকে প্রধানত হিন্দুরাই বাস করতো। কারণ, বাংলামুলুকে বসবাসকারী বৌদ্ধরা শংকরাচার্যের হিন্দু ধর্ম সংস্কারের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবে ইতিমধ্যেই পূর্বদিকে সরতে সরতে সোনারগাঁ হয়ে আরাকান এবং আরাকান হয়ে অনেকেই দূরপ্রাচ্যে চলে যায়। মুসলমানদের হুকুমাত প্রতিষ্ঠা হওয়ার ওয়াক্তে কিছু বহিরাগত মুসলমান এদেশে এলেও, তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। এদেশের মুসলমানদের বিপুলাংশই ধর্মান্তরিত মুসলমান। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা মুসলমান। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ–বিন–বখতিয়ার খলজীর অভিযানের সাথে সাথেই বাংলামুলুকে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান সুফী সাধক ইসলাম প্রচারের ইরাদায় সমুদ্র পথে বাংলামুলুকে আসেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে খানকাহ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান খুলে ইনসানের খেদমত ও ইসলামের মাহাত্ম প্রচার করতে থাকেন।

সময়টাও অত্যন্ত অনুকুল ছিল তাঁদের পক্ষে। বল্লাল সেন সৃষ্ট কৌলীন্য প্রথার বা শ্রেণীভেদের নিষ্পেষণে এই সময় মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচারে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছিল। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়েরা মানুষের ন্যূনতম ইযযতও বৈশ্য আর শূদ্রদের দিতোনা। অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় করে রেখে ইতর প্রাণীর কাছাকাছি একটা জীব বলে তারা এদের গণ্য করতো। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে নাজাত পাওয়ার জন্যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা উন্মুখ ছিল এই সময়। ইসলামের সাম্যবাদের সৌন্দর্যে আর জীবন ব্যবস্থার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বৈশ্য এবং বিশেষ করে শূদ্রেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমান শাসন এদেশে কায়েম হওয়ার পর এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়ে ওঠে। বস্তুত পরবর্তীতে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত সাম্যবাদের হাওয়া



www.pathagar.com

এসে হিন্দুধর্মে না লাগলে, কুলীন হিন্দু ছাড়া নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর হিন্দুর কোন অস্তিত্বই এদেশে থাকতো না।

ইলিয়াসশাহী হুকুমাতের শেষের দিকে এই উপমহাদেশের বিখ্যাত দরবেশ হজরত নূর কুতুব-ই আলম সাহেবের খানকা শরীফ অত্যন্ত মশহুর হয়ে ওঠে। আর্তের আশ্রয়, অসহায়-এতিমদের আবাসস্থল এবং শিক্ষা ও নীতি আদর্শের পীঠস্থান হিসাবে তাঁর খানকাহ্ শরীফ শুধু মুসলমানদেরই নয় অনেক হিন্দুরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করে। আশেপাশের মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু পরিবার ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এই সুফী সাহেবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

বাঁশবাড়ির বিশ্বাস পরিবার, এই সময়ের এমনই একটা পরিবার যার বৃহত্তম অংশটাই ইসলাম গ্রহণ করে। বিশ্বাসেরা তিন ভাই মহেশ্বর বিশ্বাস বীরেশ্বর বিশ্বাস, সুরেশ্বর বিশ্বাস। পৃথক অন্নে বাস। একই ভিটেয় তিন ভাইয়ের লাগালাগি বাড়ি। বিশ্বাসেরা বাঁশবাড়ির বর্ধিষ্ণু পরিবার। ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী লোক। রুচিশীল ও মার্জিত। এতদসত্ত্বেও শ্রেণীতে বৈশ্য হওয়ার কারণেই এঁদের চেয়ে বিষয়বিত্তে জ্ঞানেগুণে, রুচি-আচরণে -সর্বতোভাবে খাটো কয়েকঘর ব্রাহ্মণের মর্জির ওপর এঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ নির্ভরশীল ছিল। গ্রামের সামাজিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে এদের কোন কতৃত্বই ছিল না। বিচারে, আচারে, পার্বণে, অনুষ্ঠানে এঁদের স্থান ছিল সব সময়ই নীচে শূদ্রদের পাশে। ব্রাহ্মণদের হুকুম তামিল করা ছাড়া সামাজিক অনুশাসনে এদের কোন ভূমিকাই ছিল না।

তবু তাঁরা এই অবস্থা মেনে নিয়ে দিনগুজরান করছিলেন। বিস্ফোরণ ঘটলো এক মর্মান্তিক ঘটনায়। মেঝোভাই বীরেশ্বরের মেয়ে রুক্ষিণীকে বিয়ে করতে এসে পাওনা গন্ডার গোলমালে বিয়ের আসর থেকে বরপক্ষ উঠে যায়। আর যায় কোথায়। ব্রাহ্মণেরা সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষিণীকে পাতকী বলে ঘোষণা দিয়ে বীরেশ্বরকে একঘরে করে এবং তাঁর নলজল বন্ধ করে দেয়। নিজের ভাইদের পরিবারের সাথেও বীরেশ্বরের পরিবারের উঠাবসা বন্ধ করে ব্রাহ্মণেরা। ফলে রুক্ষিণীর পিতামাতার জীবনে এক চরম দিগ্‌দারী নেমে আসে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইতে গেলে ব্রাহ্মণেরা যে ফর্দ দাখিল করে, তাতে বিষয়বিত্ত-ভিটেমটি তামাম কিছু বেচলেও সে পরিমাণ অর্থ সংকুলান হয় না। অবশেষে শোকে দুঃখে বীরেশ্বর বিশ্বাস অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। বীরেশ্বরের স্ত্রী মমতা বিশ্বাসও শয্যা গ্রহণ করেন।

তার জন্যে পিতামাতার এই পরিণাম সহ্য করতে না পেরে রুক্ষিণী শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বীরেশ্বরের দুইটি মাত্র সন্তান ছিল। এক ছেলে আর এই মেয়ে রুক্ষিণী। অল্প কিছুদিন আগে জোয়ান ছেলেটি সর্পাঘাতে মারা যায়। এবার রুক্ষিণীও আত্মহত্যার চেষ্টা করলে বড়ভাই মহেশ্বরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। গাঁয়ের অধিকাংশ শূদ্রেরা এবং কয়েক ঘর বৈশ্যেরাও ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এবার তিনিও ভ্রাতৃবধূ মমতাকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মহেশ্বর বিশ্বাস মুহসীন বিশ্বাস, মমতা বিশ্বাস মরিয়ম বিশ্বাস এবং রুক্ষিণী রোকেয়া বিশ্বাস নামধারণ করেন। মুহসীন বিশ্বাসের পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরাও এইভাবে বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর পরই



www.pathagar.com

তিনি একজন মুসলমান সৎপাত্রের সাথে ধুমধাম করে রোকেয়া ওরফে রুক্মিণীর বিয়ে দিয়ে দেন।

এ ঘটনা কয়েক বছর আগের। ছোটভাই সুরেশ্বর বিশ্বাস এ সময় রাজধানীতে ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনিও ধর্মান্তরে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বটে, কিন্তু পান্ডুয়ার হকুমাতের এক ব্রাহ্মণ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কর্মরত থাকায় চাকুরী হারানোর ভয়ে তিনি দোটানায় পড়ে যান। কয়েক বছর পর তিনি যখন শমশের বিশ্বাস নাম নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবেন বলে মনোস্থির করলেন, ঠিক তখনই পান্ডুয়ার হকুমাতের পুরোপুরি ক্ষমতা রাজা গণেশ নিজের হাতে নিয়ে এদেশ থেকে মুসলমান উচ্ছেদের অভিযানে ব্রতী হন। রাজা গণেশ এযাবত পরোক্ষভাবে সর্বময় কর্তা হয়ে থাকলেও, পান্ডুয়ার নাম-কা-ওয়াস্তে সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে অপসারণ করে এবার প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতাসীন হন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার আজন্ম আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। ফলে এই হকুমাতের অধীনে চাকুরীরত থেকে জান এবং চাকুরী-এই দুইটিই হারানোর আশংকায় ইসলাম গ্রহণের দুঃসাহস সুরেশ্বর আর করেন না।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করলেও এবং একই ভিটেয় অবস্থিত তার মুসলমান জ্ঞাতিদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক না রাখলেও, আন্তরিকতার দিক দিয়ে তিনি তাঁর ভাইদের পরিবারের সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। তটিনী বিশ্বাস এই সুরেশ্বরের কন্যা।

তটিনীর জেঠামশাই মুহসীন বিশ্বাস ব্যবসায়ী মানুষ। কাপড়ের ব্যবসায় তিনি অনেক টাকা খাটান। তাঁর নিজের একটা মস্তবড় কারখানা আছে তাঁতের। অনেক লোক খাটে সেখানে। এ ছাড়াও তিনি অন্যদের বুনানো কাপড় নগদ টাকায় কেনেন। তামামগুলো একত্র করে পাঠিয়ে দেন মহাজনদের কাছে। মহাজনেরা পাঠিয়ে দেন বন্দরে। কাপড় ওঠে জাহাজে। চলে যায় নানা দেশে-সুমাত্রায়, জাভায়, সিংহলে, পারস্যে, আরবে। বাংলামুলুকের সূতীবস্ত্রের বেজায় চাহিদা বাইরে। ব্যবসায়ীরা কাপড় বেচে অনেক টাকা কামায়। সে টাকার হিস্সা পায় তাঁতীরা। হিস্সা পায় তাজউদ্দীনও।

দাওয়ায় বসে মুহসীন বিশ্বাস ভাবছিলেন। মহাজনদের কাছে মাল পাঠানোর তারিখ আজ। সপ্তায় একবার করে মাল পাঠান মুহসীন সাহেব। নৌকা যোগে মাল যায় মহাজনদের ঘাটে। মুহসীন সাহেবের মতো আরো অনেক ব্যবসায়ীই মাল পাঠান সেখানে। অনেক দূরের পাল্লা। এককভাবে কারো নৌকা যায় না। জোট বেঁধে অনেক নৌকা এক সাথে ছাড়ে। লুটেরাদের হাতে কয়েকবার দাগা খাওয়ার পর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ব্যবসায়ীরা। শুধু কাপড়ের নাওই যায় না। ধান, চাউল, তিল তিসির নৌকাও এক হাট থেকে অন্য হাটে, এক গঞ্জ থেকে অন্য গঞ্জে যায়। জাহাজভর্তি ফসল যায় বিদেশেও। অঢেল ফসল বাংলামুলুকে। তিন তিন বার ফসল ফলে বছরে। দামও খুব সস্তা। এই ফসল বাইরে পাঠালে অনেক মূল্য পাওয়া যায়। সেই পয়সায় বাইরে থেকে সোডা-কেরোসিন-মস্লা এনে বেনেতী দোকান খুললে পয়সা আরো বাড়ে। তাই কৃষিকাজের পাশাপাশি চুটিয়ে ব্যবসা চালায় এ মুলুকের লোকেরা।

ভোর হওয়ার সাথে সাথেই নৌকায় মাল তোলা শেষ হয়েছে। হিসেব বুঝে দেয়ার জন্যে বিশ্বাস সাহেবের কর্মচারীরা হুটপাট শুরু করেছে। দেরী হলে অন্য সব নাও ছেড়ে দেবে। কিন্তু



www.pathagar.com

বিশ্বাস সাহেবের কিছুতেই আজ উৎসাহ নেই। লাভ লোকসানে মন নেই। হিসাবের ফর্দটায় এক পলক চোখ বুলিয়েই কর্মচারীদের বিদায় করলেন বিশ্বাস সাহেব।

সকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত পেরেশান আছেন। অশান্তিতে একেবারেই কাহিল হয়ে পড়েছেন। ধন-সম্পদ কোন কিছুরই অভাব নেই এদেশে। অভাব শুধু নিরাপত্তার। বিশেষ করে মুসলমানদের কি দিয়ে কি হয়ে গেল আচানক। এ অবস্থা এ মুলুকে কোনদিনই ছিল না। মুসলমান সুলতানদের আমলে হেফাজতির অভাবে সাধারণ মানুষ কোনদিন ভোগেনি। মুসলমানেরা তো নয়ই। হিন্দুরাও নয়। হেফাজতির প্রশ্ন নিয়ে কোন হিন্দুকে এক লহমার জন্যেও সোচ করতে হয়নি। তারা নির্ঝঞ্ঝাটে ঘর সংসার করেছে। সে নিজেও তো হিন্দু ছিল কদিন আগে। সামাজিক অশান্তিটা ছাড়া এ ধরনের কোন ভাবনাই মাথায় তাদের আসেনি। এদিক দিয়ে, মায়ের কোলে থাকার মতো নিশ্চিন্তে ছিলেন। একদিনের কথা নয়। প্রায় দেড় দুইশো বছর ধরে এই অবস্থার সাথেই হিন্দু মুসলমান সকলেই পরিচিত। অখন্ড ক্ষমতা হাতে থাকা সত্বেও একমাত্র প্রচার ছাড়া হাতিয়ার হাতে ইসলাম নিয়ে কোন হিন্দুর কাছে কেউ কখনও আসেনি। রাজা গণেশ তক্তে বসার সাথে সাথেই একি গজব নেমে এলো দেশে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রজাদের ঘরে আজ একি এক নিদারুণ আতংকের হাতছানি!

কর্মচারীরা বিদেয় হওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে মুহসীন বিশ্বাস এই ভাবনাই ভাবছিলেন। এই সময় তার সামনে এলো তটিনী। কোন ভূমিকা না করে সে সরাসরি বললো-জেঠামশাই, গত রাতের খবর কি বলুনতো! কি হয়েছিল ওপাড়ায়?

মুহসীন বিশ্বাস নজর তুলে তটিনীর দিকে তাকালেন। নজর তাঁর নিষ্প্রভ। বললেন-বড় নাখোশ খবর মা। ওপাড়ার ঐ মসজিদের পাশে হাতেম খাঁর বাড়িতে কিছু মুসল্লী এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বোস বাড়ির ওদিক থেকে তারা এখানে এসেছিল। খোঁজ পেয়ে রাজা গণেশের ফৌজ এসে রাতের অন্ধকারে তাদের ওপর চড়াও হয়।

কেন, কসুর কি তাদের?

রাজধানীতে হাজির হওয়ার জন্যে তাদের তলব দেয়া হয়েছিল। তারা হাজির হয়নি সেখানে।

কেন হাজির হলো না?

হলে কি আর ওয়াপস্ আসতে পারতো তারা! একটা না একটা কসুর দেখিয়ে তাদের খতম করে দেয়া হতো।

বলেন কি!

এমন ঘটনাতো হামেশাই ঘটছে এখন। কোন আলেম উলেমা আর সুফী ধরনের কোন লোক সেখানে গিয়ে আর ওয়াপস্ আসেনি। জ্ঞানী গুণী আর ধর্মভীরু মুসলমানদের আর কি কোন নিরাপত্তা আছে রাজধানীতে?

তাজ্জব!



www.pathagar.com

ঘটনাটা এতদিন রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এটা ক্রমেই গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামের অনেক নীরিহ মুসলমানদেরও এখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সূতোনাতা কারণ দেখিয়ে তাদের কোতল করা হচ্ছে।

সেকি কথা!

নানাদিক থেকে এমন পয়গাম হামেশাই আসছে এখন।

কারণটা কি জেঠা মশাই? দেশের রাজা প্রজার ওপর এমন জুলুম করবেন কেন?

কারণ ঐ একটাই। এদেশ থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করার এক বদখেয়াল রাজা গণেশের মগজের মধ্যে ঢুকেছে। তিনি এটা পুনরায় নির্জলা এক হিন্দুরাজ্য বানাবেন–এমনই এক খাহেশ হয়েছে এখন তাঁর। আর এই বদখেয়াল বাস্তবায়নের কারণেই তিনি এখন বেপরোয়াভাবে মুসলমানদের পেছনে লেগেছেন।

তাহলে তো বড় মুসিবতের কথা! তা ওপাড়ার ঐ মুসল্লীরা কোথায় এখন?

তারা অন্যত্র চলে গেছে।

ফৌজী হামলার হাত থেকে তারা রেহাই পেলো কিভাবে?

সবই আল্লাহর শান মা! তিনি কাউকে রক্ষে করলে, কার সাধ্যি তার গায়ে কাঁটার আঁচড় কাটে। আমরা যখন গেলাম তখন গোলমাল প্রায় থেমে গেছে। মুসল্লীরা বললেন–সেপাইরা এসে তাদের হামলা করার সাথে সাথে অন্ধকারের মধ্যে কে একজন কোথা থেকে তেড়ে এসে সেপাইদের ওপর লাঠি চালাতে শুরু করে। একজন সেপাই পড়ে যেতেই তার ঢাল তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে সে লোকটা সেপাইদের সাথে তুমুল লড়াই শুরু করে। সে কি তার বিক্রম! একজনের আক্রমণেই একদল সেপাই নাজেহাল হয়ে পড়ে।

তারপর?

তা দেখে হৈ হৈ হলো মুসল্লীদের। ওপাড়ার অন্যান্য মুসলমানেরাও হৈচৈ শুনে সেখানে এসে জুটেছিল। এবার সবাই লাঠি, শড়কী, বল্লম, বাঁশ–যে যা হাতের কাছে পেলো, তাই নিয়ে ঘিরে ধরলো সেপাইদের। সেপাইদের তুলনায় সংখ্যায় এরা অনেক। বেদম মার খেয়ে সেপাইরা শেষ পর্য্যন্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

তটিনী বিশ্বাস তন্ময় হয়ে কাহিনী শুনলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি যেন চিন্তা করলো। তারপর সে উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলো–লোকটা তাহলে কে, কেউ তা পয়চান করতে পারলো না?

মুহসীন বিশ্বাস বললেন–না। চোখ–নাক বাদে তার মাথা–মুখ সবটুকুই কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। সেপাইদের পিছে পিছে সেও নাকি অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তাহলে কে হবে লোকটা? আপনারা কি অনুমান করেন?

হয়তো ইসলামের কোন খাদেম। অনেক মুসলমান সেপাই এখন গোপন ভাবে কাজ করছে। চাকুরীচ্যুত হাজার হাজার সেপাইদের সবাইতো আর বসে থাকবে না মুখ বুজে?

তাহলে ঠিক তাই। তারাই কেউ হবে। কিন্তু জেঠামনি, আমি ভাবছি–সেপাইরা একবার যখন এ গাঁয়ে এসেছে, তখন আবারও তো আসতে পারে?



www.pathagar.com

তা পারেইতো।

আপনার জানের ওপরও তো তাহলে হুমকি আছে এখন?

তাতো আছেই।

তাহলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কিছু করছেন না আপনারা?

আমরা আর কি করতে পারি? সুফী সাহেবকে খবরটা জানিয়ে রাখা ছাড়া আপাতত আর করার কিছু দেখছিনে।

সুফী সাহেব মানে ঐ-.

হ্যাঁ। হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব।

খবর নিয়ে গেছে কেউ তাঁর কাছে?

না, এখনও কেউ যায়নি। আমার ওপরই ভার আছে লোক পাঠানোর। ভাবছি, তাজউদ্দীনকেই পাঠিয়ে দিই।

কাকে?

তটিনী বিশ্বাস বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। মুহসীন বিশ্বাস বললেন-তাজউদ্দীনকে।

তাজউদ্দীনকে! তার মতো একজন নালায়েক নির্বোধকে এই কাজে পাঠাবেন?

কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। সুফী সাহেবকে সেরেফ খবরটা জানানো। নালায়েক বা হুশবুদ্ধিহীন হলেও তাজউদ্দীন ইমানদার লোক। খুবই সৎ ছেলে। বিশ্বাসী লোক নাহলে এসব কাজে যাকে তাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। সুফী সাহেবের সাথে এখন যোগাযোগ করাটাও মস্তবড় অপরাধ। এটা ফাঁশ হলে বিপদ হবে।

তাহলে ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন তাকে সব। নইলে আবার গোলমাল করে ফেলবে। যে নির্বোধ লোক।

মুহসীন বিশ্বাস স্মিতহাস্যে বললেন-তা কি আর বলতে হবে মা? তাকে সব কিছু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে তবেই পাঠাবো। তা তুমি এই সাত সকালে কি মনে করে? এই জন্যেই?

হ্যাঁ জেঠামশাই রাতে এই খবর শোনার পর আর আমার ভাল করে ঘুম হয়নি। কি জানি কোন মুসিবত কোনদিক দিয়ে আবার আপনার ঘাড়ের ওপর আসে!

মুহসীন সাহেবের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো-ছেলের চিন্তা মায়েরা তো সব সময়ই করে। কিন্তু তোমার এই বুড়ো ছেলেকে নিয়ে তোমাকে এত পেরেশান হতে হবে না মা। ঐ একজনের রহম যদি থাকে, তোমার এই ছেলের কাছে যম-আজরাইল, যা-ই বলো, কেউ ভিড়তে পারবে না।

তটিনীর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন মুহসীন বিশ্বাস। তাঁর হাসির সাথে যোগ দিয়ে হেসে ফেললো তটিনীও।

তটিনী বাল্যবিধবা। গৌরী দানের সুর ধরে আট থেকে ন'বছরে পা দিতে না দিতেই তটিনীর বিয়ে দেন সুরেশ্বর বিশ্বাস। বরও কম বয়সের বালক। তার ছিল মিরগী রোগ। বরপক্ষ চালাকী করে এ খবরটা গোপন করে রাখে। বিয়ের পর দিন তিনেক যেতে না যেতেই মিরগী রোগে আক্রান্ত হয়ে নদীরঘাটে ডুবে মরে বর। আর বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ওয়াপস্ আসে তটিনী।



www.pathagar.com

সারা রাস্তা ঘুমিয়ে তটিনী বিশ্বাস শ্বশুরবাড়িতে যায়, আর বিধবা হয়ে আসার সময়ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ফিরে আসে। কি দিয়ে কি হয়ে গেল সেদিনও সে কিছুই বুঝতে পারেনি। আজও তার সে সব কথা স্মরণই তেমন আসেনা। বিধবা হয়ে আসার পর অনেক দিন কেটে গেছে। কেটে গেছে এক নাগাড়ে–তের চৌদ্দ বছর। দুরন্ত যৌবনের এক দুর্বিষহ বোঝা এখন টেনে বেড়াচ্ছে তটিনী। তার ওপর ভর করেছে সৃষ্টিছাড়া রূপ। শিশুকালেই তার রূপ দেখে নাম মাত্র দেনা পাওনায় তাকে লুফে নেয় বরপক্ষ। সে রূপ এখন ষোলকলায় বিকশিত। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভাবকেরা গোপনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। আরশীতে মুখ দেখে তটিনীও সময় সময় বিমনা হয়ে যায়। কিন্তু বড় কঠিন ধাতের মেয়ে এই তটিনী। এক অখন্ড ব্যক্তিত্বের আর প্রখর বুদ্ধি মত্তার অধিকারিনী সে। তার পরিচ্ছন্ন রুচি, দৃঢ় মনোবল আর মজবুত ব্যক্তিত্বের কারণে তাকে উত্যক্ত করার সাহস রাখেনা গোটা গাঁয়ের কেউই। সাহস রাখেনা পার্শ্ববর্তী কোন গাঁয়ের কোন লোক। তার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো হিম্মত চেনা জানা কোন লোকেরই ছিল না। অচেনারাও তা করতে গিয়ে চরমভাবে চুপ্‌সে গেছে। গাঁয়ের তামাম লোকই তাকে এখন আলাদা নজরে দেখে। হিন্দুরা ভাবে, ওটা তাদের মা চন্ডীর অবতার। মুসলমানেরা মনে করে–ওটা একটা নাগালের বাইরের আঙ্গুর ফল। ও আঙ্গুর টক। আইবুড়ো বিধবা মেয়ে নিয়ে এয়োতিরা বৃদ্ধারা স্বভাবতই যে কানাঘুষা করে, তটিনীর বেলায় শুরুতেই তারা খামুশ হয়ে গেছে। আর কোন উৎসাহই দিলে তাদের পয়দা হয়নি অতঃপর।

তটিনী এখন নিঃসংকোচে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। নিসঙ্গ নিশিথে তটিনীর মুখশ্রী হাতড়িয়ে বেড়ায় যারা সামনে পড়লে তারাও সসম্ভ্রমে তটিনীকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়ায়। নজর তাদের নুইয়ে পড়ে মাটির দিকে। তবুও রূপ বড় বালাই। দূর দূরান্তের লোলুপ দৃষ্টি থেকেই যায় তার দিকে। ওগুলোকে উপেক্ষা করেই চলতে হয় তটিনীকে।

তটিনীর দুই মা। সেপাই বাপ ছোট বউকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ুয়াতে বসত করেন। তটিনী আর তটিনীর মা গাঁয়ের বাড়িতে থাকেন এবং চাকর বাকর নিয়ে ঘর সংসার সামলান। সুরেশ্বর বিশ্বাস গাঁয়ে আসেন বছরে দু'একবার। ঘর–সংসার দেখার মতো কোন ফুরসুতই তিনি পাননা। তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকলেও তা নিয়ে আফসোস করতে হয়না তাঁকে। এক তটিনী এমন অনেক পুত্রের বাড়া।

মরিয়ম বিশ্বাস বাহির আঙ্গিনায় এসছিলেন। বাহির আঙ্গিনা বিশ্বাসদের একটাই। প্রশস্ত আর লম্বা। যার বাড়ির সামনে যে অংশ পড়ে সেই অংশই এক একজন ব্যবহার করেন তাঁরা। মরিয়ম বিশ্বাসের হিস্‌সাটা ঠিক মাঝখানে। সদ্যওঠা ফসলের তদারকির কাজে বাহির আঙ্গিনায় এসে মরিয়ম বিশ্বাস আঙ্গিনার এক প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন। আঙ্গিনার নীচেই সরকারী ডহর। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলাচলের রাস্তা। সেই রাস্তার দিকে নজর দিয়েই চমকে উঠলেন মরিয়ম বিশ্বাস। আঙ্গিনা থেকে বিশ–ত্রিশ গজ ফারাগে ডহরের ওপর মুহসীন বিশ্বাস কথা বলছেন যে নওজোয়ানের সাথে, সেই নওজোয়ানই মরিয়মের এই বিস্ময়ের কারণ। মরিয়মের বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল নওজোয়ানটি। মরিয়ম তার মুখ দেখতে পায়নি। কিন্তু তার



www.pathagar.com

পেছনটা–চুল–মাথা–ঘাড়–বিলকুল মরিয়মের মৃত পুত্র রবীন বিশ্বাসের মতো। তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম নেই কোথাও।

চমকে উঠেই ডহরের দিকে ছুটে এলেন মরিয়ম বিশ্বাস। স্বাভাবিক হুঁশবুদ্ধি লোপ পেয়েছে তখন তাঁর। মরিয়ম বিশ্বাস নিকটবর্তী হতেই মুহসীন বিশ্বাসের সাথে নওজোয়ানটিও তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালো। ঘনকৃষ্ণ কচি দাড়ির নীবিড় একটা আবরণ নওজোয়ানটির কচি মুখে থাকলেও মরিয়ম বিশ্বাস অবাক হয়ে দেখলো তার মুখমন্ডলের রং গঠনও অনেক খানি রবীন বিশ্বাসের মতোই। দাড়িটুকু না থাকলে একে রবীন বিশ্বাস বলে যে কারুরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সেই রকমই দপদপে উজ্জ্বল গায়ের রং, সেই রকমই চোখ–মুখ–নাক। রবীন বিশ্বাসের একটা মস্তবড় সম্পদ ছিল, তার কার্তিক প্রতীম চেহারা। এই ছেলেটির মধ্যেও এতটুকু ঘাটতি নেই সেই সৌন্দর্যের। ফারাগ বলতে এ ছেলেটি বয়সে খানিক বড় আর তার হাত পা এবং সিনাটা আরো অধিক বলিষ্ঠ। অপর পক্ষে, তার দৃষ্টিটাও আবার রবীনের মতোই লাজুক।

মরিয়মকে ছুটে আসতে দেখেই মুহসীন বিশ্বাস বুঝতে পারলেন কারণটা। বললেন, বউমা, তোমার মতো আমারও ঐ একই ভ্রম হয়েছিল। আর তাইতো এই ছেলেটাকে ডাক দিয়ে থামালাম। আশ্চর্য! মানুষের সাথে মানুষের এতটা মিল হয়!

মরিয়মের এতক্ষণে সম্বিত ফিরে এলো। মাথার কাপড় আরো খানিকটা টেনে দিয়ে বললেন–ছেলেটা কে বড় ভাই? নাম কি?

নাম তাজউদ্দীন। এর বাড়ি নাকি ঐ কাজল দীঘির ঐদিকে। বচপনকালে বাপ–মা হারিয়ে পান্ডুয়াতে আসে। সেখানে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মানুষ হয়। কয়দিন আগে সেই গোটা পরিবারটাই নাকি রাজা গণেশের ফৌজ খতম করে দিয়েছে। এ তখন বাড়িতে ছিলনা বলেই বেঁচে গেছে কোন মতে। এখন এ আশ্রয় আর কাজ কামের তালাশে এদিকে এসেছে। আপাতত একটা আশ্রয় এর প্রয়োজন।

মরিয়ম বিশ্বাস বললেন–আশ্রয়?

এবার তাজউদ্দীন নিজেই নত মস্তকে বললো–জি, মানে–কোথাও কোন কাজ কাম পেলে সেখানেই কাজ কাম করতাম আর থাকতাম।

মুহসীন বিশ্বাস বললেন–কি কাজ জানো তুমি?

তাজউদ্দীনের নতশির আরো একটু নত হলো। সে ইতস্তত করে বললো–মানে থাকতাম তো এক বড়লোকের বাড়িতে! তাঁরা খুব যত্ন করেই আমাকে লালন পালন করেছিলেন। তাই ক্ষেত খামার বা অন্যকোন কাজ ভাল করে শেখার মওকা পাইনি। তবে আমার মনের জোর আছে, দু'একদিন কোশেশ্ করলেই কৃষিকাজ, তাঁতের কাজ বা অন্য যে কোন কাজ–সব কিসিমের কাজই আমি ঠিক মতো করতে পারবো।

মরিয়ম বিশ্বাসের দিলটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। গোটা সংসারে একদম তিনি একা। দেখার মানুষ অভাবে সংসারটা তাঁর বিরান হয়ে যাচ্ছে। সবার ওপর, পুত্রশোক ভোলার মতো কোন অবলম্বনই নেই তাঁর। জামাইটা এলেও সংসার ফেলে দু'এক দিনের বেশী কোন বারেই



www.pathagar.com

থাকে না। আবেগের আধিক্যে তিনি ফস্ করে বলে ফেললেন–আমি যদি আমার সংসারে রাখি তোমাকে তুমি থাকবে বাবা?

তাজউদ্দীনের মুখ মন্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। এতটা কল্পনাও সে করেনি। তবু নিজেকে সংযত করে সে বললো–যে কোন খানে একটু ঠাঁই পেলেই আমার জন্যে সেটা আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ রহমত। কিন্তু কাজটা কি ধরনের হবে, আমি সেটা পারবো কিনা–সে সম্বন্ধে একটু–

এর জবাবে মুহসীন বিশ্বাস বললেন–সে তোমাকে ভাবতে হবেনা। যা তুমি পারবে তাই করবে। যা পারবে না, তা করার তোমার দরকারই হবে না।

কথাটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে না পেরে তাজউদ্দীন মুহসীন বিশ্বাসের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো–জি!

মুহসীন বিশ্বাস বললেন–তোমার আদব–আখলাকে কোন গলদ যদি না থাকে, তাহলে সুখেই থাকবে তুমি।

তাজউদ্দীন এবার চোখ নামিয়ে শরমিন্দা কণ্ঠে বললো–জি না, কোন বেয়াদপী আমি কখনও করি না।

বেশ। তাহলে আর কোথাও যাওয়ার তোমার দরকার নেই। তুমি আমাদের বাড়িতেই চলো।

দিলের চাঞ্চল্যে ভাশুরের মতামত না নিয়েই মরিয়ম বিশ্বাস তাজউদ্দীনকে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার ভাশুরকেও এ ব্যাপারে আগ্রহী দেখে তিনি খোশদিলে বললেন–আপনিও তাহলে আমার এ প্রস্তাব সমর্থন করেন বড় ভাই?

মুহসীন বিশ্বাস উৎসাহের সাথে বললেন–সমর্থন করি মানে! তুমি আগে এটা মুখ ফুটে না বললে, আমি নিজেই এ প্রস্তাব তোমার কাছে রাখতাম। তোমার তো একটা অবলম্বন দরকার। নিজের ছেলে নেই যখন, তখন পোষ্য নিতে দোষ কি! তাছাড়া, ছেলেটাকেও মোটামুটি নেকমান্দ বলেই মনে হচ্ছে।

তাজউদ্দীন এতক্ষণে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারলো, কি অবস্থায় পড়েছে সে। তার এই খোশ কিসমতির জন্যে সে মনে মনে আল্লাহ পাকের শোকর গোজারী করলো।

সেইদিনই মরিয়ম বিশ্বাসের সংসারে উঠে এলো তাজউদ্দীন। মরিয়ম বিশ্বাসের বৈঠকখানার ঘরটি এযাবত ফাঁকা পড়েই ছিল। ঝেড়ে মুছে মরিয়ম বিশ্বাস সেই ঘরেই তাজউদ্দীনের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজের সন্তানের মতো কাছে বসিয়ে খাইয়ে অনেকদিন পর অনেকখানি তৃপ্তি বোধ করলেন তিনি।

আহারের পর তাজউদ্দীন তার ঘরে এসে লম্বা একটা ঘুম দিলো এবং ঘুম থেকে সে একেবারে বিকেল বেলা উঠলো। অচেনা জায়গা। অন্য কোথাও না বেরিয়ে সে বাহির আঙ্গিনায় কিছুক্ষণ পায়চারী করলো। এরপর আঙ্গিনার এক প্রান্তে হেলে পড়া এক আমগাছের ডালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে তার অতীত আর বর্তমানের হিসাব মিলাতে লাগলো।

তটিনী বিশ্বাস সেদিন সকাল থেকেই নিজ মকানে ছিল না। ও পাড়ার এক আত্মীয়ের মকানে জরুরী কাজে আটকে ছিল। আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সে যখন নিজ বাড়িতে ফিরলো



www.pathagar.com

তখন আর অল্প বেলা বাকি। ডহর বেয়ে বাড়ির নীচে এসেই সে সবিস্ময়ে দেখলো–এক বলিষ্ঠ নওজোয়ান আঙ্গিনার মাথায় দাঁড়িয়ে। তাজউদ্দীন তার মুখোমুখিই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিল বলে তটিনীর আগমন তার দৃষ্টি গোচর হলোনা। এই ফাঁকে তটিনী তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলো। সে বুঝলো–চেহারাখানা দেখার মতোই বটে। এ ধরনের সুপুরুষ একমাত্র তার দাদা রবীন বিশ্বাস ছাড়া, জিন্দেগীতে সে আর কোথাও তেমন একটা দেখেনি।

বাড়ির ওপর উঠতে উঠতে সে ভাবতে লাগলো–কে এই নওজোয়ান! কোথা থেকে এলো এ! সেই সাথে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো–একমুখ দাড়িতেও মানুষের সৌন্দর্য এতটা বৃদ্ধি পায়!

আঙ্গিনায় উঠে এলে তটিনীর পদশব্দে চোখ তুললো তাজউদ্দীন। চোখাচোখি হতেই তাজউদ্দীন তার নজর অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। তটিনীও চোখ নামিয়ে দ্রুত পদে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলো।

গৃহে ঢুকেই তটিনী খোঁজ নিয়ে জানলো–আগন্তুকটি ক্ষণিকের মেহমান নয়, স্থায়ী বাসিন্দা। মেঝো জেঠীমা পোষ্য নিয়েছেন তাকে। সে এ বাড়িতেই থাকবে। এ খবরে তটিনী বিশ্বাস নাখোশও হলোনা, আবার পুরোপুরি খুশী হতেও পারলোনা। তার স্বাধীনভাবে চলাফেরার পথে এমন একটা সার্বক্ষণিক বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় সে বরং নাখোশই হলো খানিকটা। একটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। ভাবতে লাগলো–আগন্তুকের লোলুপ দৃষ্টি হয়তো তাকে হামেশাই বিব্রত করতে থাকবে। তার চেহারার সাথে আদব–আক্কেলের সামঞ্জস্য না থাকলে তটিনীকে হয়তো আরো অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থির মোকাবেলা করতে হবে।

কিন্তু যে ভয়ে তটিনী বিশ্বাস তটস্থ হয়ে উঠেছিল, কিছুদিন পর সে নিজেই সেই পরিস্থিতির কাঙাল হয়ে পড়লো। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তটিনীর অস্তিত্ব তাজউদ্দীনের গণ্যের মধ্যেই এলোনা বা তা আলাদা কোন গুরুত্বই তাজউদ্দীনের কাছে পেলোনা। লোলুপ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করা তো দূরের কথা, তটিনী বিশ্বাস তার নাকের ডগার ওপর অহরহ বিচরণ করলেও সে চোখ তুলে সেদিকে কোন দিনই চাইলো না। কালে ভদ্রে অকস্মাত চোখে চোখ পড়লেও, তাজউদ্দীনের ফেরানো নজর দ্বিতীয় বার তটিনীর দিকে ঘুরলো না।

আরো যা বিস্ময়কর তা হলো, তাজউদ্দীনের অস্বাভাবিক বাক–সংযম। অকারণে একটা কথাও সে কারো সাথে বলে না। কোন প্রকার প্রাণ চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তিও তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। একটা না একটা কাজের মধ্যেই সে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতে চায়। ইদানিং তাঁতের সরঞ্জাম পেয়ে সে সাকুল্লেই গায়েব হয়ে গেছে। বাইরে তাঁত আর ভেতরে পোষ্য মাতা ছাড়া সে আর কিছুই বোঝেনা। তার এই নির্লিপ্ততা নিয়ে অনেকেই টিকাটিপপনী কাটে। প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলার ইরাদায় হরেক কিসিমের পীড়ন উৎপীড়ন করে। কিন্তু তাজউদ্দীন নির্বিকার। একটু মুছকি হেসেই সে আবার হারিয়ে যায় কাজের মধ্যে।



www.pathagar.com

এসব থেকে দিনে দিনে তাজউদ্দীনের হুঁশবুদ্ধির স্বল্পতা সবার কাছে প্রতিষ্ঠিত হলো। সবাই ভাবলো–জন্মগত ভাবেই এ লোকটার হুঁশবুদ্ধি কম। আসলেই সে একটা নালায়েক ও নির্বোধ।

তটিনীরও ধ্যান ধারণা তার সম্বন্ধে পৃথক কিছু হওয়ার কোন অবকাশ ছিলনা। সে যে একটা সুদৃশ্য মাকাল ফল, এ সম্বন্ধে দিনে দিনে তটিনীও নিঃসন্দেহ হলো। তবে তাজউদ্দীন তার শিশুসুলভ সরলতার কারণে বিশ্বাস পরিবারের সকলের উপচে পড়া মহব্বত আর অফুরন্ত স্নেহ অর্জন করলো। তটিনীও তার প্রতি হৃদয়হীনা ছিলনা। তার একটাই মাত্র আফসোস্ আহা! এই চিত্তহারী চেহারার সাথে স্বাভাবিক হুঁশবুদ্ধি আর খানিকটা পৌরুষ থাকতো যদি! তটিনীর মতো এমন একটা জ্বলন্ত অগ্নি শিখা পাশে থাকা সত্বেও যার দিলে কিছুমাত্র তাপ পয়দা হয়না, হয় সে দিল মৃত, নয় সে দিল এমন পদার্থে তৈরী যা তাপ ধারণে অক্ষম।

এই ধারণা নিয়েই তটিনী বিশ্বাস ধীরে ধীরে খামুশ হয়ে গেল। তাজউদ্দীনের অস্তিত্ব তার কাছেও দিনে দিনে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে সামান্যতম বাক্যলাপও হলো না।

হলো একদিন অকস্মাত।

পোষ্যমাতা মরিয়ম বিশ্বাস তাজউদ্দীনের হাতে মাছ পাঠালেন তটিনীর মায়ের কাছে। এজমালী পুকুর থেকে আজ একটা মস্তবড় মাছ ধরা হয়েছে। মেঝবউ মরিয়মকে এই মাছ কুটে তিন শরিককে বেঁটে দেয়ার ভার দিয়েছেন মুহসীন বিশ্বাস। ছোট তরফের হিস্সা নিয়ে তাজউদ্দীন এসে তটিনীদের দেউড়ির সামনে দাঁড়ালো। কাউকে কোথাও না দেখে সে কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে একে ওকে ডাকতে ডাকতে দেউড়িটা পার হয়ে কিছুটা ভেতরে চলে এলো। তটিনীর মা তখন রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। বাড়ির চাকর কালাচাঁদও বাড়ির ভেতর ছিলোনা। ডাক শুনে তটিনীই এগিয়ে এলো এবং তাজউদ্দীনকে বাড়ির মধ্যে দন্ডায়মান দেখে অবাক হয়ে বললো–কি ব্যাপার! আপনি!

হাতে ধরা কুটা মাছের পোটলাটা তুলে ধরে তাজউদ্দীন বললো–মাছ।

কে পাঠিয়েছে?

আম্মা।

মেঝো জেঠীমা?

হ্যাঁ। আপনাদের পুকুরের মাছ।

ও, আচ্ছা– আচ্ছা। একটু দাঁড়ান–

তটিনী ছুটে গিয়ে একটা ডালা নিয়ে এলো। ডালা পেতে বললো–দিন, এখানে দিন।

তাজউদ্দীন তার দুই হাতে ধরা কলার পাতার পোঁটলাটা ডালার মধ্যে রাখলো। তটিনী লক্ষ্য করে দেখলো–তাজউদ্দীনের দুই হাতে বেশ খানিকটা ময়লা লেগেছে পোঁটলা থেকে। তাজউদ্দীন ফিরে যাবার উদ্যোগ করতেই তটিনী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো–উহুঁ, যাবেন না। আর একটু দাঁড়ান।



www.pathagar.com

বলেই তটিনী গিয়ে মাছের ডালাটা বারান্দার ওপর রেখে এক ঘটি পানি নিয়ে দ্রুতপদে ফিরে এলো। এসেই সে বললো–হাত পাতুন।

তাজউদ্দীন ইতস্তত করে বললো–মানে!

তটিনী শক্ত কণ্ঠে বললো–হাতে ময়লা। ধুতে হবেনা হাত?

জি,হবে।

তাহলে হাত পাতুন।

অগত্যা হাত পাতলো তাজউদ্দীন। তটিনীর ঢেলে দেয়া পানিতে ঝুঁকে পড়ে দুই হাত ধুয়ে নিলো। পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটি ঝাড়তে লাগলো।

তা দেখে তটিনী বিশ্বাস বললো–গামছা দেবো?

জবাবে তাজউদ্দীন বললো–জি না, আমার গামছা আছে।

কৈ গামছা?

আমার ঘরে।

তটিনীর রাগ হলো। বললো–আপনার যে গামছা আছে, সেতো আমি জানিই। আমি আপনাকে কোন গামছা দান করতে চাচ্ছিনে। হাত মুছার জন্য–

তাজউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বললো–জি–না। আমি যেয়েই মুছে নেবো।

তো যান, তাই নিনগে–

কিছুটা বিরক্ত হয়েই সরে গেল তটিনী।

বিকেল বেলা মরিয়মকে সামনে পেয়ে তটিনী বিশ্বাস বললো, মেঝো জেঠীমা, জেঠা মশাই বুড়ো মানুষ। আজ বাদে কাল তাঁর খাওয়ার কিস্‌মত নাও হতে পারে। মাছের ঐ অতবড় মুড়োটা তাঁকে না পাঠিয়ে আমাদের দিয়েছেন কেন? একটা মাত্র মাথা। তিনি থাকতে আমরা খাবো সেটা, এটা কেমন বেয়াদপী আর বেইনসাফীর ব্যাপার!

মরিয়ম বিশ্বাস বললেন–তিনি যে নিতে চাননি কিছুতেই। বললেন, "বড় তকলিফ করে তাজউদ্দীন মাছটা ধরেছে। কাপড় জামা ভিজিয়ে ও ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে ছুটেই যেতো মাছটা। এ মুড়োটা তারই হক। তারই জন্যে মুড়োটা রেখে দেবে কিন্তু। তাকে না দিয়ে আমার জন্যে পাঠালে আমি ভয়ানক রাগ করবো।"

তটিনী অবাক হয়ে বললো–তাহলে আমাদের দিলেন যে!

আমি তো দেইনি, তাজউদ্দীন জিদ ধরে দিয়েছে।

মানে!

কবে নাকি তোমাদের কালাচাঁদকে তুমি হাট থেকে মাছের মুড়ো আনতে বলেছিলে? কালাচাঁদ তা ভুল করে আসায় তুমি নাকি তাকে বকাবকি করে বলেছিলে–মুড়িঘন্ট খাওয়ার নাকি তোমার সখ হয়েছে খুব? তাই তাজউদ্দীন, কিছুতেই মুড়োটা তার জন্যে রাখলে না।

একটা রীতিমতো ধাক্কা খেলো তটিনী। তার স্মরণ হলো–পাঁচ ছয়দিন আগে বাহির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সে কালু ওরফে কালাচাঁদকে এই কথাটা একটু গরম কণ্ঠেই বলেছিল। তাজউদ্দীন বারান্দায় তার তাঁতের কাজে এ সময় মশগুল ছিল। এ কথা তার কানে গেছে



www.pathagar.com

তটিনী তা মনেই করেনি তখন। এমন একটা ছোট্ট ঘটনা তার মতো আদ্‌না আদমী মনে রেখেছে এতদিন! আর সেই কারণেই সে নিজের হিস্‌সাটাই জিদ ধরে অকাতরে দিয়ে দিলো! তাজ্জব!

অভিযোগ উবে গেল তটিনীর। কোনমতে আর দু'একটি কথা বলেই সে তাড়াতাড়ি সরে গেল অন্যদিকে।

এ ঘটনার দিন তিনেক পরের কথা। আসর নামাজ আদায় করার ইরাদায় অজু করে তাজউদ্দীন বাহির আঙ্গিনার পাশে এক সরু গলিতে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিলো। এমন সময় তাড়া খেয়ে একটা নেড়ী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ঐ পথেই তার দিকে আসতে দেখে তাজউদ্দীন ছিটকে এলো ওখান থেকে এবং লাফ দিয়ে তার বারান্দার ওপর উঠলো। এমন ভাবে এ কাজটা সে করলো–যেন কুকুর দেখে যারপরনাই ভয় পেয়েছে সে।

তটিনী বিশ্বাস নিকটেই ছিল। তাজউদ্দীনের কান্ড দেখে সে হাসির বেগ চেপে রাখতে পারলোনা। সে সশব্দে হেসে উঠলো। হাসির শব্দে তাজউদ্দীন চোখ তুলতেই তটিনী বিশ্বাস আর একটু কাছে এসে ব্যঙ্গ করে বললো–আহারে! অল্পের জন্যে বেঁচে গেল জানটা আপনার!

প্রত্যুত্তরে তাজউদ্দীন বললো–জি?

ভয় পেয়েছেন খুব?

ভয়? কৈ, নাতো!

কিন্তু আমি যে নিজের চোখেই দেখলাম, আপনি আঁত্‌কে উঠে লাফ দিলেন?

ও, তা হবে হয়তো। যেভাবে কুকুরটা আসছিলো, তাতে ওটা আমার গায়ের ওপরই পড়তো।

আর সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলতো আপনাকে!

তটিনীর ঠোঁটে হাসি। তা দেখে তাজউদ্দীন শরমিন্দা কণ্ঠে বললো–না–মানে, জানোয়ারটাতো আসলে–

বাঘ ভাল্লুকের চেয়েও ভয়ংকর একটা কিছু!

তাজউদ্দীন বলতে চাইলো–জানোয়ারটাতো আসলে না–পাক জানোয়ার। কিন্তু তটিনী তার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে এই মন্তব্য করলো। সেই সাথে সে আরো বললো–বাইরে বাইরে না ঘুরে আপনার জেনানার মতো শাড়ি পরে অন্দর মহলে থাকা উচিত।

তাজউদ্দীনও হেসে ফেললো। বললো–কি বললেন? শাড়ি?

শাড়ি নয়, বোরকা–বোরকা।

হো হো করে হেসে উঠলো তাজউদ্দীন। তটিনীর সামনে এইভাবে হাসা এই তার প্রথম। এই নির্মল হাসির মধ্যে একটা নিষ্পাপ অন্তর তটিনীর নজরে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লো। হাসতে হাসতে তাজউদ্দীন বললো–কি যে বলেন! আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই ভয় পাইনি!

তটিনীও হাসতে হাসতে বললো–না–না, আপনি পাবেন ভয়? আপনার বুকে কত হিম্মত!

জি?



www.pathagar.com

ওটুকুতে হবে না। হিম্মত আরো বাড়াতে হবে। হর কদম আতংকে লাফিয়ে উঠলে অপঘাতে মারা পড়বেন।

না, মানে–

তটিনীর ঠোঁট থেকে হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। তাজউদ্দীনের কথায় কোন কর্ণপাত না করে সে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় বললো–শিশু হলে আমিই না হয় সাথে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভয়টা আপনার ভাঙ্গাতাম। কিন্তু আপনি তো আর শিশু নন। এখন নিজের সাহস বাড়াতে হবে নিজেকেই। এত অবলা আর ভীতু হয়ে চললে এ দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারবেন না, বুঝেছেন?

একটা করুণ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করে তটিনী বিশ্বাস আস্তে আস্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলো। তাজউদ্দীনও আর কৈফিয়ত দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলোনা।

এর কয়দিন পরেই তাদের মধ্যে তৃতীয়বার কথা হলো–ঐ মুসল্লীদের ওপর রাত্রিকালে ফৌজী হামলার ঘটনা নিয়ে। যে লোকটা মুসল্লীদের বাঁচালো সে লোকটা নাকি তাজউদ্দিনের মতোই দেখতে–এই আলাপটা নিয়ে।

ঘটনার পরের দিন মুহসীন সাহেবের নির্দেশে এই ফৌজী হামলার খবর নিয়ে তাজউদ্দীন যখন সত্যি সত্যিই সুফী সাহেবের উদ্দেশ্যে রওনা হলো তখন আর একবার এলো তটিনী। এসেই সে তাজউদ্দীনকে তার কর্তব্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে বার বার হুশিয়ার করে দিতে লাগলো। বললো–আপনি ছাড়া এ কাজের আর যোগ্য লোক আপাতত কাউকে দেখছিনে। আর তাই জেঠা মশাই এর মুখে একথা শুনেও আমি চুপ করে আছি। আমার ধারণা ছিল উনি হয়তো শেষ পর্যন্ত অন্য কাউকে পাঠাবেন। তবু আপনাকেই যখন পাঠাচ্ছেন আর আপনিও যাচ্ছেন, তখন যান। কিন্তু একাজে পদে পদে মুসিবত। যে রকম শিশুর মতো অসহায় আর আলা–ভোলা লোক আপনি! কি ঘটিয়ে বসেন কে জানে! খুব হুশিয়ার থাকবেন সব সময়। ফ্যাসাদ কিছু হলে তো আর গাঁয়ের আর কারো কিছু হবেনা। সবটুকুই যাবে আমাদের ওপর দিয়ে। মানে মারা পড়বেন আপনি আর জেঠামশাই।

কণ্ঠে তার উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি ধ্বনিত হয়ে উঠলো। তা লক্ষ্য করে তটিনীর মুখের দিকে এক নজরে চেয়ে রইলো তাজউদ্দীন। একেবারে চোখের ওপর চোখ রেখে। এমন নিবিড়ভাবে তটিনীর মুখের দিকে তাজউদ্দীন আর কোনদিন তাকায়নি। স্থির নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর তাজউদ্দিন হাসি মুখে বললো–সত্যি, আপনার খাপসুরতের মতোই আপনার দিলটাও বড় পবিত্র!

রওনা হলো তাজউদ্দীন। অসাড় হয়ে অনেকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো তটিনী।

www.pathagar.com

# ২

মযলুমের ভিড়ে হযরত নূর কুতুব-ই-আলমের খানকা শরীফে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। খানকা শরীফের ভেতর বাহির সর্বত্রই মযলুমের আহাজারী। তফাৎ-নযদীক, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর-তামাম অঞ্চল থেকেই নিত্য নয়া পয়গাম আসছে জুলুমের। সুফী হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব একজন যইফ আদমী। অনেক তাঁর বয়স। তুলার মতো সফেদ তাঁর চুলদাড়ি ও চোখের ভ্রু। খানকা শরীফের বারান্দায় আসনের ওপর স্থির হয়ে বসে আছেন সুফী সাহেব। তসবিহ তেলাওয়াত করছেন আর একিন দিলে স্মরণ করছেন আল্লাহ পাককে। মযলুমদের আহাজারীতে মাঝে মাঝে চোখ মেলে চাইছেন এবং অশান্ত মযলুমদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন-ইন্নাল্লাহা মায়াস্ সোয়াবেরীন। সবুর করো। আল্লাহ পাকের ওপর আস্থা রেখে ধৈর্য্য ধরো। মুসিবত চিরকাল থাকে না। মুসিবতে ধৈর্য হারানো ইমানদারীর বরখেলাপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ধৈর্য শীলদের পক্ষে থাকেন।

অনেকের ভিড় ঠেলে সুফী সাহেবের আওলাদ শায়খ আনোয়ার সাহেব ওয়ালিদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ফরিয়াদির আর্তি। সুফী সাহেব কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখাকৃতি অবলোকনেই তিনি অনুমান করতে পারলেন-আর এক নাখোশ পয়গাম তাঁর সামনে হাজির। নিজেকে সংযত করে তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন-বলো কি বলতে এসেছো?

শায়খ আনোয়ার সাহেবের নজর জমিনের ওপর নিবদ্ধ হলো। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, শায়খ মুইনদ্দীন আব্বাস সাহেবের আওলাদদের রাজা গণেশের ফৌজ কয়েদ করে নিয়ে গেছে।

সুফী সাহেব কিয়ৎকাল নীরব হয়ে রইলেন। পরে আবার চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন-আওলাদদের মানে?

মানে, শায়খ বদরুল ইসলাম বাদে সবাইকে।

সুফী সাহেব পুনরায় নীরব হলেন। শায়খ আনোয়ার সাহেব বললেন-বরদাস্ত করার ওয়াক্ত বোধ হয় পার হয়ে গেছে। এখন আব্বা হুজুরের নির্দেশ কি?

জিজ্ঞাসু নেত্রে শায়খ আনোয়ার সাহেব পিতার দিকে চেয়ে রইলেন। জওয়াবে অনেকক্ষণ পর সুফী সাহেব ফের বললেন-ইন্নাল্লাহা মায়াস্ সোয়াবেরীন।

শায়খ আনোয়ার এরপরও বললেন-শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেব ভাইদের জন্যে রাজা গণেশের কাছে দরবার করতে গেছেন। তাঁরও হয়তো বিপদ ঘটতে পারে।

সুফী সাহেব ভারী গলায় বললেন-তুফানের সময় কোন আদমীরই নিরাপত্তা থাকে না। আল্লাহ পাক যার নসীবে যতখানি দুর্ভোগ লিখে রেখেছেন, তা ঘটবেই।



www.pathagar.com

সুফী সাহেবকে পুনরায় নীরব হতে দেখে আনোয়ার সাহেব খানিকটা জিদ ধরে বললেন– আমরা এর প্রতিকার করতে চাই।

সুফী সাহেব আবার চোখ তুলে বললেন–কি প্রতিকার করবে?

যে শক্তি হাতে আছে আমাদের, তাই নিয়ে আমরা রাজা গণেশের ওপর হামলা চালাতে চাই।

সামনা সামনি?

হ্যাঁ, সামনা সামনি। প্রকাশ্যে তার ওপর আমরা হামলা চালাতে চাই। আর চুপ থাকা যায় না।

তাতে আরো প্রাণহানিই ঘটবে শুধু। সীমিত শক্তি নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত হুকুমাতের বিরুদ্ধে বেশী সুবিধে করতে পারবেনা।

কিন্তু–

তৌহিদ বেগ চৌকশ রণবিদ। তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, এই প্রকাশ্য লড়াইয়ে নামতে সেও রাজী হবে না কিছুতেই।

আব্বা হুজুর!

সে জন্যে ঢের বেশী সামর্থের প্রয়োজন।

তাহলে কি আমাদের কিছুই করার নেই?

আছে। যে সব জায়গায় নিরীহ লোকদের ওপর অতর্কিতে হামলা হচ্ছে, সংবাদ যোগাড় করে নিয়ে সেসব জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তোলো এবং যথা সম্ভব তাদের হেফাজত করো।

সুফী সাহেব চোখ বুজে তসবিহ তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন। শায়খ আনোয়ার সাহেব বুঝলেন তাঁর বুজুর্গান ওয়ালেদ আর বাক্যালাপে আগ্রহী নন। তাঁর যা বলার তা শেষ করেছেন তিনি। অগত্যা আনোয়ার সাহেব আস্তে আস্তে সরে এলেন।

খানিক পরেই তাজউদ্দীন সামনে এসে দাঁড়ালো। সুফী সাহেবকে জেকেরত দেখে সে বারান্দার নীচে একটু দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। কতজন কত কথা বলতে এসে সুফী সাহেবকে ধ্যান মগ্ন দেখে সবাই আবার ফিরে গেলো একে একে। কিন্তু তাজউদ্দীন ঐ একইভাবে দাঁড়িয়েই রইলো ওখানে। তা দেখে কেউ কেউ তাকে নিরুৎসাহ করলো। কেউ কেউ আবার ঠাট্টা করে টিকা টিপপনী কাটলো। দরবেশের এক অনুচর এসে তাজউদ্দীনকে কিছুটা ঠেলতে ঠেলতেই বললো হুজুরের ইবাদতে আপনারা এভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন কেন? সকাল থেকে উনি একটানা কথা বলতেই আছেন। এখন যান, উনাকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দিন। আবার যখন চোখ খুলবেন, তখন এসে কথা বলবেন। এখানে উনাকে ডাকাডাকি করবেন না।

তাজউদ্দীন মৃদু কণ্ঠে বললো–না–না। তা আমি করবোনা। অনেক দূর থেকে এসেছি। অন্যত্র যাবো আর কোথায়, এখানেই থাকি। উনি নিজে যখন কথা বলার মওকা দেবেন তখন কথা বলবো।

অনুচরটি বললো–নাছোড় বান্দারে বাবা! তো থাকেন। দ্যাখেন, কখন মওকা পান।



www.pathagar.com

খানিকটা নাখোশদিলেই অনুচরটি চলে গেল। কিন্তু সুফী সাহেব তাকে মওকা দিলেন তখনই। ইবাদতের ফাঁকে তিনি চোখ মেলতেই তাঁর চোখ পড়লো তাজউদ্দীনের ওপর। তিনি তসবিহ রেখে তৎক্ষণাৎ হাত নেড়ে তাজউদ্দীনকে আরো খানিক কাছে ডেকে বললেন– তোমার নাম তো হলো–

তাজিমের সাথে সুফী সাহেবকে সালাম করে তাজউদ্দীন তাঁর কথার খেই ধরে বললেন– তাজউদ্দীন।

সুফী সাহেব খেই পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন–হ্যাঁ–হ্যাঁ, তাজউদ্দীন–তাজউদ্দীন! তা হামলা হোয়েছে তোমার ওখানে?

জবাবে তাজউদ্দীন বললো–জি হাঁ। কিন্তু আপনি–

আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু তুমি সেজন্যে–

জি না। আমি শুধু পয়গামটা পৌঁছে দিতে এসেছি। গ্রামবাসীরা সবাই চায়, এটা হুজুর পাকের নজরে থাক।

ভাল ওদের হটিয়ে দিতে খুবই কি বেগ পেতে হয়েছে?

জি না। মুসল্লীরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন।

বহুত খুব। সবাইকে সজাগ থেকে চলা– ফেরা করতে বলবে।

জি আচ্ছা।

সবাইকে বলবে–মুসিবতের সময় অসহায় ইনসানের পাশে দাঁড়ানো সওয়াবের কাজ।

হুজুর!

ইত্তেফাকের কুওত ছাড়া তুফানের সময় জুদা হয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়–এ জ্ঞানটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও।

তাতো হলো হুজুর, কিন্তু–

বলো–

বুজুর্গান ব্যক্তিদের ওপরই যে এখন হুমকির আলামত বেশী দেখতে পাচ্ছি।

শায়খ মুইনুদ্দীন আব্বাস সাহেবের আওলাদদের কথা বলছো?

জি। শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেবও শুনছি ভাইদের তালাশে গেছেন।

হুঁ!

এ ছাড়া আরো অনেক ওলামায়ে কেরামের ওপরও হামেশাই হামলা হচ্ছে। হুজুর কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা এই খানকা শরীফে রাখেননি। ভাবছি–কখন যে এসব হামলার জের এই খানকা শরীফ পৌঁছে–

হাত তুলে সুফী সাহেব তাজউদ্দীনকে থামিয়ে দিলেন। বললেন– আমাদের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের নিয়ে যা খুশী ঐ আলেমুল গায়েব করবেন। ও নিয়ে তোমরা কোন সোচ্ করতে যাবেনা। এখন তোমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো গ্রামগঞ্জের অসহায় মযলুমদের হেফাজত করা।

হুজুর!



www.pathagar.com

রাজার ফৌজের গতিবিধির খবর সংগ্রহ করার কাজও এখন জোরদার করা দরকার। কখন কোন অঞ্চলে যায়! অবশ্য তোমাকে এসব বলা–

হুজুর যা বিবেচনা করেন!

আর কিছু বলবে তুমি?

জি না। আমার আশ্রয়দাতা মুহসিন বিশ্বাস সাহেবের নির্দেশ তো আর ফেলতে পারিনে আমি। তাই ঐ পয়গামটা পেশ করতেই এসেছিলাম।

ভাল–কোন তকলীফই তকলীফ নয় তোমার কাছে। এই তো চাই।

স্মিতহাসি হেসে আবার চোখ বুজলেন সুফী সাহেব। তসবিহ তেলাওয়াতের মধ্যে আস্তে আস্তে আবার তিনি তলিয়ে গেলেন। বেলার দিকে তাকিয়ে তাজউদ্দীন ত্রস্তপদে পথে নেমে এলো।

সুফী সাহেবের খানকা থেকে বাঁশবাড়ির পথ খানিকটা আঁকা–বাঁকা। খানকা থেকে বেরিয়ে নানা ডালে বাগ হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে এপথটা বাঁশবাড়িতে এসেছে। সুলতান দীঘির পাশ দিয়ে যে বড় রাস্তা বরাবর রাজধানীতে চলে গেছে, সেই রাস্তার পেট কেটে চলে এসেছে পথটা। বড় রাস্তা পেরিয়ে খানিক পথ এগুলেই এক নদী। নদী থেকে বাঁশবাড়ি আধাক্রোশের অল্প একটু বেশী পথ। পারাপারের খেয়াঘাটটা এপার–ওপার যোগ করেছে এই পথকে। ঘাটের ওপরই বন্দর মাফিক ছোট্ট একটা জায়গা। জায়গাটার নাম পাকুড়তলা। কোন বটপাকুড়ের গাছ এখানে নেই। কোন এক সুদূর অতীতে তা হয়তো ছিল। আর হয় তো সেই সুবাদেই নাম হয়েছে পাকুড়তলা। দু'চার জন ব্যবসায়ী, দু'পাঁচজন দোকানদার, কয়েকজন খদ্দের, কিছু পথচারী আর আশপড়শী ছাড়া, হররোজ খুব বেশী জন মানবের পদচিহ্ন পাকুড়তলায় পড়েনা। মাঝে মধ্যে ব্যবসায়ীদের নাও ভিড়ে এই ঘাটে। বছরে বার কয়েক বেদের বহর নোঙ্গর ফেলে এখানে। কোন কোনদিন হালদারদের মাছ ধরার তৎপরতা বৃদ্ধি পায় ঘাটের পাশে। তখন পাকুড়তলা অনেক খানি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ঘাটের ওপরই মুখোমুখী দুইজনের দুই দোকান। একটা দোকান বিষ্ণুপালের, অপরটা রজব আলীর। পাতিল গড়ানো ত্যাগ করে দোকান খুলেছে বিষ্ণুপাল। বেণেতি দোকান বিষ্ণুপালের। হরেক কিসিমের বেণেতি মাল পালের দোকানে পাওয়া যায়। রজব আলী কাপড় বিক্রি করে। লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি, চাদর ইত্যাদি।

ছোট ছোট চালার নীচেও দোকান বসে কয়েকটা। খন্ড কালীন দোকান। পান, তামাক, সুপারী আর আলাপাতা এসব দোকানে পাওয়া যায়। তরিতরকারি নিয়েও হেথা হোথা দু' একজন বসে। শাঁখা–চুড়ি–আলতা–সিঁদুর নিয়ে অনেক সময় ফেরিওয়ালারাও এসে ঘাটের ওপর দোকান খোলে।

রজব আলীর ঘরের পাশেই মহাজনদের এক আড়তঘর। ঘাট দিয়ে মালচলাচল কালে এই আড়তঘরে কয়েকদিন অপেক্ষা করে মালগুলো। এঘরেও কয়েকজন লোক বসবাস করে, বিষ্ণুপালের দোকানের পাশেই কয়েক ঘর কলুর বাস। ক্যাঁকড় ক্যাঁকড় ঘানি ঘোরে সারারাত।



www.pathagar.com

সেদিন শেষ প্রহরে ভিড় ছিলনা ক্রেতাদের। ভিড় ছিলনা অন্য কোন লোকেরও। বসে বসে হাই তুলে গান ধরলো বিষ্ণুপাল। বিষ্ণুপাল রসিক মানুষ। কণ্ঠও বেশ সুরেলা। পূজা-পার্বন বারোয়ারীতে একাই সে মাতিয়ে রাখে আসর। গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলো বিষ্ণুপাল-এত খবর করি হরি, তবু খবর মেলেনা। ও ভোলা মনরে-

তা শুনে রজব আলী হাসতে হাসতে বললো-কি হলো দাদা? কিসের খবর করছো এত?

গান থামিয়ে বিষ্ণুপাল বললো-এ্যাঁ! আমায় কিছু বললে?

বৌদি কি বাপের বাড়ি থেকে আসেনি?

বাপের বাড়ি! বাপের বাড়ি গেলই বা কখন, আর আসবেই বা কেন?

তাহলে এতো খবর করছো কার? অন্য কাউকে মনে ধরেছে বুঝি?

হো হো করে হেসে উঠলো বিষ্ণুপাল। বললো-আরে মিয়াভাই, তা ধরলেই কি আর উপায় আছে? দরোয়াজা বন্ধ!

মানে?

মানে বিশমুণে পাথরের মতো ঘাড়ে যেটা চেপে আছে সেকি আর অন্য কাউকে ঢুকতে দেবে ঘরে?

দেবেনা?

না।

বিলকুল না?

জান গেলেও না। আর শুধু ঢুকতে দেয়া? এমন খোশ পয়গাম তার কানে গেলেও গর্দান থাকবে আমার? মটকে দেবেনা মট্ মট্ করে?

বলো কি দাদা। এয়সা মাফিক বৌদি আমাদের?

তো আর বলছি কি? পেত্নি পেত্নি। একদম শ্যাওড়া গাছের পেত্নি। তার ইয়াব্বড়ো ভাঁটার মতো চোখ দুটো হরদম আমার পেছনে বন বন করে ঘুরছে। পান থেকে চুন খসতে দেখলেই ব্যস। জিন্দেগী খতম!

বলো কি!

উঃ! কি কুলক্ষণেই যে ঘরে তুলেছি তাকে!

রজব আলী কৌতুক করে বললো-কি দাদা, কথাটাকি দেবো একবার বৌদির কানে?

কপট ভয়ের ভাব করে বিষ্ণুপাল জোড় হাতে বললো- দোহাই ভাই সাহেব, মাথায় দু'ঘা লাঠি মারো, ওভি আচ্ছা। কিন্তু দয়া করে এ দুশমনিটা করোনা।

এবার রজব আলীও আওয়াজ দিয়ে হেসে উঠলো। বললো-তা যা-ই বলো দাদা, বৌদি আমাদের সত্যি কিন্তু বড় ভাগ্যবতী। খোদ ভগবান তার ভাগ্যটা নিজ হাতে গড়েছেন।

কেন কেন?

এমন বউ ভীতু বর কয়টা মেয়ের নসীবে জোটে?

বউ ভীতু!

www.pathagar.com

একদম ভেড়া মার্কা। বউ এর ভয়ে এমন ভ্যা-ভ্যা করা বর, সাত জনম তপস্যা করেও কোন মেয়ে পায়না।

বটে! ঠাট্টা হচ্ছে?

না দাদা, ঠাট্টা করবো কেন? যা সত্যি, তাই বলছি। আমি আবার বরাবরই সত্য বলতে খুব ভালবাসি কিনা?

বিষ্ণুপাল তেতে উঠলো। বললো-ওরে আমার সত্যপীরের পোলারে! নিজে যে কেমন বীর বাহাদুর, তা বুঝি আর জানিনে?

কি রকম?

কাপুরুষ-কাপুরুষ। একদম প্রথম শ্রেণীর কাপুরুষ।

কে, আমি?

জি, হাঁ। সমীর খাঁর ঐ বিধবা মেয়েটাকে নিকাহ করার জাররা পরিমান খাহেশ প্রকাশ করায় ঠ্যালাটা কি খেয়েছো। তা ভুলে গেছো এত শিগগির? ঘরে ঢুকতে না পেরে একখান নয়, দুইখান নয়, সাত সাত খান রাত যে বৈঠকখানায় ল্যাজ গুটিয়ে কাটালে, সে খবর কি জানেনা কেউ?

রজব আলী কাবু হয়ে বললো-তা-মানে-

কি, মানেটা কি?

মানে আমি কাপুরুষ নই যে, সত্যিটাকে সত্যি বলতে ভয় পাবো।

তার মানে, ঘরে ঢুকতে পারোনি।

হাঁ, তা পারিনি।

কেন ঢুকতে পারোনি?

দুয়ার খুলে দেয়নি যে।

দরজা ভেংগে ঢুকবে!

ওরে বাপরে! তাহলে আর রক্ষে ছিল দাদা? যে দজ্জালের দজ্জাল! বাড়িটাই ছাড়তে হতো তাহলে।

কেন, খুব নাকি বীর বাহাদুর? বউকে মোটেই ডরাওনা?

ডরাই না আমি ঠিকই দাদা। তবে ঐ দ্বিতীয় পক্ষের খাহেশটা দিলের ভেতর উঁকি দিলেই দিলটা কেমন একটু .....

কমজোর হয়ে যায়।

ঠিক তাই।

বুকের মধ্যে ধড়াশ ধড়াশ আওয়াজ হয়?

তাই হয়।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে গেলেই ঠ্যাংটা একটু কাঁপে?

হো হো করে হেসে উঠলো রজব আলী। বললো-তুমি শালা একদম সবজান্তা দাদা! বিলকুল ধরে ফেলেছো।



www.pathagar.com

বাঁশের তৈরী মাচার ওপর বসে ছিল বিষ্ণুপাল। সেই মাচাতে সজোরে এক চাঁটি মেরে বিষ্ণুপাল বললো–সাব্বাস্! তাহলে আর খামোকা ফোড়ন কাটছো কেন বাপধন?

রজব আলী হাসি মুখে আমতা আমতা করে বললো–না, মানে ঐ একটা কথার কথা দাদা।

বিষ্ণুপাল বললো–আরে ভাইসাব! সব বানরের মুখ ঐ একই রকম পোড়া। একমাত্র পাষন্ডরা ছাড়া, বিশ্বের তামাম বীর পুরুষেরাই বাইরে বীর, ঘরে ভেড়া।

দাদা!

অতএব খিস্তিপনা ছাড়ো, আখেরাতে মন দাও–

বলেই বিষ্ণুপাল ফের সশব্দে গেয়ে উঠলো ও ভোলা মনরে–

গান ধরেই অকস্মাত থেমে গেল বিষ্ণুপাল। তা লক্ষ্য করে রজব আলী বললো–কি হলো দাদা! থামলে যে?

বিষ্ণুপাল ইশারা করে নীচু গলায় বললো–ঐ দেখো–

রজব আলী গলা বাড়িয়ে দিয়ে দেখলো, এক হাতে একটা বাটি আর অন্য হাতে আধময়লা একটা গামছা নিয়ে ভোলা ভট্চাজ্ বিষ্ণুপালের দোকানের দিকেই আসছে। দেখামাত্র বিষ্ণুপালের মতো রজব আলীও গম্ভীর হয়ে গেল।

ভোলা ভট্চাজ্ সরাসরি বিষ্ণুপালের দোকানে এসে ঢুকলেন। হাতে ধরা গামছা খানা মাচার ওপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন– শ্রীমান বিষ্ণুপাদ, এই বস্ত্রখন্ডে আধা পয়সার লবণ, আধা পয়সার ডাউল আর এই কাংসপাত্রে দুই পয়সার ঘৃত প্রদান কর দেখি। লবণটা কদলী পত্রে উৎকৃষ্ট করে বেঁধে দাও। লবনের সাথে ডাউলের মিশ্রণ যাতে না ঘটে, সে দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখবে বৎস।

বিষ্ণুপাল নির্জীবের মতো যেমন চুপ করে বসে ছিল, তেমনি চুপচাপ বসে রইলো। তা দেখে ভট্চাজ্ মশাই বিস্মিত হয়ে বললেন–কি বৎস, আমার বাক্যগুলি শুনতে পেয়েছো কি?

বিষ্ণুপাল জড়িত জন্ঠে বললো–তাতো পেয়েছি ঠাকুর, কিন্তু–

কিন্তু কি?

আর তো বাকি দিতে পারবোনা!

ভট্চাজ্ মশাই চোখজোড়া কপালে তুলে বললেন–মানে!

মানে, অনেক পয়সা বাকি পড়েছে। হররোজ শুধু নিয়েই যাচ্ছেন। একদিনও একটা পয়সা দেননি। বাকি বকেয়া শোধ না করলে, এমন করে বাকি খাওয়ানোর তাকদ আমার নেই।

ভট্চাজ্ মশাই দুইকানে আঙ্গুল দিয়ে বললেন রাম–রাম। হররোজ, বাকি বকেয়া, তাকদ– এসব কিহে? এক প্রকার ম্লেচ্ছ শব্দ আমার সামনে উচ্চারণ করে আমাকে পাতকী করতে চাও?

তা যা–ই বলেন ঠাকুর। পয়সা দেবেন, সওদা নেবেন। বিনি পয়সায় আর কিছুই দেয়া সম্ভব নয়!



www.pathagar.com

ভট্‌চাজ্ মশায়ের দুইচোখে অগ্নুৎপাত শুরু হলো। তিনি সগর্জনে বললেন–তবেরে দুর্জন! নরক, নরক! রৌরব নরকে পচে মরতে হবে তোকে। আমরা হলেম নমস্য ব্যক্তি। নমস্যদের মনোতুষ্টির জন্যে অর্ঘ প্রদান অনন্ত পূণ্যের কাজ। আর তুই পাপাত্মা তা না করে নমস্যদের কাছেই পাওনা দাবী করিস্? নমস্যদেরই ঋণী করতে চাস্? নরকের ভয় কি অন্তরে তোর কিছুমাত্র নেই?

এর জবাবে বিষ্ণুপাল বুকে সাহস বেঁধে বললো–আমি তো দোকান খুলেছি ঠাকুর! অর্ঘ দিতেও বসিনি, দানপত্রও খুলিনি। মাল বেচে পয়সা না পেলে আমার দোকান চলবে কি করে?

ভট্‌চাজ্ মশাই রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন–বটে। এত সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে তোদের? দেবতুল্য মনুষ্যের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাকে তোরা এইভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছিস্? তিষ্ঠ! এই অনন্ত পাপের প্রতিফল অচিরেই ভোগ করতে হবে।

অতঃপর একটা তামার পয়সা ঝণাৎ করে বিষ্ণুপালের বাট্‌খারার ওপর ফেলে দিয়ে বললেন–এই নে তোর মূল্য। অবশিষ্ট যা পাবি, অচিরেই পরিশোধ করে দেবো। এবার দ্রব্যগুলো প্রদান কর।

বিষ্ণুপাল আর করে কি! বামুন–পুরুতের অভিশাপের ভয়ে এ যাবত যা চেয়েছে, মুখ মুজে দিয়ে গেছে। একটা কথাও বলেনি। আজ একদিনে আর কত কথা বলবে? অগত্যা সে নতশিরে মাল মাপতে লাগলো।

বুধু হালদার নদী থেকে একঝুড়ি মাছ এনে এই অবেলায় ঘাটের ওপর বসলো। বসেই সে হাঁকতে লাগলো–মাছ–মাছ, টাট্‌কা মাছ!

সবেমাত্র মাছ এনেছে বুধু হালদার। এক পয়সাও বিক্রি হয়নি। এমন সময় ভোলা ভট্‌চাজ্ সামনে এসে বললেন–এই বুধে ঐ বড় বড় পাব্‌দাগুলো দাও দিকি এই বস্ত্রখন্ডে?

বুধু হালদার ইতস্তত করে বললো–পয়সা দিবেন তো গো ঠাকুর? এখনও আমার বউনি–বাটা হয়নি। বিনি পয়সায় দিতে পারবোনা কিন্তু!

জ্বলে উঠলেন ভট্‌চাজ্ মশাই। গোস্বাভরে বললেন–বাকি! আমাদের কাছে মাছ দিয়ে অদ্যাবধি পয়সা চায় কোন জেলে, যে পয়সার কথা বলিস্? আমাদের মনোতুষ্টির মূল্যই তো অমন শ' টাকার সমান!

তা–মানে–

অনন্ত নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার মানসে কত জেলে বাড়িতে আমার মাছ এনে সাধাসাধি করে, আর তুই নরাধম, নরকের কীট পয়সার কথা বলিস্? এখনও বাড় তোদের কমেনি?

বাড় দেখছেন ক্যানেগো ঠাকুর? বাড়ের কথা হলোডা কি? মাছ লেবেন পয়সা দেবেন। এখানে বাড়ের কথা কি হলো?

চোখ দুটো চড়কগাছ করে ঠাকুর মশাই বললেন–কিমাশ্চর্য্যম্! ওরে ব্যাটা অকাল কুষ্মান্ড, অস্পৃশ্য, ছোটজাত, যার পায়ের ধুলোর আশায় তোর চৌদ্দ পুরুষ মাথা কুটেছে অহর্নিশ, তাঁর মুখের ওপর এমন ঠাশ্ ঠাশ্ করে কথা বলিস্–এত সাহস তোর। ভেবেছিস্ এখনও সেদিন তোদের আছে?

www.pathagar.com

বুধু হালদার ক্ষোভের সাথে বললো–আমাদের আবার দিন অদিন কি গো? কামাই হলে খাই, না হলে না খেয়ে থাকি। আমাদের আবার দিন অদিন কি?

গোস্বার আধিক্যে ভোলা ভট্‌চাজ্ ধূতির কৌচা ঝাড়তে লাগলেন। বললেন–এখন এদেশের রাজা কে জানিস্ ব্যাটা গোমূর্খ? ব্রাহ্মণ–ব্রাহ্মণ, নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ! ইচ্ছে হলেই যে হুটুশ করে জাত খোয়ায়ে মুসলমান হবি, ওটি আর হচ্ছেনা!

মানে?

সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে দেবে। এমনিইতেই যেগুলো যবন এদেশে আছে ওগুলো সাফ করতেই রাজা আমাদের পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছেন, তার ওপর তোরা আবার নূতন করে যবন হবি? হ! হয়ে দেখ্‌না একবার ঠ্যালাটা!

বুধু হালদার বিরক্ত হয়ে বললো–দাম দেবেন, মাছ লেবেন। এই বেচাকেনার মধ্যে এত কথা শুনাচ্ছেন ক্যানে গো ঠাকুর?

শুনাচ্ছি এইজন্যে যে, পায়ের তলার জীব তোরা, আমাদের পায়ের তলাতেই থাকবি তো প্রাণে বেঁচে থাকবি। আমাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এখন মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করলে ঐ প্রাণটাও আর থাকবে না।

না থাকে, না থাকবে। বেঁচে থেকে আপনাদের এই জুলুম সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়াও আমাদের জন্যে মঙ্গল। আপনি এখন যান। ঘরে আমার চা'ল নেই। আপনার ঐ বকবকানী শুনলে পেট ভরবে না আমার–

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বুধু হালদার পুনরায় হাঁকতে লাগলো–মাছ–মাছ, এই যে টাট্‌কা মাছ–

দেখে নেবো। ব্যাটাদের কত বাড় বেড়েছে তা একবার দেখে নেবো–

গোস্বায় ফুলতে ফুলতে ভোলা ভট্‌চাজ্ ট্যাং ট্যাং করে চলে গেলেন।

ভোলা ভট্‌চাজ্ বিদেয় হওয়ার পর বিষ্ণুপাল রজব আলীকে লক্ষ্য করে বললো–দেখলে ভাই সাহেব, দেখলে ব্যাটা বিট্‌কেলে বামুনটার তেজ? এর পর আর কার মেজাজ ঠিক থাকে বলো?

রজব আলী ভারি গলায় জবাব দিলো, কি আর দেখবো দাদা! যে মুসিবতের মধ্যে এখন আমরা পড়ে আছি, তাতে আর আমাদের বলার কিছু আছে?

মুসিবত!

মুসিবত নয়? ঐ ভট্‌চাজ্ মশাই কি বললে, শুনলেনা?

বিষ্ণুপাল নীরব হলো। নিমেষ কয়েক নীরব থেকে সেও অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললো– সে কথা যদি বলো মিয়াভাই, তাহলে মুসিবত আমাদেরই কি কম? যে দুর্দিনে পড়লাম আমরা আবার?

রজব আলী তাজ্জব হলো। সেকি দাদা? তোমাদের আবার দুর্দিন কি? দেশের রাজা এখন হিন্দু, এখন তো তোমাদের সুদিন দাদা!

www.pathagar.com

বিষ্ণুপাল আক্ষেপ করে বললো–আরে মিয়াভাই, ঐ যে কথায় বলে, বেল পাকলে কাকের কি? ব্যাপারটা হলো ঐ রকম। সুদিন হলে, সুদিন হলো ঐ ভোলা ভট্‌চাজের মতো মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চজাতের হিন্দুদের। শুধু হিন্দুটাই তুমি শুনলে? শুনলেনা–দেশের রাজা এখন একজন বামুন? আমরাতো জাতে খাটো। আমরা যারা অসংখ্য নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এদেশে আছি, তাদের দুঃখ বাড়লো বইতো কমলো না।

তার অর্থ?

অর্থ, মুসলমান সুলতানদের আমলে যেটুকু আরাম আমরা পেয়েছিলাম, সে আরামটাতো হারাম হয়ে গেল আবার।

বলো কি দাদা?

বিষ্ণুপাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো–এইবুঝে না বোঝার ভাণ করলেই মেজাজটা বড্ড খারাপ হয় রজব ভাই। আরে, মুসলমান সুলতানেরা তো কেউ জোর করে মুসলমান করতে আসেনি আমাদের। কিংবা হিন্দুদের হত্যা করে দেশটাকে নির্জলা মুসলমান দেশ বানানোর জন্যেও উঠে পড়ে লাগেনি তারা। আমাদের অসুবিধাটা ছিল কোথায়? বরং আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে পারি ভয়ে উঁচুজাতের হিন্দুরাও খামুশ হয়ে ছিল। আগের মতো অতটা জুলুম করার সাহস পায়নি তারা। আর এখন? এখন অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে? ভোলা ভট্‌চা যা বললে তার একদিকটাই দেখলে, আর এক দিকটা দেখলেনা?

রজব আলী থতমত খেয়ে বললে–তা মানে–

এখন তো ওরা ওদের পুরানো ঝাল সমানে ওসুল করতে থাকবে। ঐ আগের মতোই আবার ওদের পায়ের তলে পিষে মরতে হবে আমাদের। ভোলা ভট্‌চাজের আচরণ থেকেও কি আঁচ করতে পারোনা কিছু?

রজব আলীর কাছে ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিস্কার হলো। বললো–হ্যাঁ দাদা, কথাটা তোমার অবশ্যি ভেবে দেখার মতো।

বিষ্ণুপাল বললো–আমাদের সুখ শান্তি বলে কি আর থাকতে পারবে কিছু? ওদের সুখ শান্তির যোগান দিতেই তো জান আমাদের ফানা হয়ে যাবে।

ওদের কথপোকথনের মাঝখানে পায়রা হাতে এক বাজীকর এসে হাজির হলো সেখানে। এসেই সে আওয়াজ দিয়ে বোল্ ধরলো–এই যে,

খেলার খেলা পায়রা খেলা,
দ্যাখ্‌নেওয়ালা দ্যাখ্ এবেলা,
খেলছে খেলা ভুলুর চেলা।
(আর) ঢংএর বাজী রং এর মেলা
দেখলে খেলা যায় না ফেলা
চোখের পাতা, রয়না বেলা
করলে হেলা পস্তায়,
দেখাই খেলা সস্তায়–

www.pathagar.com

মুখের কথা শেষ করে সে সজোরে ডুগ্‌ডুগিতে আওয়াজ দিলো। ডুগ্‌ডুগির বাজনা শোনার সংগে সংগে ছেলে ছোকরাদের সাথে কিছু আগন্তুক ও ইতস্তত বিচরণকারী লোকজন সবাই এসে ঘিরে ধরলো বাজীকরকে। শুরু হলো খেলা। বাজীকর তার পায়রাটাকে ছেড়ে দিয়ে বোল তুললো ডুগ্‌ডুগিতে। পায়রাটি উড়ে উঠে সেই ঢোলের তালে তালে উল্‌টে উল্‌টে বাজী করতে লাগলো। উপস্থিত জনতা তন্ময় হয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর শেষ হলো খেলা। বাজীকরের পায়রা আবার বাজীকরের হাতে এসে বসলো। জনতার ভিড়টাও সেই সাথে ফিকে হয়ে গেল।

খেলাটা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সুফী সাহেবের খানকা থেকে তাজউদ্দীন এখানে এসে পৌঁছেছিল। জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে সেও আগ্রহভরে এই খেলা দেখছিলো। ভিড়টা ফিকে হয়ে যেতেই আগন্তুকদের একজন এসে তাজউদ্দীনের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। সে তার কামিযের জেব থেকে একটা পত্রবের করে তাজউদ্দীনের হাতে দিয়ে বললো, এই খতখানা মুহসীন বিশ্বাসকে দেবেন। ঘাট থেকে তাঁর কর্মচারী–তাঁকে দিয়েছেন।

তাজউদ্দীন আগ্রহভরে বললো–জরুরী পয়গাম কিছু?

মোটেই না, মোটেই না। সেরেফ ঠাঁই ঠিকানা আর হাল হকিকত।

আর আছে?

আপাতত নেই।

যে যা দিলো তাই নিয়ে বাজীকর প্রস্থানোদ্যোগ করতেই তাজউদ্দীন তার সামনে এসে দাঁড়ালো। তা দেখে বাজীকরটি হাসি মুখে বললো–কিছু বলবেন?

তাজউদ্দীন বললো– আপনার বোল্‌টা বড় সুন্দর। যা বলেছেন ঐ টুকই কি সব?

হাসতে হাসতে বাজীকরটি বললো তা মানে–

আরো কিছু থাকলে সেটাও শুনতে ইচ্ছে করছে। কতদিন এসব কিছুই শুনিনা।

আমি যেটুকু শিখেছি তা বলেছি। আরো বেশী শিখবো যখন, আপনি পয়সা জোগাড় রাখবেন, আমি নিজ গরজে আপনার বাড়িতে গিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসবো–

হাসতে হাসতে কটাক্ষ করে আপন পথে পা বাড়ালো বাজীকর। তাজউদ্দীনের মতো একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের এই শিশু সুলভ কান্ড দেখে আশে পাশের অনেকেই হো হো করে হেসে উঠলো।

বিষ্ণুপাল আর রজব আলী দুই জনেই তা লক্ষ্য করলো। রজব আলী বিষ্ণুপালকে বললো–ওকে চেনো দাদা?

বিষ্ণুপাল বললো–নাতো! তবে এইপথে হামেশাই যাতায়াত করতে দেখি।

বাঁশবাড়ির বিশ্বাস বাড়িতে থাকে। একেবারেই নালায়েক লোকটা।

তাতো দেখতেই পাচ্ছি। এ বয়সেও যে বাজীকরের বোল শুনার বায়না ধরে, তার হুঁশবুদ্ধি বলে থাকতে পারে কিছু?

তবে শুনি, লোকটা নাকি খুবই সাদাসিধে।

হবেই তো। বোকারা খানিকটা সাদাসিধেই হয়।



www.pathagar.com

মোজাক করার ইরাদায় রজব আলী তাজউদ্দীনকে লক্ষ্য করে বললো–আরে এই মিয়া, বাড়ি কৈ?

জবাবে তাজউদ্দীন বললো–বাঁশবাড়ি।

আরে ওটাতো হালের বাড়ি। এর আগে কোথায় ছিল?

আগে ছিল পাভুয়ায়। তার আগে কাজল দিঘির ঐদিকে।

বাপ্‌রে এত বাড়ি তোমার?

জি।

বাপ–মা, ভাই–বেরাদার–এ দুনিয়ায় আছে কেউ?

জি না। বিশ্বাস বাড়িতে এখন আম্মা আছেন একজন।

হো হো করে হেসে উঠলো রজব আলী। বললো–ভাল ভাল।

বিষ্ণুপালও হাসতে হাসতে বললো–তা দুনিয়ায় এত বাড়ি থাকতে ঐ নওমুসলিমের বাড়িতে গিয়ে মা পাতালেন কেন বাপু? যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে জানের ভয়ে ওরা আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে এলে এ মা'টাও তো হারাবে।

তাজউদ্দীন অবাক হয়ে বিষ্ণুপালের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর সে বললো–তা ফিরে আসা যায়?

বিষ্ণুপাল বললো– সমাজপতিরা পাঁতি দিলেই যায়। আর মোটা দক্ষিণা পেলে বামুন–পুরুতেরা পাঁতি দিতে পারেনা–এমন কোন সমস্যা এ দুনিয়ায় আছে?

তা পারে পারুক। পাঁতি দিলেই সব মানুষ ইসলাম ত্যাগ করেনা।

মানে?

আল্লাহ্ রসুলের প্রতি মহব্বত যার দিলে একবার পয়দা হয়, কোন কিছুর ভয়ে বা বিনিময়ে সে ইসলাম ত্যাগ করেনা।

কোন ভয়েই না?

জান গেলেও না।

বেলা তখন শেষ। তাজউদ্দীন দ্রুত পদে ঘাটের দিকে রওনা হলো। বিষ্ণুপাল অবাক হয়ে রজব আলীর মুখের দিকে তাকালো। রজব আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো–তাজ্জব! পাগল হলেও তো এ জ্ঞান দেখি তার টনটনে!

www.pathagar.com

# ৩

পাণ্ডুয়া রাজ গণেশের এখন সবচেয়ে বড় রকমের মাথা ব্যথা তৌহিদ বেগকে নিয়ে। তৌহিদ বেগ রাজা গণেশের অদৃশ্য এক ভীতি। ইলিয়াস শাহী সাল্‌তানাতের শেষ পর্যায়ের সীমাহীন গাদ্দারীর বিরুদ্ধে তৌহিদ বেগ এক আখেরী হুংকার।

ইলিয়াসশাহী শাসনের শেষ সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ মুসলমান গাদ্দারদের একটানা গাদ্দারীর শেষ খেশারত দিয়ে গেলেন। গাদ্দারী করে গাদ্দারেরা সর্বশান্ত হলো, আর এর তামাম ফায়দা লুটলেন ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ী। ইলিয়াসশাহী সাল্‌তানাতের মধ্যাহ্ন ওয়াক্তে একজন নামমাত্র উমরাহ হয়ে পাণ্ডুয়ার শাহীদরবারে প্রবেশ করার কিস্‌মত ঘটে গণেশের। সেই কিস্‌মতকে পুঁজি করে সেই মুহূর্ত থেকে গোপনে ও সুকৌশলে গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর শাসনের শেষের দিকে সেই বীজ থেকে অংকুরিত চারাগাছটি গণেশেরই লালনে অসংখ্য ডালপালা ও কান্ডগুড়ি নিয়ে এক সুবিশাল মহীরুহে পরিণত হয়।

এই মহীরুহের চাপে পড়েই নিহত হন ইলিয়াস শাহী বংশের সুষমাময় কুসুম সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ। রাজা গণেশের কুমন্ত্রণায় গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর দরবারের অধিকাংশ মুসলমান আমির-উমরাহ আর সালার-উজির চরম গাদ্দারী করে গণেশের সাথে হাত মেলায় এবং নানা প্রকার লোভ মোহ দেখিয়ে রাজা গণেশ তাদের নিজ হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলেন। সুলতান তনয় শাহজাদা সাইফউদ্দীন হামজা শাহ্‌ও কম যান না গাদ্দারীতে। মসনদের লোভে এবং পিতার জীবদ্দশাতেই মসনদে আরোহণের দুর্বার খাহেশে তিনিও গণেশের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। পরিস্থিতি পুরোপুরি আয়ত্বে আনার পর এই গাদ্দারদের দিয়েই রাজা গণেশ সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করেন এবং হাতের খেলনা হামজা শাহকে মসনদে বসান।

এরপর রাজা গণেশ তাঁর সহায়তাকারী তামাম মুসলমান ইয়ারদের খতম করে দেয়ার পরও চোখ খুলেনা বেয়াকুফদের। সুলতান সাইফউদ্দীন হামজাকে শিখন্ডী রূপে দাঁড় করিয়ে রেখে রাজা গণেশ তামাম ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন এবং সুলতানের নামে তিনিই শাসন চালাতে থাকেন। কায়দা করে দিনে দিনে তিনি ফৌজ থেকে মুসলমান সেপাইদের সংখ্যাও অকল্পনীয় পরিমাণে হ্রাস করে ফেলেন। দু'একজন ভাঁড় ও মোসাহেব প্রকৃতির বেঈমান ছাড়া, দরবারে মুসলমান সভাসদদের নাম গন্ধও মুছে ফেলেন রাজা গণেশ।



www.pathagar.com

এসব দেখে হামজা শাহর চোখ খুলে যখন, তখন আবার আর একদল নয়া গাদ্দার পয়দা হয় এবং এই নয়া গাদ্দারদের দিয়েই গণেশ নারায়ণ হত্যা করেন হামজা শাহকে। স্বার্থের মোহে সাইফউদ্দীন হামজার ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ স্বীয় প্রভূকে হত্যা করে রাজা গণেশের প্রিয়পাত্র হন এবং খোশদিলে পাণ্ডুয়ার মসনদে উঠে বসেন।

অতীত ইতিহাস থেকে কিছুমাত্র পাঠ গ্রহণ করতে চায়না এরা। ফলে রাজা গণেশ এই নামমাত্র সুলতানদের মসনদে রেখে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে এগুতে থাকেন সুপরিকল্পিত ভাবে এবং ক্ষমতার সামান্যতম পদ থেকেও নিরুদ্ধুশভাবে উচ্ছেদ করেন মুসলমানদের।

এরপরও গাদ্দারের অভাব হয় না গণেশের। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ নিজ অস্তিত্ব ফিরে পাওয়ার আগ্রহী হয়ে উঠতেই তাঁকেও তিনি হত্যা করেন শেষ পর্যায়ের কয়েকজন নির্বোধের সাহায্যে। নিজ পিতাকে হত্যা করা সত্বেও এবং সুলতানদের প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখেও বায়াজিদ শাহর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ বিদ্রোহ না করে রাজা গণেশের পেটুয়া হয়ে মসনদে উঠে বসেন এবং গাদ্দারীর বিষফলের অবশিষ্ট অংশটুকুর তামামই ঝেড়ে মুছে ভোগ করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর নিহতকাল থেকে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর মসনদে আরোহণ অতি অল্পকালের ঘটনা। বাইস্কোপের দৃশ্য মাফিক একের পর এক দৃশ্য বদল হতে থাকে। আলাউদ্দীন ফিরোজশাহকে মসনদে খাড়া করার অল্প কয়দিন পরেই রাজা গণেশ যখন বুঝলেন–আর কোন শিখন্ডী রাখার দরকার বা গাদ্দার পোষার জরুরত নেই। তখন তিনি নিজেই মসনদে উঠে বসবেন বলে স্থির করলেন এবং শেষ পর্যায়ের গাদ্দার কয়টা হত্যা করে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে হত্যা করার দায়িত্ব এক স্বগোত্রীয় সালারের ওপর অর্পণ করলেন।

রাজা গণেশের পরিকল্পনার খবর তাঁদের দেবকুলেরও অজ্ঞাত ছিল এযাবত। নিহত হওয়ার আগে ভূতপূর্ব সুলতানেরা এর জাররা পরিমাণ আলামতও চোখের সামনে দেখেননি। নিজের অধিকার পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলেই হয়তো গণেশ একটু ঢিলে হয়ে পড়েছিলেন। তাই আচানকভাবে এখবরটা আগেই ফিরোজ শাহর কানে গিয়ে পৌছলো। মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করার আগেই তিনি নসীব গুণে মওতের পয়গাম পেলেন।

রাজা গণেশের এই অভিসন্ধির খবর একজন নওকরের মাধ্যমে আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ যখন জানলেন, তখন তিনি দেখলেন–তাঁর চারপাশের সকলেই হিন্দু এবং তারা সকলেই তাঁর দুশমন। একজন মুসলমান সালার বা সহকারী সালারও এই দুর্দ্দিনে, তাঁকে রক্ষা করতে না হোক, মওতের পর তাঁকে দাফন করার জন্যেও খুজে তিনি পেলেন না।

নওকরের মুখে এই দুঃসংবাদ শোনার পরই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ দিশেহারা হয়ে গেলেন এবং চরম আঘাত বুকে এসে লাগার আগেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তির তালাশে হন্যে হয়ে ছুটতে লাগলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন, শাহী ফৌজে তখনও কিছু সেপাই তার পক্ষে অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাদের পরিচালনা করার মতো একজন নিম্নমানের



www.pathagar.com

ফৌজদারও তাঁর পক্ষে নেই। আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ নিজে কোন রণ বিশারদ ছিলেন না, বা রণবিদ্যায় সামান্যতম পারদর্শীতাও ছিলনা তাঁর।

সেপাই থাকা সত্বেও তাদের পরিচালনার উপযুক্ত লোকের অভাবে তিনি যখন হতাশার অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছেন ক্রমেই, ঠিক এই মুহূর্তে গুটিকয় নওজোয়ান রাতের অন্ধকারে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। এদের পুরোভাগে যে ছিল, তারই নাম তৌহিদ বেগ।

সুলতানের সামনে এসেই তারা কুর্ণিশ করে বললো–জাঁহাপনা কাউকে যদি একান্তই না পান আপনার পক্ষে, সৈন্য চালনার দায়িত্ব মেহেরবানি করে আমাদের ওপর দিন।

এমন অযাচিত মদদ তার সামনে এমন আচানকভাবে এসে পড়ায় সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ তাজ্জব বনে গেলেন। এটাকে তিনি আপাতত সহজভাবে গ্রহণ করতেই পারলেন না। আগন্তুকদের মুখের দিকে বিপুল বিস্ময়ে চেয়ে থেকে বললেন–মানে!

জবাব দিলো তৌহিদ বেগ। সে বললো–বাংলা মুলুকের মাটি থেকে মুসলমানদের হুকুমাত্ এমন অসহায়ভাবে বিলীন হয়ে যাবে এটা আমরা বরদাস্ত করতে পারছিনে। মওকা দিলে, পারি না পারি, জান কবুল করে একবার কোশেশ্ করে দেখতাম আমরা।

ফিরোজ শাহর বিস্ময় কিছুমাত্র হ্রাস পেলোনা একথায়। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন–তোমরা? তোমরা কারা?

আমরা জনাবেরই কয়েকজন নগণ্য সেপাই।

সেপাই তোমরা?

জি হাঁ, জনাব। আপনার মুসিবতের খবর আমাদের কানে এসেও পড়েছে। যে সালারের ওপর আপনাকে কোতল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেই সালারের বাহিনীরই আমরা ক'জন সেপাই। অতর্কিতে হামলা করে অপনাকে খতম করে দিতে হবে এ হুকুম কানে এসে পড়তেই আমাদের দিল কেঁপে উঠেছে জনাব। আপনি এখন খতম হয়ে যাওয়া মানেই মুসলমান হুকুমাতের যেটুকু নামগন্ধ এখনও টিকে আছে তা বিলকুলই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। ক'জনই আমরা মুসলমান। এটা কল্পনা করতেও দিলে আমাদের চোট্ লেগেছে। তাই আমরা ক'জন গোপনে বসে এ নিয়ে ভেবে দেখেই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। সোচ্ করার খুব বেশী সময় হাতে নেই জনাব। সেপাই চালনার জন্যে হয় কাউকে শিগগির খুঁজে বের করুন, নয় সে দায়িত্ব আমাদের ওপর দিন।

সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ যে ক্ষীণ পরিমান আশার আলো দেখতে পেলেন সামনে, এদের পরিচয় পেয়ে তাও আবার দপ করে নিভে গেল। তিনি ক্ষুণ্ন দিলে বললেন–সেপাইতো কিছু আছেই আমার? আমার প্রয়োজন এমন একজন রণবিদ যে এই সব সেপাইদের পরিচালনা করতে পারে। সেপাই হয়ে তোমরা আবার সেপাই চালনা করবে কি?

তৌহিদ বেগ বললো–জনাব, আপনার কথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এখানে একটা মস্তবড় ফাঁক আছে। আমরা বিশেষ করে আমি আর আমার এই সঙ্গী বাহালুল খাঁ, একেবারেই মামুলী সেপাই নই জনাব। বচপন কাল থেকেই বিভিন্ন ফৌজী উস্তাদের আস্তানায় ঘুরে ঘুরে ফৌজীশিক্ষা হাসেল করেছি আমরা। মগধ, উৎকল, জৌনপুর, দ্বারভাঙ্গা–অনেক জায়গায়



www.pathagar.com

থাকতে হয়েছে আমাদের। ফৌজী শিক্ষা হাসেলের পর দেশের বাইরে থাকার কালেই কয়েকটা লড়াইয়ে আমাদের শরিক হতে হয় এবং কিছুদিন ফৌজ চালনার কাজে ওখানেই ব্যাপৃত থাকতে হয়।

বলো কি!

সেপাই হয়ে আপনার ফৌজে ঢোকার কোন অভিপ্রায়ই আমাদের এ দুজনের ছিল না। কিন্তু আপনার মরহুম ওয়ালেদ ও আমাদের ভূতপূর্ব সুলতান তাঁর অন্তিম মুহূর্তে নিজে আমাদের নিয়ে আসেন সালারের পদে নিয়োগ করার ইরাদায়। তিনি হয়তো বুঝে ছিলেন, তাঁর নিজের পক্ষে শক্তি এখন একান্ত প্রয়োজন। তাঁর আগ্রহ দেখে আমরাও আর না করতে পারিনি। নইলে নোকরী করার আসলেই কোন খাহেশ আমাদের ছিল না।

তারপর?

কিন্তু রাজা গণেশের হাত পড়ায় সালারের পদ সেই মুহূর্তে দেয়া হয়না আমাদের। সামান্য সেপাই হিসাবে আমাদের ইন্তিজার করতে বলা হয়। সুলতানের মুখ চেয়ে সেইভাবেই কিছুদিন রয়ে গেলাম। কিন্তু পরে যখন দেখলাম, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষের পদ দেয়ার তিল পরিমাণ সদিচ্ছা রাজা গণেশের নেই, তখন আমরা সুলতানের শরণাপন্ন হতে চাইলাম। কিন্তু সে মওকা আমরা আর পেলাম না। তার আগেই তিনি আচানকভাবে কোতল হয়ে গেলেন।

তাজ্জব!

তখনই আমরা পাণ্ডুয়ার ফৌজ থেকে বেরিয়ে যাবো ভাবতেই দেখলাম, বাংলা মুলুকে মুসলমান হুকুমাতের একেবারেই শেষ সময় উপস্থিত। যে কোন মুহূর্তে এর মুমূর্ষু জানটুকু হাওয়ার সাথে একাকার হয়ে যাবে। তখন যাওয়া আমাদের হলোনা। কওমের খেদমতে আমাদের ফৌজীশিক্ষা আমরা উৎসর্গ করে দিয়ে মামুলী সেপাই হয়েই মওকার আশায় পড়ে রইলাম। আমাদের উম্মিদ ছিলো, আমাদের ফরিয়াদ নিয়ে আপনার কাছেই আসবো আমরা। কিন্তু–

কিন্তু ?

কিন্তু আমাদের সে উম্মিদও পূরণ হওয়ার অবকাশটুকু রইলোনা। আপনার আসনে আপনি মজবুত হয়ে না বসতেই আজ সবেরে আপনাকে কোতল করার হুকুম আমাদের সালার এসে আমাদের মাঝে গোপনে জারী করলেন এবং সবাইকে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় তৈরী থাকতে বলে গেলেন। হয়তো আজকের এই রাতটুকুও আর সময় নেই আপনার জন্যে।

তৌহিদ বেগ নীরব হলো। সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর দিলের তামাম আঁধার কেটে গেল। তিনি খোশদিলে স্বগতোক্তি করলেন–আলহামদু লিল্লাহ।

অতঃপর আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ঐভাবেই ওদের নিয়ে হাজির হলেন সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে। সেপাইদের তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে বললেন–সুলতানের নিমক হালাল সেপাই যারা আছো তারা এই মুহূর্তে বেরিয়ে এসে আমার নব নিযুক্ত সিপাহ সালার তৌহিদ বেগের ঝান্ডাতলে হাজির হও। রাজধানীতে নিদারুণ গোলযোগ দেখা দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক গণেশ ভাদুড়ী বিদ্রোহ ঘোষণা করে মসনদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারই চক্রান্তে একে



www.pathagar.com

একে খুন হয়েছে বিগত কয়েকজন সুলতান। তার এই আগ্রাসী থাবা থেকে বাংলার মসনদ হেফাজত করা পান্ডুয়ার তামাম নিমকহালাল সেপাইদের পবিত্র কর্তব্য।

খোদ সুলতানের হাঁক শুনে বিপুল সংখ্যক সেপাই সাগ্রহে বেরিয়ে এলো ঘাঁটি থেকে। কিন্তু রাজা গণেশের চোখ ছিল প্রখর। সেনাপতিরা বিলকুলই তাঁর লোক। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ছুটে এলো সেনাপতিরা। নিজ নিজ বাহিনীর ওপর সেনাপতিরা স্বয়ং এসে হস্তক্ষেপ করার ফলে এই বিপুল সংখ্যক সেপাইদের সামান্য কিছু অংশমাত্র তৌহিদ বেগের ঝান্ডা তলে দাঁড়ালো আর বাদবাকীরা তামামই তাদের স্বজাতীয় সেনাপতির আহবানে পশ্চাদগমন করলো।

ঘাঁটির সামনেই শুরু হলো লড়াই। একদিকে পান্ডুয়ার তামাম ফৌজ আর পান্ডুয়ার তামাম সালার। অন্যদিকে তৌহিদ বেগ, বাহালুল খাঁ ও তাদের দুই তিনজন সঙ্গীর সাথে অল্প সংখ্যক সেপাই। প্রাণপণে লড়ে গণেশের এই বিপুল শক্তিকে তারা পরাভূত না করতে পারলেও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সপরিবারে উদ্ধার করে নিয়ে তারা পান্ডুয়া থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো।

পান্ডুয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে তাদের ধাওয়া করে কিয়ৎদূর ছুটে এলো বটে, কিন্তু রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন বন বাদাড়ের পরিবেশে এসে তারা তৌহিদ বেগ আর ভুলু খার পাল্টা হামলার শিকার হলো। এদের অতর্কিত ও বিদ্যুৎগতি খন্ড হামলার ফলে অনেক সেপাই ডালী দিয়ে রাজা গণেশের বিচক্ষণ কয়েকজন সেনাপতি নিজ নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে নিয়ে রাজধানীতে ওয়াপস্ আসতে বাধ্য হলো। অবশ্য তারা ফিরে এসে দেখলো–রাজা গণেশের মসনদ আরোহণ ইতিমধ্যেই সুসম্পন্ন হয়েছে।

পান্ডুয়া থেকে বেরিয়ে তৌহিদ বেগের সহায়তায় আলউদ্দীন ফিরোজ শাহ বরাবর চলে এলেন বাংলা মুলুকের পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলে। এখানে এসে সাতগাঁ আর মুয়াজ্জমাবাদকে কেন্দ্র করে তিনি নিজেকে আবার বাংলা মুলুকের সুলতান বলে ঘোষণা দিলেন এবং নয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন।

দুরু দুরু করে কেঁপে উঠলো রাজা গণেশের বুক। পাশেই যদি দুষমণেরা নয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসে, তাহলে তাঁর জানের আর পান্ডুয়ার মসনদের নিরাপত্তা কচুর পাতার পানির চেয়েও অধিকতর অস্থায়ী। এটা তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারেন না। তিনি তাঁর তামাম দৃষ্টি এই দিকে ঘুরালেন এবং পান্ডুয়ার তামাম ফৌজ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন।

রাজা গণেশের নামকরা বিচক্ষণ সেনাপতিরা তাদের সুবিশাল বাহিনী নিয়ে এসে মুয়াজ্জমাবাদের নিকটবর্তী এক স্থানে ছাউনি গেড়ে বসলো।

ইতিমধ্যে তৌহিদ বেগ ঐ বন জঙ্গল আর নদী নালা পরিবেষ্টিত এলাকায় সামরিক দিক দিয়ে কৌশলগতভাবে নিজেদের সুদৃঢ় করে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলো। ফলে ঐ বিপুল ফৌজ নিয়ে সম্মুখ সমরে কয়েকবার নেমেও প্রাকৃতিকভাবে বৈরী এই পরিবেশে রাজা গণেশের সালারেরা তেমন কোন সুবিধে করতে পারলোনা।

কার্যোদ্ধারের মন্থর গতি দেখে রাজা গণেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে রাজধানী ফেলে তিনিও এলেন শিবিরে এবং ছল–বল–কৌশল–এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে তৌহিদ বেগকে



www.pathagar.com

মোকাবেলা করার পথঘাট বাতিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলেন পান্ডুয়ায়। চিরাচরিত পন্থায় আশাতীত উপঢৌকনের টোপসহ গুপ্তচর প্রেরিত হলো আলউদ্দীন ফিরোজ শাহর ডেরায়। লাকড়ী বাহক, পানিবাহক ও ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে গ্রামগঞ্জের পথে ঘাটে সর্বত্র এই গুপ্তচরেরা ফিরোজ শাহর সেপাইদের পেছনে অহরহ ঘুর ঘুর করতে লাগলো।

অধ্যবসায়ের সুফল অবশ্যই আছে। একান্ত নিষ্ঠার সাথে কয়েকদিন বিরামহীন চেষ্টার পর গুপ্তচরেরা ফিরোজ শাহর সেপইদের পাত্তা লাগাতে সক্ষম হলো এবং শেষ অবধি সেপাইদের তারা সমঝে দিতেও সক্ষম হলো যে, পতন ফিরোজ শাহর ঘটবেই। অধিক দিন এই বিপুল বাহিনীর সামনে তারা টিকে থাকতে পারবেনা। অতএব প্রাণ বির্সজন না দিয়ে রাজার পক্ষে যোগ দিলে বিপুল উপঢৌকন ও পদোন্নতি সহকারে এক অনাবিল সুখময় জীবন তাদের জন্যে সুনিশ্চিত।

সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ঝোঁকের মাথায় এই সিপাইরা ফিরোজ শাহর পক্ষে এসেছিল। এই টোপ ছড়ানোর সাথে সাথে অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত পক্ষে যোগ দেয়ার মূর্খামী তাদের কাছে ধরা পড়লো এবং সেই সাথে সেই স্বপ্নিল জিন্দেগীর বর্ণাঢ্য ছবি তাদের নজরে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো।

এই সেপাইদের শতকরা পঁচানব্বই জনই হিন্দু। তার ওপর এক দিকে এই অনিশ্চিত জীবন আর অন্যদিকে ঐ দুর্বার হাতছানি। কাজেই সুলতানের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার মোহ পানসে হতে অধিক সময় লাগলোনা। গণেশের শিবিরে বার্তা গেল–পথ তৈয়ার।

পরের দিনই আচমকা মার মার রবে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর ছাউনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজা গণেশের বাহিনী। তৌহিদ বেগ সঙ্গীদের নিয়ে ময়দানে নেমে দেখলো–তাদের পক্ষের সেপাইরা লড়াই করার পরিবর্তে খাপবদ্ধ অসি খাপবদ্ধ রেখে রাজার পক্ষের সেপাইদের সাথে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কোলাকুলিতে লিপ্ত।

দেখামাত্রই চমকে উঠলো তৌহিদ বেগ। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলো– লড়াই তাদের খতম। মুষ্টিমেয় যে দু'দশজন সেপাই তখনও তাদের পক্ষে অবশিষ্ট ছিলো, তার সঙ্গীদের সে এদের নিয়ে পলায়ন করার নির্দেশ দিয়ে, নিজে ছুটলো আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর সন্ধানে। অনেক ছুটোছুটি করার পর ফিরোজ শাহর সন্ধান যখন পেলো তখন সব শেষ! লড়াইয়ের হুংকার শুনে সঙ্গীদের নিয়ে তৌহিদ বেগ ময়দানের দিকে ছুটে গেলে, সুলতানের দেহরক্ষী সেপাইরা সুলতানকে একা ফেলে রাজার পক্ষে যোগ দেয়ার উৎসবে শরিক হতে ছুটে যায়। এই ফাঁকে রাজার একজন সেনাপতি কয়েকজন সেপাই নিয়ে এসে ঘিরে ধরে সুলতানকে এবং ওখানেই হত্যা করে তাঁকে।

তৌহিদ বেগ এসে দেখলো–লাশ হয়ে পড়ে আছে সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ, আর তার হত্যাকারী সেনাপতি তার সেপাই নিয়ে প্রস্থানোদ্যোগ করছে। মাথায় আগুন ধরলো তৌহিদ বেগের। তখনই সে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো সেনাপতিটির ওপর। পলকের মধ্যে কয়েকজন সেপাইকে শুইয়ে দিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করলো সেনাপতিকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই চারদিক থেকে রাজার ফৌজ এসে তাকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করলো। বিপুল বিক্রমে



www.pathagar.com

লড়ে সে দুষমনদের আবেষ্টনী ভেদ করে ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং রাজার ফৌজের তামাম চেষ্টা ব্যর্থ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই যে হারিয়ে গেছে তৌহিদ বেগ, আর তার হদিস পাওয়া যায়নি। তামাম বাংলা দিনের পর দিন খুঁজেও তার কোন সন্ধানই কেউ আনতে পারেনি অদ্যাবধি!

রাজা গণেশের সামনে বিপত্তির আর লেশটুকুও নেই। আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ সবংশে ধ্বংস হয়ে গেছেন। উপঢৌকনের টোপ দিয়ে ডেকে আনা সুলতানের পক্ষে যোগদানকারী ঐ বেঈমান সেপাইদেরও নির্মূল করা হয়েছে। কোনদিকেই আর তিল পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা নেই আজ। শুধু ঐ তৌহিদ বেগের দুস্বপ্নই রাজা গণেশকে এখন গভীরভাবে নাড়া দেয় মাঝে মধ্যেই। অনেক দিন কেটে গেছে, তবু পিত্তশূল বেদনার মতো এ বেদনা যায়নি তাঁর।

পাণ্ডুয়ার দরবার। মসনদে রাজা গণেশ উপবিষ্ট। শুরু থেকেই দরবার আজ থমথমে। রাজা গণেশের চোখ দিয়ে আগুণ ছুটে বেরুচ্ছে। মন্ত্রী সেনাপতি, পাত্র-মিত্র সকলেই চুপচাপ। সকলেরই নতশির। নিদারুণ ক্ষোভের সাথে রাজা গণেশ বললেন-ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, যার জন্যে সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ পাণ্ডুয়া থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো, যার সাহায্যে সে আলাদাভাবে রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পেলো এবং যার প্রতিরোধের কারণে আলাউদ্দীন ফিরোজশাহকে হত্যা করতে আমার সমুদয় বাহিনীকে নাকানী চুবানী খেতে হলো। সেই লোকটার সন্ধান কেউ করতে পারলেনা?

সেনাপতি শ্রীমাধব কম্পিত কণ্ঠে বললেন-মহারাজ।

রাজা গণেশ উষ্মার সাথে বললেন, সে লোকটা কে, তাও কেউ সঠিক ভাবে নিরূপণ করতে পারলেনা?

মন্ত্রী নরসিং নতমস্তকে বললেন-মহারাজ, লোকটার নাম নাকি তৌহিদ বেগ। এই পাণ্ডুয়া ফৌজেরই এক সেপাই ছিল সে। একজন চৌকষ যোদ্ধা ছিল ঠিকই, কিন্তু সেনাপতির পদতো ওদের কাউকে দেয়া হয়নি, তাই অচেনাই রয়ে গেছে। মামুলী এক সেপাই এর চেহারা আর বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখে কে?

বটে?

এছাড়া রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে তার আবির্ভাব হলো, আর রাজধানী থেকে বেরিয়ে তামাম মুল্লুক ঘুরে আবার হারিয়ে গেল। চেনাটা কি সহজ?

রাজা গণেশ তিরস্কার করে বললেন-কিন্তু যার তরবারির ঘায়ে আমার ডান সাইটে সেনাপতিরা বিভু দেখলেন দুই চোখে তাঁরাও তাকে চিনে রাখতে পারলেন না?

তাঁরা চিনতে তাকে পেরেছেন জনাব। কিন্তু লোকটা বড় সেয়ানা। কোন সময়ই এক লেবাসে বা এক চেহারায় থাকেনি। ফলে, লড়াইয়ের হুটপাটের মধ্যে এক একজন তাকে এক

www.pathagar.com

এক ভাবে দেখেছেন। কেউ বলছেন–ছেলে মানুষ, কেউ বলছেন–মধ্য–বয়সী, আবার কেউ বলছেন দাড়িগোঁফে মুখ ঢাকা এক মুরুব্বী।

রাজা গণেশ সখেদে বললেন–যতসব অপদার্থের দল। সাপ মেরে নেজুড় বাঁচিয়ে রেখে সবাই ফিরে এলো ড্যাং ড্যাং করে। এখন ও ব্যাটা যে কখন কোন সংকট সৃষ্টি করে তার ঠিক কি?

নরসিং আশ্বাস দিয়ে বললেন–না মহারাজ এ নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত কারণ নেই। তৌহিদ বেগের সন্ধানে আমাদের সেনা–সৈন্য সততই সচেষ্ট আছেন। আমাদের গুপ্তচর বাহিনী তো লেগেই আছে সে কাজে। এ ছাড়া, তৌহিদ বেগ যতবড় যোদ্ধাই হোক, ওতো এখন ঠ্যাং ভাঙ্গা ঘোড়া। সুলতানও নেই, তার সেপাই সৈন্যও নেই। একা তৌহিদ বেগ মহাপরাক্রম মহারাজের দুশ্চিন্তার কোন কারণই হতে পারেনা।

কয়েকজন সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–ঠিক–ঠিক। ঐ ভেগে পড়া তৌহিদ বেগকে তুচ্ছ একটা কীটের চেয়েও আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি। শুধু সন্ধানটুকু পাওয়ারই অপেক্ষামাত্র। সন্ধানটা পেলেই ওকে আমরা পিঁপড়ের মতো পায়ের তলে পিষে মারবো।

অন্য একজন বললেন–ওকি আর এদেশে আছে মহারাজ? সুলতান আলাউদ্দীনকে নিহত হতে দেখেই ও প্রাণের ভয়ে তখনই পালিয়ে গেছে কোথাও।

এনিয়ে আরও খানিক যুক্তিতর্কের পর রাজা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন–আমি তর্কে বিশ্বাস করিনা। কর্মে বিশ্বাস করি। যে ভাবেই হোক, ঐ দুর্বৃত্তের বিহিত আমি চাই। আর এই বিহিত করতে পারলে তবেই আমি বুঝবো–আমার পাত্র মিত্র সেনা সৈন্যেরা কথাতেই শুধু বড় নয়, কাজেও তারা দক্ষ এবং কোন চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে নেই আমি।

মন্ত্রী নরসিং এবং সেনাপতি শ্রীমাধব একসাথে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন–মহারাজ অনুগ্রহ করে এ আস্থাটুকু আমাদের ওপর রাখতে পারেন।

রাজা তাঁদের আসন গ্রহণের নির্দেশ দিতেই এক প্রহরী এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললো–মহারাজ, শায়খ বদর–উল–ইসলাম নামের এক দরবেশ আপনার দর্শন প্রার্থী।

বিশিষ্ট অমাত্য অবনীনাথ সান্যাল নরসিং এর পাশেই ছিলেন। রাজা গণেশ ক্রুর হাসি হেসে তাঁদের দিকে তাকালেন। সান্যাল অবনীনাথ বললেন–নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ভাইদের জন্যে দরবার করতে আসছেন।

রাজা স্বগতোক্তি করলেন–দরবার! বটে!

অতঃপর প্রহরীকে বললেন–আসতে দাও।

প্রহরী চলে গেল। একটু পরেই শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেব উন্নত মস্তকে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং মসনদের কাছাকাছি এসে একটি আসনে উপবেসন করলেন। শায়খের এই আচরণ দেখে দরবারটা তামামই গরম হয়ে উঠলো। মন্ত্রী নরসিং সক্রোধে বললেন–আপনার সাহসতো বড় কম নয়? মহামান্য মহারাজের সামনে এসে আপনি মাথাটা পর্যন্ত নত করার প্রয়োজন বোধ করলেন না?



www.pathagar.com

শায়খ বদরুল ইসলাম স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বললেন–একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া দুস্‌রা কারো কাছে শির নোয়নোর বিধান ইসলামে নেই।

রাজা গণেশের মাথায় দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলে উঠলো। অন্য কেউ হলে এখনই তিনি এ ব্যক্তির শিরচ্ছেদের আদেশ দিতেন। এতটা কখনই সহ্য করতেন না। কিন্তু শায়খ বদরুল ইসলাম হযরত নূর কুতুব–ই–আলমের মতো এত বিখ্যাত না হলেও, একজন সাধক মানুষ, আধ্যাত্মিক জগতের লোক। এদের কার মধ্যে কি আছে কে জানে। এ কারণে রাজা গণেশ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ হত্যার আদেশ না দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন–সম্মানীকে সম্মান প্রদর্শন করাও কি ইসলামে নিষিদ্ধ?

শায়খ সাহেব বললেন–নিষিদ্ধ নাহলেও যে সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকে সম্মান করা কোন বিশ্বাসীর পক্ষে শোভনীয় নয়।

তার অর্থ?

সম্মান বা শুভেচ্ছা অবশ্যই জ্ঞাপন করতাম, যদি জানতাম বিধর্মী হলেও যার সামনে এসেছি তিনি একজন মহানুভব ব্যক্তি। কিন্তু যে নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু বিধর্মী মুসলমানদের রক্তে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা মানেই অন্তরে ঘৃণা চেপে রেখে, মুখে নিছক অভিনয় করা। এ মোনাফেকী আল্লাহ্ রসূলের প্রতি কোন বিশ্বাসী কোনদিনই করেনা।

রাজা গণেশ শ্লেষভরে বললেন–অর্থাৎ আমার প্রতি আপনার অন্তরে অপরিসীম ঘৃণা।

শায়খ সাহেব অকপটে বললেন–তা ব্যক্ত করার কোন অপেক্ষাই রাখেনা।

সঙ্গে সঙ্গে দরবারে উপস্থিত সেনাপতিরা একসঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। রাজা গণেশ তাদের হাত ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন–তাহলে এ বিধর্মীর দরবারে ধর্মাত্মার আগমনের হেতু?

পাণ্ডুয়ার ফৌজ আমার ভাইদের কয়েদ করে এনেছে কেন–সেই কারণ জানার ইরাদায়।

আমাকে উচ্ছেদ করার ইরাদায় তারা যে আমার বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালাচ্ছিলো, শায়খ সাহেব কি এখবরটা জানেন?

জানি।

ঘটনা তাহলে সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

এ দুর্মতি তাদের কেমন করে হলো?

মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করার মাতম শুরু না হলে, এমন মতি তাদের কোনদিনই হতোনা। কারণ কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেড়ানো আমাদের কোন কাজ নয়। আপনি মুসলমান হত্যার এ উৎসব বন্ধ করুন, আমরা কেউ এনিয়ে মাথা ঘামাতে যাবোনা।

মিথ্যা কথা।

মানে?

কোন মুসলমানই চায়না–এই সিংহাসনে আমি অধিষ্ঠিত থাকি।



www.pathagar.com

শুধু মুসলমানই নয়, কোন মুলুকের কোন মানুষই চায়না–তাদের মসনদে কোন অত্যাচারী অধিষ্ঠিত থাকুক।

সেনাপতিরা আবার তাদের তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং হংকার দিয়ে উঠলেন–হুশিয়ার!

আবার তাদের থামিয়ে দিয়ে রাজা গণেশ দাঁতের ওপর দাঁত পিষে বললেন–আসল কথা সেটা নয়। আসল কথা–কোন মুসলমানই চায়না, কোন হিন্দু এই মসনদে উপবিষ্ট থাকুক। আর যেহেতু তারা তা চায়না, সেই হেতু আমিও চাইনে–কোন মুসলমান আমার রাজ্যে মাথা তুলে থাকুক।

ক্লিষ্টহাসি হেসে শায়খ সাহেব বললেন–এই কথাটাকে এইভাবেও ঘুরিয়ে বলা যায়–স্বাভাবিকভাবেই কোন হিন্দুও চাইবেনা, হিন্দুছাড়া কোন মুসলমান এই মসনদে থাকুক। তাই বলে কি করতে হবে? তামাম হিন্দুকে হত্যা করতে হবে? হিন্দু, মুসলমান বা পৃথক পৃথক ধর্মমতে বিশ্বাসী বিভিন্ন লোকেরা যেখানে এক সাথে বাস করবে, সেখানে এ অনুভূতি থাকবেই। সে জন্যে কোন হিন্দু, মুসলমান বা সেই পৃথক ধর্মের কোন কাউকে দোষারোপ করা যায়না। সবাই চাইবে তাদের লোকই মসনদে উপবিষ্ট থাকুক। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে সমাধান খুজঁতে গেলে, সমাধান কোনদিনই মিলবেনা।

অর্থাৎ–

এই ধরনের পরিস্থিতিতে কে সেই মসনদে বসার যোগ্য, তা নির্ভর করবে–ইনসাফ কার কতটা বেশী, ভিন্ন ধর্মের প্রতি কে কতটা সহনশীল–এই সব বিষয়ের ওপর।

রাজা গণেশের চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বললেন–কতখানি সহনশীল ছিলেন এদেশের মুসলমান সুলতানেরা? সহনশীলতার অর্থ কি? সহন শীলতার অর্থ বুঝি এই যে–এদেশের সমুদয় হিন্দু মুসলমান হয়ে যাক?

এর জবাবে শায়খ সাহেবও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন–হাতিয়ার হাতে কোন মুসলমান কোনদিন কোন হিন্দুকে মুসলমান করতে যাননি। বা তা চাননি। ইসলামের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়েই এদেশের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং করছে। মুসলমান হয়ে কেউ যদি আরাম পায়, তা তারা হবেই। এখানে সুলতানদের কসুর কোথায়?

রাজা গণেশ প্রতিবাদ করে বললেন–কোন হিন্দুই ইচ্ছে করে ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলামের প্রচার অভিযান অত্যন্ত জোরদার করা হয়েছে বলেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে তা করেছে।

অতি উত্তম কথা। মহারাজও তাঁর ধর্মমত আরো অধিক জোরদার ভাবে প্রচার করুন। তাতে যদি এ দেশের তামাম মুসলমান হিন্দু হয়ে যায় আমরা টু শব্দটিও করবোনা। ভালমন্দ বুঝে নিজ ইচ্ছায় কেউ ধর্মান্তরে গেলে তা মেনে নেয়াই ইনসাফ। গায়ের জোরে হত্যা করে কোন দেশ থেকে কোন ধর্মানুসারীদের নির্মূল করা মোটেই কোন ইনসাফের ব্যাপার নয় এবং এ জুলুম কেউ মুখ বুজে সহ্যও করবেনা।

সাপের মতো ফুঁসতে লাগলেন রাজা গণেশ। বললেন বটে!

www.pathagar.com

মন্ত্রী নরসিং বললেন–আপনি থামুন। আপনার নসিহত শোনার জন্যে আমরা উন্মুখ হয়ে বসে নেই।

শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেব এর জবাবে বললেন–নসিহত করার জন্যে আমিও এখানে আসিনি। এই জুলুম থেকে ভাইদের আমার নাজাত দেয়ার হুকুম হলে আর এক লহমাও আমি এখানে থাকবোনা।

বক্র নজরে চেয়ে রাজা গণেশ বললেন–তাদের নাজাত দেয়ার হুকুম আমি অনেক আগেই দিয়েছি।

এ কথায় শায়খ সাহেব খোশদিলে বললেন–মহারাজের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে মহারাজকে অবশ্যই অমি ধন্যবাদ জ্ঞাপনে তৈয়ার। কিন্তু কোথায় তারা?

রাজা গণেশ বললেন–নাজাত পেয়ে কোথায় তাঁরা গেছেন বা আছেন, সে খবর আমি জানবো কি করে? আপনি গিয়ে সন্ধান করে দেখুন।

রাজার কথায় সরল বিশ্বাসে উঠে দাঁড়ালেন শায়খ সাহেব। বললেন–মহারাজের অন্তরে ইনসাফ কায়েম হোক, আমি খাস্ দিলে এই কামনাই করি।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন শায়খ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে দরবারটা তামামই হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামলে মন্ত্রী নরসিং আফসোস করে বললেন–বিন্দুমাত্র মাথা নত না করে এমন স্পর্দ্ধার সাথে কেন যে মহারাজ এ ব্যাটাকে বেরিয়ে যেতে দিলেন–বুঝলামনা।

রাজা গণেশ মুচকি হেসে বললেন–যেতে দেয়নি। সূতোয় বেঁধে খেলছি। ওর ঐ উঁচু মাথা নীচু করে না দিয়ে ওকে আমি একেবারেই যেতে দিতে পারি?

মহারাজ!

সূতোর শেষ প্রান্ত তো হাতেই আছে আমার। ঘুড়ির মতো খাক্ না খানিক ঘুরপাক। আবার তাকে আমার কাছেই ঘুরে আসতে হবে।

তা–মানে–

ভাইদের খোঁজ করে কোথাও যখন পাবেনা তখন আবার আসতেই হবে তাকে। বড়শীতে গাঁথা মাছ নিয়ে খেলতে একটু দোষ কি?

আর এক দফা হাসির তুফান উঠলো!

কয়দিন পরই শায়খ সাহেব আবার এলেন রাজ প্রাসাদে। খবর পেয়ে রাজা গণেশ তাঁকে দরবার কক্ষে ডাকলেন না। অতি নীচু দরজা বিশিষ্ট একটি কক্ষের মধ্যে রাজা গণেশ আসন গ্রহণ করলেন। অতঃপর সেই কক্ষের মধ্যে আসার জন্যে আহবান করলেন শায়খকে।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েই শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেব ধরে ফেললেন রাজা গণেশের চালাকী। তিনি বুঝতে পারলেন মাথা নোয়াতে তাঁকে বাধ্য করছেন রাজা গণেশ। শায়খ তখন তাঁর এক পা লম্বা করে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অনেকটা বসে পড়ার ভঙ্গিতে উন্নত মস্তকেই কক্ষের মধ্যে এলেন।



www.pathagar.com

তা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন রাজা গণেশ। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন–তবেরে দাম্ভিক! এখনও এত তেজ তোমার। মাথা নত না করে আমার সামনে পা বাড়িয়ে দেয়ার এই স্পর্দ্ধা আমি নীরবে সহ্য করবো ভেবেছো?

অকম্পিত কণ্ঠে শায়খ সাহেব এর জবাবে বললেন–রাজা কি করবে না করবে সেটা রাজার বিবেচ্য। আমার বক্তব্য আমার সাথে এই প্রতারণা করা হলো কেন?

প্রতারণা?

কোথায় আমার ভাইয়েরা?

এর কোন জবাব না দিয়ে রাজা গণেশ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে হাঁক দিলেন–এই, কে আছিস্?

এত্তেলা পেয়েই কয়েকজন সেপাই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলো। শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেবের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে রাজা গণেশ সক্রোধে বললেন এই দাম্ভিককে এখনই তার ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেবকে সবলে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ক্ষীণ একটা আর্তনাদ ছিটকে এলো বাইরে থেকে এবং তৎক্ষণাৎ শায়খ সাহেবের খন্ডিত শির লুটিয়ে পড়লো ধূলোয়।

সান্যাল আর ভাদুড়ী–এই দুই পরিবারই পান্ডুয়ার তৎকালীন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু পরিবার। ভাদুড়ী প্রধান রাজা গণেশ পান্ডুয়ার রাজা। সান্যাল প্রধান অবনীনাথ সান্যাল রাজা না হলেও তিনিই রাজার দক্ষিণ হস্ত। পরম দোস্তী দুইয়ের মধ্যে। দুই গোষ্ঠীর লোকের মধ্যেও চরম হৃদ্যতা বিদ্যমান। একে অন্যের অভিন্ন আত্মা। এই সম্পর্ক আরো অধিক ঘনীভূত হওয়ার সম্ভবনাও ঘনিয়ে আসছে ক্রমেই।

শেষ বিকেলের সূরুজ অনেক নীচে নেমে গেছে। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে সুউচ্চ ইমারতের। হেথা হোথা ছায়া পড়েছে বিভিন্ন বৃক্ষরাজীর। বসন্তের সমীরণ মধ্যাহ্নে মাতম তুলে নেতিয়ে গেছে অপরাহ্নে। উৎসহারা স্রোতের মতো ধীর লয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বনারণ্যে ঝরে গেছে বিবর্ণ পর্ণকুল। কিশলয়ে ছেয়ে গেছে পর্ণঝরা প্রশাখা। শীতোত্তীর্ণ গুল্মলতা নয়া বাহারে বিহ্বল। ডগায় ডগায় ডব্‌কা ডব্‌কা ফোটা ফুলের গুচ্ছ। বন–উপবন–পুষ্পোদ্যানে অলিকুল আওয়ারা। মাতোয়ারা প্রকৃতি বেকারার জিয়াকে বাইরে টানছে অবিরাম। দ্বারে দ্বারে পৌছে দিচ্ছে পানিয়াভরণের এক প্রাণ উতলা পয়গাম।

যমুনা সান্যাল ঘর ছেড়ে অনেক আগেই বেরিয়েছে। পারিয়াভরণে না গিয়ে সে পুষ্পোদ্যানে এসেছে। নিজ উদ্যানের ছায়াশীতল অঙ্গনে বসে সে এক মনে মালা গাঁথছে একটার পর একটা।

ষোড়শী যমুনা। অবনীনাথ সান্যালের একমাত্র তনয়া। যৌবনের সম্ভারে তার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ হলেও কৈশোরের উচ্ছলতা এখনও তার পুরোপুরি যায়নি। বাল্‌মার তার তার প্রাণচাঞ্চল্য



www.pathagar.com

এখনও একেবারেই গ্রাস করতে পারেনি। একগাদা ফুল তুলে সে পা ছড়িয়ে বসেছে। গুণ গুণ গানের সুরে সে ফুলের বুকে সুঁই চালাচ্ছে মোহাবিষ্ট অবস্থায়।

রাজকুমার যদু নারায়ণ এসে পাশেই এক ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো। এক নজরে চেয়ে রইলো যমুনার ব্যতিব্যস্ত হাতের দিকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে সন্তর্পণে এসে পেছন থেকে যমুনার দুই চোখ চেপে ধরলো। কিন্তু যমুনার মধ্যে এতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিলোনা। একহাত দিয়ে চোখ ছাড়াতে ছাড়াতে সে তাচ্ছিল্যের সাথে বললো–ছাড়ো। কি আমার বাহাদুররে! আমি বুঝি আর দেখিনি!

ধরা চোখ ছেড়ে দিয়ে যদুনারায়ণ বিস্মিত কণ্ঠে বললো–এ্যাঁ! দেখে ফেলছো! কখন দেখলে?

যমুনা সান্যাল ঠোঁট উল্টিয়ে বললো– বাগানে ঢুকতেই।

সেকি! তবু কথা বলোনি যে?

আমার ঠেকা?

যমুনার ঠোঁট আবার উল্টে গেল।

যদু নারায়ণ তাজ্জব হয়ে বললো–মানে!

হাতে আমার কত কাজ! আমার এত গরজকি যে কাজ ফেলে কথা বলতে যাবো?

কাজ! কি এমন কাজ?

চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছোনা?

সেতো পাচ্ছিই। কিন্তু এত মালা! এত মালা করবে কি?

ঠাকুর পূজোয় লাগবে।

সবই?

সবই।

একটাও বাঁচবেনা?

না।

তাহলে একটা বেশী গাঁথো।

কোন দুঃখে?

দুঃখে নয়, সুখে।

মানে?

আমাকে দেবে কি?

ওরে আমার চাঁদ মুখরে! আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই যাকে তাকে মালা বিলিয়ে বেড়াবো!

যাকে তাকে মানে? আমি তোমার অপর?

অপর নওতো কি, তুমি আমার জানের জান?

তাই বলেই তো জানতাম।

তা জানলে আর বেঈমানী করতেনা।



www.pathagar.com

বেঈমানী করলাম!

না, তো কি করলে? কয়দিন ধরে একা একাই পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। একটা লোক নেই যে আমার সাথে থেকে সাহস দেয়। উনি বললেন–নদীর ধারে এলেই সাক্ষাত পাবে আমার। বেঈমান কাঁহাকার। নদীর ঘাটে গিয়ে দেখি ওম্মা! ব্যোম ফাঁকি। চারপাশে কোথাও জনমনিষ্যির টিকিটি পর্যন্ত নেই। বাব্বা! কি ভয়টাই না লেগেছিল।

কিন্তু আমাকে যে হঠাৎ বাইরে যেতে হয়েছিল। -----

ফুঁশে উঠলো যমুনা। বললো জরুরী কাজ! আমার চেয়ে তোমার ঐ কাজের ওপরই দরদ হলো বেশী?

না–মানে–

তো যাও, ঐ কাজ নিয়েই থাকোগে। আমার কাছে এসেছো কেন?

এসেছি এই জন্যে যে, তুমি সেদিন বজরায় চড়ে গ্রাম দেখে বেড়ানোর যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে, সে ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

এ্যাঁ! তাই?

এই খবরটা দেয়ার জন্যেই এসেছি।

সুঁই সূতো ফেলে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে পড়লো যমুনা। খুশীতে আত্মহারা হয়ে সে ছুটে এসে যদুনারায়ণের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তার বাহু ধরে নাড়া দিয়ে বললো–সত্যি বলছো?

সত্যিই।

কবে, কবে যাবো আমরা?

আগামী কালই।

এবার হাততালি দিয়ে নেচেই উঠলো যমুনা। বললে–ওঃ! কি মজা! নদী বেয়ে যেতে আমার যা ভাল লাগে!

তা দেখে যদুনারায়ণ টিপপনী কেটে বললো–কেন, তোমার ওপর আমার নাকি মোটেই কোন দরদ নেই?

কে বলেছে সে কথা?

তুমিই তো এখন বললে!

যাঃ! আমি তা বলতে পারি? কত ভাল তুমি?

তবু তো আমার জন্যে একটা মালাও গাঁথলেনা সবই তোমার ঠাকুরের জন্যে গাঁথলে।

আড় চোখে চেয়ে যমুনা সান্যাল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো–তাই বুঝি? একটু দাঁড়াও–

বলেই সে ছুটে গিয়ে সবগুলো মালা একসাথে তুলে এনে যদুর গলায় পরিয়ে দিলো আচমকা। যদু নারায়ণ কপট বিস্ময়ে বললো–সেকি! সবগুলোই যে দিয়ে দিলে?

মিটি মিটি হাসতে হাসতে যমুনা সান্যাল বললো–দিলাম।

তোমার ঠাকুরের জন্যে রাখলেনা? ঠাকুরকে দেবে কি?



www.pathagar.com

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঐ একইভাবে হাসতে হাসতে যমুনা ফের বললো–ঠাকুর তো আমার একটাই–আর তাকেই তো দিলাম।

সত্যিই ?

শাড়ির আঁচল দাঁতের তলে ফেলে সে বললো–জানিনে। যদু নারায়ণ বললো–নিজের হাতে কারো গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয় জানো?

সচকিত হয়ে যদুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যমুনা সান্যাল বললো– কি হয়?

বিয়ে হয়।

ধ্যাৎ।

লজ্জায় যমুনার দুইচোখ ঢেকে এলো। যদু আবার বললো–তুমি আমার বউ হলে।

ছিঃ!

দুই চোখ আঁচলে ঢেকে ছুটে পালালো যমুনা। "এই–শুনো, শুনো" বলে তার পিছে পিছে ছুটতে লাগলো রাজকুমার যদু নারায়ণ।

## ৪

আর পাঁচটা খুনের মতো শায়খ বদরুল আলমের খুনের খবরও নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লো। গঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরেই মুহসীন বিশ্বাস তাজউদ্দীনের ঘরে ঢুকে বললেন–তাজউদ্দীন, বড় নাখোশ পয়গাম!

শুয়েছিল তাজউদ্দীন। গতকাল বিকেল থেকেই তার জ্বর। এখন অনেকটা সুস্থ। দরজা জানালা খোলাই ছিল। মুহসীন বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। গায়ের ওপর কাপড় টেনে সে বললো –জি–বড় আব্বা?

তাজউদ্দীনের একপাশে বসতে বসতে মুহসীন বিশ্বাস বললেন–খুব খারাপ খবর। সেদিন তুমি শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেব সম্বন্ধে যে সব কথা খানকা শরীফ থেকে শুনে এসে বলেছিলে, সেই কথাই বলছি। উনাকে সত্যি সত্যিই কোতল করা হয়েছে।

বলেন কি!

বিস্মিত হলো তাজউদ্দীন। সে এক নজরে খোলা দরজাটার দিকে চেয়ে রইলো। মুহসীন বিশ্বাস বললেন–বলার কি কিছু আছে বাবা! এই তো দেশের অবস্থা।

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে তাজউদ্দীন ফের প্রশ্ন করলো কোথায় পেলেন এ খবর?

হুজুরের খানকা শরীফে। ওখান থেকেই শুনে এলাম।



www.pathagar.com

আপনি খানকা শরীফে গিয়েছিলেন?

ওখান থেকেই আসছি। গিয়েছিলাম আসলে গঞ্জে। আসার পথে একেবারেই সামনে পড়লো হুজুরের খানকা শরীফ। তাই গেলাম একটু হুজুর পাকের দরশনে।

আপনাকে উনি চেনেন?

উনারই তো মুরিদ আমি। উনার হাতেই ইসলাম কবুল করেছি।

আচ্ছা!

তোমাকেও তো অনেকেই চিনে দেখলাম। তোমার নাম বলতেই অনেকে চিনতে পারলো তোমাকে।

জি, এখানে আসার আগে ওখানেই আমি ছিলাম কিছুদিন। এছাড়া, অনেক বারই গিয়েছি আমি ওখানে।

হ্যাঁ। অসহায় আর এতিমদের প্রতি খানকা শরীফের লোকেরা বড় সদয় দেখলাম। তোমার ব্যাপারে কথা উঠতেই কেউ কেউ বললেন–আপনার ওখানে আছে যখন, তখন লোকটাকে একটু দেখে শুনে রাখবেন আপনারা। আমি বললাম, না–না, ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। হুঁশবুদ্ধি যতটা কম বলে ভাবে সবাই, আসলে তাজউদ্দীনের হুশবুদ্ধি অতটা কম নয়। এ ছাড়া, ওর সততার গুণেও এলাকার সবাই ওকে ভালবাসে। মুহসীন বিশ্বাস হাসতে লাগলেন।

তাজউদ্দীন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললো–জি?

ওঁদের মধ্যেই একজন ফের বললেন–শায়খ বদরুল ইসলামের খুনের কথাটা তাজউদ্দীনকে জানাবেন। তাকে বড় পেয়ার করতেন শায়খ সাহেব।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলো তাজউদ্দীন। প্রশ্ন করলো–উনার ভাইয়েরাও কেউ নিশ্চয়ই আর জিন্দা নেই তাহলে?

না। শুনলাম, আগেই তাঁদের কোতল করা হয়েছে।

আর কোথাও কোন সুফী দরবেশের ওপর হামলার কথা শুনলেন?

সেতো অনেকজনেই অনেক কথা বলছিলেন। কিন্তু বদরুল ইসলাম সাহেবের খবর নিয়েই ব্যস্ত সবাই। এখবরে খানকা শরীফের অনেকেই কেঁপে গেছেন।

আবার উদাস হলো তাজউদ্দীন। আবার সে এক ধেয়ানে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তার গা থেকে কাপড়টা কখন যে পড়ে গেছে, তার খেয়াল নেই। একটু পরেই সে কেঁপে উঠলো শীতে। খেয়াল হতেই সে তার গায়ের কাপড় তুলে নিয়ে গায়ে আবার এঁটে সেঁটে জড়ালো। তা দেখে এতক্ষণে হুশ হলো মুহসীন সাহেবের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন–কি ব্যাপার! তোমার কি জ্বর?

তাজউদ্দীন বললো–জি! গতকাল থেকেই অসুস্থ বোধ করছি।

দাওয়াই? দাওয়াই কিছু খাচ্ছোনা?

না, বড় রকমের কিছু নয়। এই মামুলী একটু জ্বর।

মুহসীন সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন–না–না, মামুলী বলে উড়িয়ে দিওনা একেবারে। শুরুটা মামুলী ভাবেই হয়। পরে আর তা রোখা যায়না জান প্রাণ করেও। ঠিক আছে। তুমি শুয়ে



www.pathagar.com

থাকো। আপাতত একটু হাড়বাকোশ আর নিম পাতার রস বানিয়ে দিতে বলছি আমি। ওটা খাওয়ার পরও যদি উন্নতি কিছু না হয়। তাহলে হেকিমের কাছে লোক পাঠাতেই হবে।

উঠে গেলেন মুহসীন সাহেব। একটু পরেই হাড়বাকোশ্ আর নিম পাতার রস এসে হাজির হলো। তাজউদ্দীনের জ্বর তখন কমে এসেছে অনেকটা। কিন্তু গুরুজনের আগ্রহের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো খন্নাস্পনা। তাই সে ঢক ঢক করে গিলে ফেললো রসটুকু। একদম খালি পেটে মারাত্মক এই তিতো রস পড়ায় তাজউদ্দীন কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলেও, জ্বরটা তার পালিয়ে গেল ভয়ে। কিন্তু তার অসুস্থতা পালালো না। ক্রমেই সে কাহিল হয়ে পড়তে লাগলো। কারণটা অন্য কিছুই নয়। কারণটা তার ক্ষুধা। প্রায় দু'দিন সে অভুক্ত।

জরুরী এক সংবাদে মরিয়ম বিশ্বাস মেয়ের বাড়িতে গেছেন। একদিন পরেই ফিরে আসার কথা। দুপুরের ও রাতের খানা একসাথে পাক করে রান্না ঘরে রেখে তাজউদ্দীন খেতে গিয়ে দেখে, কম্মকাবার! কোন ফাঁকে গোটা কয়েক বিড়াল ঢুকে ভাত তরকারীর ওপর দিয়ে কারবালার লড়াই লড়ে গেছে।

ফিরে এলো তাজউদ্দীন। দুপুর বেলা আর পাক চড়াতে গেলনা। ভাবলো, সাঁঝের বেলা দুমুঠো সেদ্দ করে নিয়ে একবারেই সে খাবে। কিন্তু বিকেলেই এলো জ্বর। রাতটাও গেল জ্বর নিয়েই। সকাল থেকেই জ্বরটা তার নামা শুরু করলেও, পাক চড়াতে যাওয়ার মতো উৎসাহ তার ছিলনা। তাঁর ধারণা ছিল, দুপুরের মধ্যেই এসে পড়বেন মরিয়ম বিশ্বাস। তাই সে চুপচাপই রইলো। খাওয়ার কথা কাউকে কিছু বললো না।

মুহসীন বিশ্বাসের অন্দরের অবস্থা একটুখানি গোলমেলে। মুহসীন বিশ্বাস বাড়িতে যখন না থাকেন, তখন ওদিককার অবস্থা একটু অন্যরকম। আশা ভরসা রাখার মতো নয়। তটিনীরাও বাড়ি নেই। অতএব তাজউদ্দীন লা-ওয়ারিশ! মুহসীন বিশ্বাস ফেরার পর হাড়বাকোসের পাতার রসটাই এলো, পেটের জ্বালা জুড়ানোর মতো রসদ কিছু ওদিক থেকে এলোনা।

বিকেলটাও পেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। তাজউদ্দীন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বারান্দায় বসেছে। জ্বরটা আর নেই। মরিয়ম বিশ্বাসকে এখনও ফিরে আসতে না দেখে তাজউদ্দীন পাকের কথাই ভাবছিলো। এই সময় দূরবর্তী এক গাঁ থেকে তিন দিন ধরে এক নিকট আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করে মায়ের সাথে বাড়ি ফিরলো তটিনী।

বাড়ির ভেতরে যাবার কালে তাজউদ্দীনকে বারান্দার ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখেই কেমন একটা খট্কা লাগলো তটিনীর। হাত গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ তো সে নয়! ভেতরে ঢুকে কালাচাঁদের মুখে মরিয়ম বিশ্বাসের অনুপস্থিতি আর তাজউদ্দীনের জ্বরের কথা শুনেই সে ছুটে এলো তাজউদ্দীনের কাছে। এসেই সে প্রশ্ন করলো –হেকিম ডাকা হয়েছে?

করুণ নয়নে তটিনীর দিকে চেয়ে তাজউদ্দীন বললো–কেন?

শুনলাম খুব নাকি জ্বর?

না, জ্বর সেরে গেছে।

কিন্তু তবিয়ত দেখেতো মনে হচ্ছেনা তা!

খুব ক্ষুধা পেয়েছে তাই। দুদিন থেকে অনাহারে আছি তো!



www.pathagar.com

দুদিন থেকে অনাহারে মানে! কিছুই খাননি?

না।

সাবু বার্লি?

আম্মা নেই্ যে! করে দেবে কে?

কি সর্বনাশ! একেবারে অনাহারে!

না। ঠিক অনাহারে বলা ঠিক নয়। পানি খেয়েছি কয়েক গ্লাস।

এই রকম লোকের মুখেই এমন কথা শোভা পায়। তাই বিস্মিত না হয়ে তটিনী বিশ্বাস বললো–পানিটা কি কোন খাবার?

খাবার না হলেও, পানি খেলে ক্ষুধা খানিকটা কমে। দু'তিন বার খেয়ে আমি তা বুঝেছি।

ঘরে কি চাউল ডাউল কিছুই নেই?

সবই আছে।

তো একমুঠো ফুটিয়ে নেননি কেন?

আগে ছিল জ্বর, আর এখন আম্মা ফিরে আসবেন ভাবতে ভাবতেই অবেলা হয়ে গেছে। এবার উঠবো ভাবছি–

তাজউদ্দীন নড়ে চড়ে উঠতেই তটিনী তাকে বাঁধা দিয়ে বললো–বসুন। আর উঠে কাজ নেই।

না বুঝে তাজউদ্দীন বললো–মানে?

পাকের ব্যবস্থা যা হয় একটা করছি আমি।

কিন্তু –

ভয় নেই। আপনার খাবারের হাঁড়ি ছুতেও আমি যাবোনা। আমরা ছুলে খাবার যে আপনাদের নাপাক হয়– তা জানি।

না–না, ছুলেই দোষ হয়না শুকনো ছুলে তো নয়ই। শুকনো আমরা খাই। শুধু রান্না করলেই না–জায়েজ হয়–এই যা–

ক্লান্তির মধ্যেও হেসে ফেললো তাজউদ্দীন। তটিনী বিশ্বাস বললো–যাদের দিয়ে রাঁধালে ঐ না–জায়েজ হবেনা। তাদের দিয়েই রাঁধাবো। আপনি বসুন।

তটিনী চলে গেল। একটু পরেই মোয়ামুড়ির একটা বাটি হাতে কালাচাঁদ এসে বললো–আমি যদি পানি এনে দেই আপনাকে, দোষ আছে?

তাজউদ্দীন বললো–না দোষ নেই।

তাহলে খেতে আরম্ভ করবেন না যেন। এগুলোর ওপর একটু নজর রাখেন–যেন কোন কুকুর বেড়াল মুখ না দেয় এসবে। আমি আপনার জন্যে পানি আনি।–

বাটি রেখে কালাচাঁদ পানি আনতে গেল এবং পানি এনে রাখতেই তটিনীর মায়ের ডাকে কালাচাঁদ আবার দৌড় দিলো অন্দরের দিকে।

কালাচাঁদ তাকে আগেই খেতে নিষেধ করেছে পানি সামনে নেই বলে। শুকনো গলায় শুকনো জিনিস মুসিবত পয়দা করতে পারে। কিন্তু তাজউদ্দীন পড়লো ফাঁপরে।



www.pathagar.com

অনেক সময় কেটে গেল। একজন মুসলমান মহিলার মাধ্যমে পাকের ব্যবস্থা করে তটিনী বাহির আঙ্গিনায় এসে দেখলো–তাজউদ্দীন ঐভাবেই বসে আছে বারান্দায়। গ্লাসের পানিটুকু শেষ। কিন্তু মোয়ামুড়ি বাটিভর্তিই পড়ে আছে। ওতে হাতও দেয়নি তাজউদ্দীন। মেজাজটা খিস্তে গেল তটিনীর। সে বললো–আপনাদের এই অতিরিক্ত ভড়ং দেখলেই গা জ্বলে ওঠে।

হকচকিয়ে গিয়ে তাজউদ্দীন বললো–মানে!

আপনিই তো বললেন, শুকনো খেতে আপত্তি নেই?

হ্যাঁ, তা নেই তো!

তাহলে খাননি কেন ওগুলো?

বাটির দিকে ইঙ্গিত করলো তটিনী। তাজউদ্দীন ইতস্তত করে বললো–ওগুলো কি কালাচাঁদ আমাকে খেতে দিয়ে গেল?

তো কাকে দিযে গেল!

সপ্তম আসমান থেকে জমিনের ওপর আছড়ে পড়লো তটিনী। লোকটা বলে কি!

তাজউদ্দীনও ফাঁপরে পড়ে গেল। বললো–না মানে, কালাচাঁদ আমাকে নিষেধ করেছে খেতে। এছাড়া? এযাবত ও কিছু খাওয়ার জন্যে দেয়নি।

নিষেধ করেছে!

বললো–খেতে আরম্ভ করবেন না যেন। আপনার জন্যে পানি আনছি।

বেয়াকুফ সে অনেক দেখেছে জীবনে। কিন্তু এটি একদম অনন্য। ক্ষোভে দুখে সে বললো–হুঁশবুদ্ধি বলে কোন কিছুই কি বিধাতা আপনার মাথা মুন্ডুতে দেননি? পাক নামাতে দেরী হবে দেখে এ গুলো আমি খেতে পাঠালাম আপনাকে, আর আপনি–

আফসোসের আধিক্যে তটিনী তার মুখের কথা শেষ করতে পারলোনা। সে শুধু দাঁত পিষতে লাগলো।

তাজউদ্দীন হেসে বললো–একেবারেই যে বুঝিনি তা কিন্তু নয়! কিন্তু এযাযত ছাড়া খাই কি করে বলুন? কালাচাঁদ যা ভাব করলো, তাতে ভাবলাম এটা তার নিজের খাবারও হতে পারে।

ব্যস্।

না, তাই শুধু ভাবিনি। ভাবছি, কাউকে সামনে পেলে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তবেই খাওয়া ভাল।

সারল্য প্রশংসার। কিন্তু অতি সারল্য অনেক সময় নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। যে সমাজে সকলেই মেপে চলেনা সমানভাবে, সেখানে কেউ কাঁটা ধরে চলতে গেলে তাকে সবার কাছে পুনঃ পুনঃ নির্বোধ বলেই প্রতিপন্ন হতে হয়। বিশ্বাস বাড়িতে আসার পর এমন নির্বোধ তাজউদ্দীনকে অনেক বারই হতে হয়েছে। অবশ্য তাজউদ্দীনের এতে লাভ বই লোকসান কিছু হয়নি।

দিন তিনেক পরের ঘটনা। বারান্দায় বসে তাঁত বুনছে তাজউদ্দীন। রাস্তার ওপর গান ধরলো, সোনা বাউল–সারা জাহানের মালিক আল্লাহ্, তুমি ছাড়া আর মাবুদ নেই–

www.pathagar.com

বিশ্বাস বাড়ির বাহির আঙ্গিনার নীচে চলাচলের রাস্তার ওপর একতারা বাজিয়ে গান ধরলো সোনা বাউল–। সে আওয়াজ দিতেই হাতের কাজ বন্ধ করে তাজউদ্দীন ছুটে এলো সোনা বাউলের কাছে। রাস্তাতে দাঁড়িয়েই সোনা বাউল গান গাইতে লাগলো। তাজউদ্দীনের মতো কিছু ছেলে–ছোকরাও ছুটে এলো। কিন্তু কাঠফাটা দুপুরে বাউলের গান শোনার জন্যে বয়সী মানুষ একজনও এলোনা। তটিনী বিশ্বাস আড়াল থেকে তা দেখলো– এবং তাজউদ্দীনের ছেলেমী দেখে সে একটু মুচকী হেসে সরে গেল।

গান শেষে সোনা বাউল সালাম দিয়ে বললো–মিয়াভাই, তাহলে এখানেই থাকেন আজকাল? বাউল বললো–এদিকেই আপনি আছেন শুনে কয়দিন ধরেই খোঁজ করছি। কিন্তু খুঁজে খুঁজে হয়রান! তা মজার খবর আছে মিয়াভাই। দুঃখের খবরও আছে। আগে মজার খবরটাই বলি। শুনছি বৈশাখী মেলাটা জব্বোর জমবে এবার। সবাই আমরা মেলায় থাকবো। ফাঁক করে একবার কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে ওখানে।

তা–দেখি–

দেখাদেখি নয়। আরে, মেলা দেখাও হবে আবার সবার সাথে পয়পরিচয়ও হবে। এবার কিন্তু মস্তবড় দল গুছিয়েছি আমি। আপনাকে পেলে সবাই যা খুশী হবে–

এদিকে তেমন উৎসাহ না দেখিয়ে তাজউদ্দীন প্রশ্ন করলো–রাজধানীর দিকে যাও?

হামেশাই যাই ওদিকে।

শায়খ বদরুল ইসলাম সাহেবের খবর তো নিশ্চয়ই শুনেছো?

গম্ভীর হলো সোনা বাউল। তার মুখের আলো নিভে গেল। বললো–শুনেছি এটাও আপনাকে জানাবো বলেই এসেছিলাম।

দরবেশ সুফীদের মধ্যে কার ওপর আবার গজব আসছে এরপর কিছু বাও–বাতাস পাও?

খুব একটা না। তবে শায়খহোসেন সাহেবকে নিয়ে একটু চিন্তার কারণ আছে।

ইতিমধ্যে বাহির আঙ্গিনায় এসে কালাচাঁদ তাজউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দিলো–এই যে মিয়া সাহেব, দিদিমনি আপনাকে ডাকছেন। কি যেন দরকার–

তাজউদ্দীন আওয়াজ করে জবাব দিলো–আসছি–

সোনা বাউলকে বিদায় করে তাজউদ্দীন পা তুলতেই সে আবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার পাশে খড়বিচালীর মধ্যে একটা টাকার থলে পড়ে আছে। থলেটা টাকায় ভর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে তাজউদ্দীন আশেপাশে চাইলো। কোথাও কাউকে না দেখে সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

অনেকক্ষণ যাবত তাজউদ্দীনের জন্যে অপেক্ষা করার পর তটিনী বিশ্বাস অবশেষে নিজেই এলো বাইরে। তাজউদ্দীনকে ওখানে ঐভাবে একা একাই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তাজ্জব বনে গেল। বললো–কি ব্যাপার, এখনও আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে।

তাজউদ্দীন তটিনীকে হাত ইশারায় ডাকলো এবং তটিনী কাছে এলে সে তাকে ঐ টাকার থলে দেখিয়ে দিল।

www.pathagar.com

থলের ওপর নজর পড়তেই তটিনী বিস্ফারিত নয়নে আওয়াজ দিয়ে বললো–ওমা, সে কি! এ যে বিস্তর টাকা।

তটিনী এগিয়ে গিয়ে থলের দিকে হাত বাড়াতেই হৈ হৈ করে বাধা দিলো তাজউদ্দীন। বললো–খবরদার–খবরদার। হাত দেবেন না। পরের জিনিসে হাত দেয়া মস্তবড় গুনাহ্।

আবার বিস্ময়! তটিনী বললো–পরের জিনিস!

হ্যাঁ। আমার আপনার তো নয়।

তাহলে আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন এখানে?

বাহ্! দেশে কি গুনাহ্গারের ঘাটতি আছে! কোন গুণাহ্গারের চোখে পড়লে সে আর রাখবে ওটা ওখানে? পাহারা দিতে হবে না?

আপনি তাই পাহারা দিয়ে আছেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু যার টাকা সে যদি ইহ জিন্দেগীতে এদিকে আর না আসে কতক্ষণ এইভাবে পাহারা দিয়ে থাকবেন?

সে না আসুক, অন্য লোকজন এলেই তো এগুলো মসজিদে নিয়ে গিয়ে জমা দিতে পারি। যার টাকা সে পরে এসে খোঁজ করে নিয়ে যাবে।

তাহলে সেই মসজিদে নিয়েই যাবেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

একাই আমি নিয়ে যাবো মসজিদে! তাকি হয়?

হয় না?

এরপর যদি কমবেশী হয় হিসেবে, তাহলে সবাই ভাববে, আমিই কিছু সরিয়ে ফেলেছি থলে থেকে। তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?

তাহলে!

কাছে কোলে এতক্ষণ কাউকে পাইনি বলেই দাঁড়িয়ে আছি। আপনি এসেছেন। আর দু'একজন এলেই এ থলে খোলা হবে, হিসেব মিলানো হবে, এরপর এটা জমা হবে মসজিদে।

তটিনী বিশ্বাসের ডাকে হাকে মুহসীন বিশ্বাস সহ আরো কয়েকজন লোক জুটলো সেখানে। মুহসীন বিশ্বাস এসেই চিনতে পারলেন টাকার থলে। তাঁর গুদামে কাপড় দিয়ে একজন পাইকার আজকেই তাঁর বাড়ি থেকে টাকা গুলো গুণে নিয়ে এই থলেতেই তুলেছিল। টাকার মালিককে তিনি চেনেন।

তটিনী বিশ্বাসের ব্যস্ততা তখন ঐ টাকার মালিককে নিয়ে নয়, এই নির্বোধকে নিয়ে। সমুদয় ঘটনা সবার কাছে প্রকাশ করে তটিনী বিশ্বাস ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলো–এ বিশ্বে এমন নির্বোধ কেউ কখনও দেখেছেন কি আপনারা?

এক বাক্যে জবাব এলো–'না'।



www.pathagar.com

কেটে যাচ্ছে দিন। সুখে, দুঃখে, নানা ভাবে। সবার দিন এক সাথে একইভাবে কাটেনা। সুখটাও সবার জন্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়না। আর কিছু না হোক, সময় সময় দু'একটা অযাচিত বালাই এসে ভর করে ঘাড়ের ওপর। এমনই একটি বালাই এখন তটিনীর ঘাড়ে বিদ্যমান।

রাজ পরিবারের জনৈক নওজোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশ্বর বিশ্বাস কয়দিন আগে বাঁশ বাড়িতে এসেছিলেন। আরো একবার এই রাজপুরুষটি বাঁশবাড়িতে তশ্‌রীফ আনেন সুরেশ্বরের মেহমান হয়ে। ফিরে গিয়ে সুরেশ্বরের মেহমানদারীর যথেষ্ট তারিফ করেছেন ভদ্রলোক। এতে করে খানিকটা পদোন্নতির সাথে নকরীটা পোক্ত হয়েছে সুরেশ্বরের। বাঁশবাড়ির পরিবেশটা কেন যেন বেজায় রকম ভাল লেগেছে নওজোয়ানের। তাই সুরেশ্বরের নামমাত্র আমন্ত্রণেই এবারও তিনি ছুটে এসেছেন বাঁশবাড়িতে। নকরীর দায়ে সুরেশ্বরকে দুদিন পরেই রাজধানীতে ওয়াপস্ যেতে হয়েছে। কিন্তু রাজপুরুষটি রয়েই গেছেন বাঁশবাড়ির উন্মুক্ত বায়ু সেবনের ইরাদায়।

নাম তাঁর অভয়চরণ। অভয়চরণ ভাদুড়ী। সুরেশ্বর বাবু যাবার সময় বার বার করে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন–অভয়চরণের যাতে করে কোন অমর্যাদা না হয়। তার সেবাযত্নে যাতে করে ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে। কোন কিছুতেই তিনি যেন অস্বস্তি বোধ না করেন। আলতু ফালতু ব্যাপার নয়। খোদ মহারাজের আত্মীয়। মজবুত বরাত ছাড়া এমন একজন মেহমান তপস্যা করে পাওয়া যায়না।

নসিহৎ করেই সুরেশ্বর বিশ্বাস শেষ করেছেন দায়িত্ব। খোশদিলে ফিরে গেছেন নকরীতে। ভারটা এসে তামামটাই তটিনীর ঘাড়েই চেপেছে। বাড়িতে কোন উপযুক্ত পুরুষ মানুষ নেই। ঝি–রাঁধুনী বা অন্য কারো পক্ষেই রাজপুরুষকে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই তটিনীকেই আসতে হয়েছে সামনে। মহাশয়ের স্নান–আহ্নিক, আহার নিদ্রা–সব কিছুরই ব্যবস্থা তাকেই করতে হচ্ছে। বিশ্রামে বিনোদনে সঙ্গদানও করতে হচ্ছে তটিনীকেই। অতীতেও এ দায়িত্ব তটিনীর ঘাড়েই ছিল। এবারেও সে দায়িত্ব তার ওপরই বর্তেছে।

তটিনী বিশ্বাস অবশ্য এ জন্যে তারিফ পাওয়ারই যোগ্যা। রাজবাড়ির অতশত দাস দাসীর তয়তদবিরের চেয়েও তটিনীর তদবিরটা অনেক বেশী মিষ্টি লেগেছে অভয়চরণের। বেশ কয়েকদিন গত হচ্ছে, তবু উনি যাবার নামটি করছেন না।

সেদিন অপরাহ্নে অভয়চরণ বাহির আঙ্গিনায় পদচারণা করছিলেন এবং ইতস্তত ঘুরে ঘুরে তটিনীর সাথে গল্প আলাপ করছিলেন। তটিনীকে মুগ্ধ করার ইরাদায় কবে কয়টা বাঘ মেরেছেন, কয়টা সিংহ ঘায়েল করেছেন, কয়টা বীর প্রাণের ভয়ে অভয়চরণ স্মরণ করে পশ্চাদাপসরণ করেছে–জোশের সাথে এসব কথা শুনাচ্ছিলেন। কিন্তু অভয়চরণ জানেন না যে, তাঁর অবস্থান ডালে হলেও হতে পারে, কিন্তু তটিনী বিশ্বাস বার মাসই পাতার ওপরে বাস করে। ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে অভয়চরণ তার কাছে এখনও শিশু। বাঁশবাড়ি তার যত ভালই লাগুক, শেষ অবধি ঐ লাগাটুকুই যে পাওনা হবে তাঁর, জিয়াদা কিছু মিলবেনা, এটা বোঝার মতো মগজ থাকলে, রাজপুরুষটি অনেক আগেই বাঁশবাড়ির বন বাদাড় আর মশককুলকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সস্থানে প্রত্যাবর্তন করতেন। তা নেই বলেই তটিনীকে নিয়ে খেলতে নেমে অভয়চরণ তটিনীরই খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছেন। তটিনীর সদা প্রসন্ন আচরণ আর সুচারু



www.pathagar.com

আতিথেয়তা অবলোকনে অভয়চরণ এই অভয়ই পেয়েছেন যে, স্বভাবে একটু শক্ত হলেও তার মতো একজন রাজপুরুষকে অবশ্যই ভাল লেগেছে তটিনীর। আর তাই তাঁর সেবা যত্নে এমন নিষ্ঠার সাথে শ্রম দিচ্ছে সে। আর একটু তাক লাগাতে পারলেই আর সেই সাথে কিছু লোভ-টোপ ছেটালেই অভয়চরণের চরণতলে লতার মতো লুটিয়ে পড়বে শ্রীমতি। এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে অভয়চরণ তাঁর বিত্ত আর বীরত্বের অলৌকিক দাস্তান প্রতিদিন একটানা বয়ান করে চলেছেন।

কিছুক্ষণ পদচারণার পর অভয়চরণের চরণ দুটি বিকল হয়ে পড়লো। এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে কোথাও না দেখে তিনি তাজউদ্দীনকেই হুকুম করে বসলেন। বললেন–এই মিয়া, দুটো কুরসী আনোতো এখানে?

তাজউদ্দীন বারান্দায় তাঁতের কাজ করছিলো। বরাবরের মতোই সে মশগুল ছিল কাজের মধ্যে। নলীকাঠীর বেপরোয়া খটাশ্ খটাশ্ আওয়াজ ডিঙ্গিয়ে অভয় বাবুর আওয়াজ তার কান অবধি পৌঁছলো না। অভয়চরণ দ্বিতীয় বার আদেশ করতে যেতেই বাধা দিলো তটিনী। বললো–নানা উনি কেন? একটু দাঁড়ান, আমি আমাদের কালাচাঁদকে ডাকি।

তটিনী পা বাড়াতেই অভয় বাবু সামনে এসে দাড়ালেন এবং বললেন–মানে।

উনাকে এটা বলা ঠিক নয়।

কেন, ঠিক নয় কেন?

ইতস্তঃত করে তটিনী বিশ্বাস বললো–না, এগুলোতো চাকর বাকরের কাজ। উনাকে এটা বলা–

অভয়চরণ তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন–কেন উনি কি, কোন মহারাজ?

তা না হোক, চাকর তো নন?

চাকর নয় মানে? ওতো একটা তুচ্ছ যবন। ওর মাথার ওপর পা দিয়ে ওর যে সব স্বজাতিরা চরে বেড়ায়, এখন ঠ্যালার ভয়ে আমাদের একটা আদেশ পালন করতে পারলে, সবাই তারা নেড়ী কুকুরের ছানার মতো আনন্দে লেজ নাড়ে। ওতো কোন ছার।

এসব কথা তটিনীর কানে তপ্ত শলাকার মতো পীড়া দিলো। সে ব্যস্ত হয়ে বললো–না, মানে–

মানে আবার কি! ওতো একটা পথের লোক। এখানে আশ্রয় পেয়ে মাথা গুঁজে আছে। এটা তার মর্যাদায় লাগার আদৌ কোন ব্যাপারই নয়।

না–না, ঠিক তা নয়। জেঠীমা ওঁকে–

অভয়চরণ অসহিষ্ণু হয়ে বললো আরে রাখেন আপনার জেঠী মা। মাথাটা যার ষাড়ের গোবরে ভর্তি, একটা ধোপার গাধার বুদ্ধিও যার ধড় মন্ডুতে নেই, তার আবার সম্মান বোধ –

বলেই তিনি পুনরায় হাঁক দিলেন–আরে এই মিয়া, শুনতে পাওনা?

তটিনী বিশ্বাস অস্থির হয়ে উঠলো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই হাতের কাজ বন্ধ করে তাজউদ্দীন জবাব দিলো জি, আমাকে বলছেন?

তবে কি রাজবাড়ির পাঁঠাকে বলছি?



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন হোঁচট খেলো। বললো–জি?

ঐ যে, উনাদের বৈঠকখানা থেকে দুটো কুরসী এনে পেতে দাও।

তাজউদ্দীন অল্প একটু ভাবলো তারপর সম্মতি জানিয়ে বললো–জি, আচ্ছা। দিচ্ছি।

তাজউদ্দীন পা বাড়ালো। তা দেখে তটিনী বিশ্বাস দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে মর্মদাহ সহরণ করতে লাগলো। এতটুকু সম্মান বোধও কি থাকতে নেই বেয়াকুফটার! বললো আর অমনি তোমাকে ছুটতে হবে চাকরের মতো? প্রতিবাদ করতে না পারো, একটু গড়িমসি করেও তো বুঝিয়ে দিতে পারো এ কাজ তোমার নয়! মানুষ কি এটা হবেই না আসলেই?

এসব ভেবে তটিনী বিশ্বাস ক্ষত বিক্ষত হতে লাগলো। একটু পরেই তাজউদ্দীন দুই হাতে দুই কুরসী নিয়ে হাজির হলো এবং আমগাছের ছায়ার তলে পেতে দিলো। এটা লক্ষ্য করে তটিনীর দুই চোখ ফুটে উঠলো। কি আশ্চর্য। শক্ত কাঠের অত্যন্ত ভারী কুরসী এগুলো। একখানা করে আনতেই একবার করে দম নেয় যে কোন জোয়ান লোক! আর এ লোকটা! এ লোকটা বেড়ালের বাচ্চার মতো দুই হাতে দুইখানা একসাথে নিয়ে এলো! আনার পর কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধও করলোনা। বুদ্ধি না থাক, বল খানিকটা আছে তাহলে! তটিনীর তিক্ত দিলে সান্ত্বনার পরশ লাগলো।

তাজউদ্দীন কুরসী দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। অভয়চরণ আরাম করে একটার ওপর বসে পা দোলাতে লাগলেন। পা দোলাতে দোলাতে তটিনীকে অন্যটায় বসার জন্যে পুনঃ পুনঃ তাকিদ দিতে লাগলেন। নাছোড়বান্দা অভয়চরণ। সাতপাঁচ ভেবে তটিনীও অপরটায় বসে পড়লো অগত্যা।

অভয়চরণ এবার আক্ষেপ করে বললেন–নাঃ! এখানে আর আপনাকে রাখা যায়না এভাবে! আদেশ পালনের লোকের যেখানে এত অভাব, সেখানে আপনি আরাম আয়েশে বাস করবেন কি করে?

তটিনী বিশ্বাস ইষৎ হেসে বললো–তবু এখানে ছাড়া যাবো আর কোথায় বলুন?

কথাটা লুফে নিয়ে অভয়চরণ বললেন–কেন, রাজপ্রাসাদে? দেখবেন মুখ থেকে একটা কথা বের করতে না করতেই একশোটা দাস দাসী এক সাথে ছুটে আসবে আপনার সেই আদেশ পালন করার জন্যে।

তটিনীর ওষ্ঠাধরে একটা হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। সে তাজ্জব হওয়ার ভাণ করে বললো–ওমা! তাই?

তবে আর বলছি কি?

কিন্তু, রাজ প্রাসাদে গিয়ে আমি থাকবো কোথায়?

কেন, আমার বাড়িতে।

আপনার বাড়িতে! আপনার বাড়িতে কোথায়?

আমার কাছে।

আপনার কাছে! অপনার কাছে থাকবো আমি কি ভাবে?

কিভাবে আবার, আমার একান্ত আপনজন হয়ে।

www.pathagar.com

তটিনী এবার হাসিতে লুটোপুটি খেতে লাগলো। হাসতে হাসতে বললো–আপনজন হয়ে? সে আবার কি রকম? আপনি আমাকে নিকাহ্ করবেন নাকি?

অভয়চরণ ভাদুরী এবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন–সে বিধানটা থাকলে আর কথা ছিল?

বড়শীতে গাঁথা মাছের মতো তটিনী বিশ্বাস সূতোর গুঁটি এলিয়ে দিতেই লাগলো। বললো–তাহলে? তাহলে আর আপন জন হবো আমি কি করে?

আমার সখী হয়ে থাকবেন।

সখী?

হ্যাঁ। গেলেই দেখবেন, রাজপ্রাসাদে অনেকের অনেক সখী আছে।

আপনার কয়টা আছে?

আমার?

ভাদুড়ী মশাই ফাঁপরে পড়লেন। ইতস্তত করে বললেন না, মানে, বয়সতো আমার কম, তাই খাস সখী এখনও আমার বানানোই হয়নি কাউকেই। আমি মনোস্থির করে ফেলেছি। আপনাকেই আমি আমার খাস–সখী বানাবো।

আবার তটিনী বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়লো হাসিতে। বললো ওমা–সত্যি? তাহলে তো বলতে হয় নসীব আমার তাগ্‌ড়া।

সেতো একশোবার। তা নাহলে আপনাকে কেন এত ভাল লাগবে আমার? কিন্তু–

কিন্তু কি?

ঐ যে–'নসীব', 'তাগ্‌ড়া'–এসব ম্লেচ্ছ ভাষা কিন্তু ছাড়তে হবে আপনাকে। রাজ প্রসাদে গিয়ে এসব শব্দ উচ্চারণ করলে কেলেংকারী ঘটে যাবে।

কি করবো বলুন, মুসলমানদের একান্ত পাশাপাশি বাস করে অভ্যেস হয়ে গেছে।

খুবই বাজে অভ্যাস!

তা অবশ্য ঠিকই। আসলে এই গোটা বাংলা ভাষাটাই হলো নীচু শ্রেণীর ছোটলোকদের ভাষা। অস্পৃশ্য ইতরদের ভাষা। আমাদের রাজ–রাড়া আর সংস্কৃতজ্ঞ বামুন–পণ্ডিতেরাতো দেবভাষা ছাড়া এক পাও চলতেন না। এ ভাষাকে যারপরনাই ঘৃণা করতেন। রৌরব নরকের ভয় কার অন্তরে না আছে বলুন?

তা বটে, তা বটে। কিন্তু আপনি এসব–

শুনা কথা। আপনাদের মতো জ্ঞানী গুনীদের মুখ থেকেই শোনা। এ ভাষাটা নাকি শুধু কিছু অবুঝ ইতরদের মধ্যেই ছেড়া ভাঙ্গা অবস্থায় পড়েছিল। কোন ভদ্রলোক এর দিকে চোখ তুলেও চায়নি। মুসলমান সুলতানেরা এসেই তো এই অবাঞ্ছিত আর অচল ভাষাটাকে ঝেড়ে মুছে নিজেদের ভাষার কিছু মাল মশ্‌লা ঢুকিয়ে সবল করে চালু করে দিলে।

হ্যাঁ, তাতো ওরা দেবেই। ওদেরতো আর নরকের ভয় নেই!

আর শুধুই কি চালু করে দেয়া? ইতরদের এই ভাষাটাকে আদর করে তুলে এনে আবার রাজধানী–দরবার সবার মধ্যে সেঁটে বসিয়ে দিলে। ওদের আমলে উচু–নীচু নির্বিশেষে আপনারাও তো শুনেছি ঐ সব ম্লেচ্ছ শব্দ হামেশাই আউড়িয়েছেন–না কি বলেন?



www.pathagar.com

হ্যাঁ, তা আউড়িয়েছি বটে। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। ভাষাটা যখন একবার চালু হয়ে গেছে, দেবভাষা আর চলেনা, তখন এটাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া যাবেনা। কিন্তু ঐ ম্লেচ্ছ শব্দগুলো অবশ্যই ছাড়তে হবে আপনাকে।

তা আর বলতে! রাজ প্রাসাদে যাওয়াটা যদি লেখাই থাকে অদৃষ্টে আমার, তাহলে শুধু শব্দ কেন, জানটা ছেড়ে দিতে কি আপত্তি করবো ভেবেছেন?

অভয়চরণ খুশীতে নেচে উঠলেন বললেন–আপনি তাহলে রাজী আছেন?

এই যে, আপনিও কিন্তু ঐ ম্লেচ্ছ শব্দ আওড়ালেন।

এ্যাঁ! তাই নাকি?

আসলে এ ভাষাটাকে না পাল্টালে ওদের সংস্রব থেকে পুরোপুরি রেহাই পাওয়া যাবেনা।

তটিনী যতই তত্ত্ব কথায় যেতে লাগলো, অভয় ততই অধীর হয়ে উঠতে লাগলেন। ভাষাতত্ত্ব বাদ দিয়ে অভয়চরণ আসল দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন–যাকগে ওসব, আপনি তাহলে রাজ প্রাসাদে যেতে সত্যি সত্যিই সম্মত আছেন?

অবশ্যই। রাজ ইচ্ছা পূরণে আপত্তি থাকলে চলে!

তাহলে চলুন, শিগগির আপনাকে আমি নিয়ে যাই রাজপ্রাসাদে?

যেতে তো ইচ্ছে হয় শিগগির। কিন্তু ইচ্ছে হলেই কি সব কিছু হুড়মুড় করে করা যায়? অনেক বাধা বিপত্তি আছে না? আমাদের সমাজ বলে কথা! ওসব বাধা বিপত্তি কায়দা করে কাটিয়ে উঠতে হবে তো? আর সেজন্যে বেশ খানিকটা সময়ের প্রয়োজন।

তটিনী পটে গেছে এই আনন্দেই অভয় তখন বুঁদ। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন–আপনার সম্মতিটাই আমার কাছে যথেষ্ট। সময় যা লাগে তা নিন। ও নিয়ে আমি পীড়া–পীড়ি করবোনা।

তটিনীও বর্তে যাওয়ার ভাণ করে বললো–তাই? এই জন্যেই তো আপনাকে এত ভাল লাগে আমার। কোন কিছুতেই আপনার বাড়াবাড়ি নেই।

খুশীতে গদ গদ হয়ে ভাদুড়ী মশাই জোশের সাথে বললেন–বাড়াবাড়ি আদৌ পছন্দ করিনে আমি। এই দেখুন না। এতদিন এখানে রয়েছি আপনার সাথে। আপনার তরফ থেকে কোন ডাক আসেনি বলে, আমিও বাড়াবাড়িতে যাইনে। আপনি আদর করে আহবান না করলে, অমনটি আমার মধ্যে পাবেনই না কোনদিন।

নিজেকে একজন মহান চরিত্রের লোক বলে তুলে ধরে তটিনীকে আরো অধিক আকৃষ্ট করতে পারলেন ভেবে, অভয়চরণ খুশীতে দোল খেতে লাগলেন। নিজের নিরাপত্তাটা মজবুত করার ইরাদায় তটিনীও এই দিকের ওপর আরো একটু দক চড়িয়ে দিলো। সে প্রচন্ড খুশীর ভাব প্রদর্শন করে উচ্ছ্বাসের সাথে বললো–ওহ্! সত্যিই, আপনার মতো এত ভাল লোকই আর হয়না। আর এইজন্যে আহবানও আপনার একান্তই হক, আর সেটা আপনি সঠিক সময়েই পাবেন।

তটিনীর এ কথায় অভয়চরণের দোল খাওয়ার মাত্রাটা আরো অধিক বেড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ এই ভাবে দোল খেতে খেতে হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন কুরসীটা তাঁর সরিয়ে নেয়া দরকার। সূর্য্যটা ইতিমধ্যে নীচে নেমে আসায় রোদটা সরাসরি তাঁর চোখে মুখে লাগছে। তিনি



www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ফের তাজউদ্দীনকে তলব দিয়ে বললেন–আরে এই–, এসো– তো একটু এদিকে! জল্‌দি–

কি জানি কি ব্যাপার বোধ করে হাতের কাজ বন্ধ করে তাজউদ্দীন ফের ঝটপট অভয়চরণের পাশে এসে দাঁড়ালো। কুরসী খানা দেখিয়ে দিয়ে অভয়চরণ বললেন–এটা সরিয়ে ঐ ছায়ায় নিয়ে পেতে দাওতো! রোদ লাগ্‌ছে।

ভারিক্কী চালে হুকুম করলেন অভয়চরণ। তাজউদ্দীন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মুচকী হেসে বললো–ও, এই ব্যাপার?

অভয়চরণ শক্ত কণ্ঠে বললেন–হ্যাঁ, এই ব্যাপার। দাও শিগগির।

তাজউদ্দীন একবিন্দু নড়লো না। ঐ একই ভাবে বললো–আমি ভাবলাম, কি জানি কি মুসিবতে পড়েছেন আপনি!

তোমার বক্তৃতা শুনতে চাইনে। কাজ করো।

হ্যাঁ, কাজই তো করছিলাম। আপনিই শুধু ঝামেলা করলেন।

তাজউদ্দীন তার তাঁতের দিকে পা বাড়ালো। তা দেখে অভয়চরণ তাজ্জব হয়ে বললো–আরে যাও যে? সরিয়ে দিলে না কুরসীটা?

তাজউদ্দীন মজবুত কণ্ঠে বললো–না।

মানে!

আপনি তো পঙ্গু বা অচল নন। অতিবৃদ্ধ অচল হলে দিতাম, নূলো–খোঁড়া–পঙ্গু হলে দিতাম। শুধু দিতাম নয়, একবারের জায়গায় দশবার হলেও দিতাম কিন্তু আপনার গা–গতর হাত–পা তো মা' শা আল্লাহ মজবুতই আছে!

অভয়চরণ লাফিয়ে উঠে বললেন–তার অর্থ?

তাজউদ্দীন শান্ত কণ্ঠে বললো–খুব কঠিন নয়। মেহমান মানুষ আপনি। তাই মেহমানদারীর খাতিরে ঐ কুরসী দুটো এনে দিয়েছি একবার। জোয়ান তাজা লোক হয়ে এরপরও কুরসীটাকে একটু সরিয়ে নেয়ার জন্যে কোন আক্কেলে আপনি মেজবান কে ডাকাডাকি করেন? এ আদব কোথায় শিখেছেন আপনি?

অভয়চরণ হুংকার দিয়ে বললেন–খবরদার। ছোটমুখে বড় কথা। হুকুম করেছি হুকুম পালন করবে। তোমার কথা শুনতে চায় কে?

তাজউদ্দীন এবার একটু দাঁত চিবিয়ে বললো –এ দুনিয়ায় কেউ কারো গোলাম নয় জনাব। প্রত্যেক ইনসানেরই ইজ্জত আছে সমান সমান। ওপরের ঐ একজন ছাড়া মালিকও কেউ কারো নয়।

হুশিয়ার–

গর্জন করলে আমার গলাটা কিন্তু আপনার চেয়েও বেশী বেয়াড়া। হয়তো অতটা সইতে পারবেন না আপনি।

ইস্পাত কঠিন নজরে তাজউদ্দীন অভয়ের দিকে চেয়ে রইলো। অভয়চরণ থতমত খেয়ে বললেন– মানে?



www.pathagar.com

মুসিবতে কাউকে সাহায্য করা ছওয়াবের কাজ। কিন্তু অলসকে সাহায্য করা গুনাহ্। বেয়াদপ আর দাম্ভিকদের তো সাহায্য করার প্রশ্নই ওঠেনা–

তাজউদ্দিন তার তাঁতের দিকে রওনা হলো। ক্রোধে অভয়চরণ নিজের হাতের আঙ্গুল গুলি নিজেই মুষ্ড়ে ভাংতে লাগলো। তটিনীর অবস্থা বর্ণনার বাইরে। খুশীর আধিক্যে এবং বেপরোয়া বিস্ময়ে তটিনী বিশ্বাসের দুই চোখে তখন আনন্দের আঁসু নেমে এসেছে।

ঠিক এই মুহূর্তে বাহির আঙ্গিনার নীচে ডহর থেকে আওয়াজ এলো–

এই যে, খেলার খেলা পায়রা খেলা,

দ্যাখ্নেওয়ালা দ্যাখ্ এ বেলা

খেলছে খেলা–ভুলুর চেলা

ঘুরে দাঁড়ালো তাজউদ্দীন। বাজীকরকে দেখেই সে তার দিকে ছুটে গেল। খোশ দিলে বললো–আরে এই যে আপনি! আসুন–আসুন–

ডহর থেকেই বাজীকর হাসিমুখে বললো–আপনার জন্যে নতুন বোল্ আছে।

তাজউদ্দীন আগ্রহের সাথে বললো–আহলে আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন–আসুন, শুনিয়ে যান সেটা।

বাজীকর বাড়ির ওপরে উঠে এলো। উঠে এসেই সে ডুগ্ডুগি বাজিয়ে আগেকার ঐ একই বোল্ সমানে হাঁকতে লাগলো। বোল শুনে চারদিক থেকে ছোটবড়ো অনেকে এসে ঘিরে ধরলো বাজীকরকে। শুরু হলো খেলা। ডুগডুগির তালে তালে বাজীকরের কবুতর উল্টে উল্টে খেলা দেখাতে লাগলো। সকলেই তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো এ খেলা। এক পাশে দাঁড়িয়ে তটিনীও এ খেলা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো। সবার চোখেই বিস্ময়। সবার মুখেই হাসি আর অপরিসীম উল্লাস।

শুধু অভয়চরণ অত্যন্ত না–খোশদীলে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তাজউদ্দীনের ঐ ব্যবহার আর এ বাড়িতে তাজউদ্দীনের এই স্বাধীন বিচরণ তারপক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ফুলতে লাগলেন গোস্বায়।

বিপুল উল্লাস আর তারিফের মধ্য দিয়ে শেষ হলো খেলা। দর্শনী হিসাবে তাজউদ্দীন কিছু পয়সা এনে বাজীকরের হাতের মধ্যে গুঁজে দিলো। সেই ফাঁকে বাজীকরও টুকরা ভাঁজ করা কাগজ তাজউদ্দীনের হাতে দিয়ে নীচুগলায় বললো–নতুন বোল্।

পয়সা নিয়ে বিদেয় হলো বাজীকর। উপস্থিত জনতাও বিদেয় হলো একে একে। চিরকুট নিয়ে তাজউদ্দীন তার ঘরের মধ্যে ঢুকলো। রইলেন শুধু অভয়চরণ আর তটিনী।

সকলে বিদেয় হলে তটিনীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন অভয় বাবু। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–এর মানেটা কি হলো?

তটিনী বুঝতে না পেরে বললো–কিসের মানে?

ঐ তুচ্ছ যবনটা এমন দুর্ব্যবহার করলো আমার সাথে, আর কিছুই আপনি বললেন না?



www.pathagar.com

আমি কি বলবো বলুন? ও আমার বাড়ির লোকও নয়, আমার স্বজাতিও নয়। ওর ওপর কি এক্তিয়ার আছে আমার? এছাড়া আমি একজন মেয়ে ছেলে আমি তো আর অপর একজন পুরুষের সাথে ঝগড়ায় নামতে পারিনে?

তা না হয় না পারলেন। কিন্তু এটা? এটা কি? অপনিই এ বাড়ির আদি লোক। আপনার অনুমতির কোন তোয়াক্কা না করে ঐ পরগাছাটা এখানে এমন হাট লাগাবার সাহস পায় কোত্থেকে?

ওতো একটা পাগল। স্বাভাবিক হুঁশবুদ্ধি থাকলে কি আর একটা কথা জিজ্ঞেস করেনা আমাকে?

কিন্তু পাগল বলেই অপনি তা সহ্য করবেন?

না করে কি করতে পারতাম আমি? আঙ্গিনার যে অংশে এই হৈ চৈটা হলো, ওটা ওদেরই অংশ–মানে আমার সেই মেঝো জেঠীমার অংশ। তাদের জায়গায় তারা যদি হৈ চৈ কিছু করেই, আর গাঁয়ের লোক সবাই যদি পছন্দ করে সেটা, সেখানে আমার আপত্তি করতে যাওয়াটা কি আদৌ শোভনীয় হতো, না সে আপত্তি কেউ মানতো? একবাক্যে সবাই আমাকে তিরস্কার করে বসতো না?

তটিনীর এ ব্যাখ্যায় অভয় চরণের আক্রোশ কিছু কমলোনা। তিনি ফুঁশতে ফুঁশতে বললেন–ঠিক আছে, আপনি যখন কিছুই করতে পারবেন না, তখন ওর ব্যবস্থা নিজেই আমি করবো।

তটিনী বিশ্বাস প্রশ্ন করলো–আপনি করবেন মানে?

মানে, রাজনৈতিক কারণে বিনাদোষেই কত যবনের গুষ্টি সাফ করছি আমরা, আর এতো একটা তেলাপোকা। এর এই ঔদ্ধত্য নীরবে সহ্য করবো আমি?

তা–মানে–

রাজধানীতে ফিরে গিয়েই আমি একদল সেপাই পাঠিয়ে দেবো। ব্যাটাকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে চাই।

তটিনী এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেলো। এর যা স্বভাব তাতে এর পক্ষে এটা মোটেই বিচিত্র নয়। এমনিতেই তো সেপাইরা অহর্নিশ লেগেই আছে মুসলমানদের পেছনে। এর ওপর আবার ছুতো নাতা নালিশ একটা পেলে আর কথা আছে? একটু চিন্তা করেই তটিনী ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো–সেপাই পাঠাবেন মানে? কোথায়?

এখানে! এই বাড়িতে।

বাঃ! কি বুদ্ধি আপনার! এই বাড়িতে সেপাই এসে কাকে না কাকে বলে সবাইকে হ্যাস্তন্যস্ত করে যাক! আমার সতীত্ব নিয়েও ছিনিমিনি খেলুক ওরা? এই আপনার ভালবাসা? আমার ওপর এই আপনার দরদ?

অভয়চরণ ভড়কে গেলেন। বললেন, এ্যাঁ!

ঐ পাগলাটাতো বাড়িতেই থাকেনা বেশীক্ষণ। খেয়ালে সব সময় হেথায় হোথায় পড়ে থাকে। সেপাই যখন আসবে, তখন ওর খোঁজে আমাদের এই লাগালাগি বাড়িতে কোন ঘর



www.pathagar.com

বলে কোন ঘরে ঢুকবে ওরা, তার নিশ্চয়তা আছে? আর আমি যদি ওদের নজরে পড়ি, তাহলে আর রক্ষে আছে আমার?

অভয়চরণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তটিনী ফের বললো–সেপাইরা তো আর আপনাদের মতো সব্য ভব্য নয়। গোমূর্খ–বর্বর। কোন কান্ডজ্ঞান আছে ওদের?

তা অবশ্যি ঠিক। কিন্তু–

কোথায় আপনি আর কোথায় ঐ তুচ্ছ একটা পাগলা? তুলনা হয় দুইয়ের মধ্যে। আপনি একজন সম্মানিত রাজপুরুষ আর ও একটা দিন–ভিখারী পথের লোক। আপনি একজন পূজনীয় কুলীন বামুন। হিন্দু আমরা আপনাকে বামুন দিয়ে রেঁধে খাওয়াই, আর ও একটা ম্লেচ্ছ! সমানে সমানে নাহলে লড়াই জমে?

তাঁর সম্বন্ধে তটিনীর দিলে এমন একটা উচ্চমানের ধারণার আভাস পেয়ে অভয়চরণ গর্বে আবার ফুলে উঠতে লাগলেন। বললেন–এটা যা বলেছেন, তা একেবারে খাঁটি কথাই বলেছেন।

মুষিকের সাথে বাঘ–সিংহ লড়াই করতে উদ্যত হলে কেউ তা ভাল চোখে দেখে? এ বাড়িতে বিরাট একটা সম্মান আর মস্ত একটা ভাবমূর্তি আছে অপনার। ঐ তুচ্ছ একটা লোকের পেছনে আপনি যদি ছুটেন, তাহলে আপনার ওজনটা কত নীচে নেমে যায় এ বাড়িতে?

অভয়চরণ অবাক হয়ে তটিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন–কি আশ্চর্য! এত সূক্ষ্ম আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। এদিকটাতো আমি ভেবেই দেখিনি।

আমি গাঁয়ের একজন তুচ্ছ মেয়ে। আপনার জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের তুলনা হয়? আসুন, খামাখা একজন আদনার ওপর রাগ করে নিজের ওজন কমাবেন কেন? দেখবেন ওই আবার পরক্ষণে কত কাজ করে দেয় আপনার।

আমার কাজ করবে ও?

করবে মানে? হামেশাই তো করে। আপনার জন্যে মাছ ধরা বাজার করা, খড়ি ফাড়া,–কালাচাঁদ কি একা এতটা পারে? ও–ই তো করে সব সময়। আসুন–

তাই নাকি?

তো আর বলছি কি! চলুন–

আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন–

অভয়কে নিয়ে তটিনী বিশ্বাস বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ঘরের ভেতরে ঢুকে বাজীকরের দেয়া ঐ চিরকুটটায় চোখ বুলাতেই তাজউদ্দীনের ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। চিরকুটটা হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর সে চিরকুটটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ঘরের বাইরে ফেলে দিলো। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করার



www.pathagar.com

পর সে বিছানায় এসে টান হয়ে শুয়ে পড়লো এবং দুই হাত মাথার তুলে দিয়ে চোখ বুজে রইলো।

তাজউদ্দীনের ঘরের দুইদিকে দুই দুয়ার–একটা অন্দর মুখী, অপরটা বহির্মুখী। তটিনী বিশ্বাস অকস্মাৎ এই অন্দর মুখী দুয়ারে এসে দাঁড়ালো। তাজউদ্দীনের কাছে এমন সরাসরি আসা তটিনীর এই প্রথম। চৌকাঠটা ডিঙ্গিয়ে তাউউদ্দীনকে ঐ অবস্থায় দেখে সে ভাবলো, তাজউদ্দীন নিদ্রামগ্ন। ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই মানুষের পায়ের আওয়াজে চোখ মেললো তাজউদ্দীন। তটিনীকে ঘরের মধ্যে দন্ডায়মান দেখে সে যারপরনাই তাজ্জব বনে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে বিস্মিত কণ্ঠে বললো–একি! আপনি!

ইষৎ হেসে তটিনী বিশ্বাস বললো–ভয় পেলেন বুঝি?

না–মানে, আপনি হঠাৎ এখানে?

অবাক হয়ে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। মানে কাউকে দিয়ে আমাকে তলব দিলেই তো আমি গিয়ে হাজির হতাম।

কেন, আমার এখানে আসতে নেই?

তা–মানে–

আগে তো আমি হামেশাই এঘরে আসতাম।

কিন্তু এখন তো আর সে অবস্থা নেই।

কেন, এখন বুঝি কোন অমুসলমান ঘরে এলে নাপাক হয় ঘর?

ছিঃ ছিঃ! এসব কি বলছেন? আমি সে কথা বলছিনে।

তাহলে কোন কথা?

মিটি মিটি হাসতে লাগলো তটিনী। তাজউদ্দীন কথা খুঁজে না পেয়ে বললো–মানে, এখন আমি কোথায় আপনাকে বসতে দেই?

বসতে আমি আসিনি।

তবে?

দুটো কথা বলতে এসেছি।

বলুন–

এইযে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য হয়ে পড়ে থাকেন, আসলে এ লোক তো আপনি নন?

চমকে উঠলো তাজউদ্দীন। নিজেকে সংযত করে বললো–মানে?

যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি আছে আপনার। আর সে জ্ঞান আপনার এতই গভীর আর সূক্ষ্ম যা অনেক লোকেরই নেই।

এ্যাঁ!

নিজের ইযযত সম্বন্ধেও আপনার দৃষ্টিভঙ্গি তারিফ পাওয়ার যোগ্য। গায়ে আপনার শক্তি–বলও প্রচুর। তবু এভাবে এমন অপদার্থের মতো আপনি পড়ে থাকেন কেন? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না কেন? হৃদপিন্ডটা কি আপনার এতই কমজোর?

জি?



www.pathagar.com

এতগুণ থাকতেও সকলের এত উপেক্ষা আর উপহাস কেমন করে বরদাস্ত করেন আপনি?

ও এই কথা?

হ্যাঁ এই কথা। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তিবল কিছুমাত্র নেই, তারা কেমন সব সময়ই বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, আর আপনার সবকিছু থাকতেও দিলে আপনার জোর আসেনা কেন? কাপুরুষের মতো এমন গুড়িশুঁড়ি মেরে পড়ে থাকেন কেন?

তাজউদ্দীন এক নজরে তটিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। লক্ষ্য করলো, তার চোখে মুখে এক ঐকান্তিক আরজু! তটিনী তাকে হিম্মতদার দেখতে চায়।

এক অনাঘ্রাত সুবাসের কিঞ্চিৎ ঢেউ এসে তাজউদ্দীনের দিলে একটা ছোঁয়া দিয়ে গেল। ক্ষণিক নীরব থেকে তাজউদ্দীন বললো-দেখুন-ঘরদুয়ার চাল-চুলা বলতে কিছুই আমার নেই। জ্ঞান বুদ্ধিও আপনি যা ভাবছেন, তার অর্ধেকটাও নেই। আর পাঁচজনের মতো আমার কি কোন কিছুতে বাহাদুরী করা চলে?

বাহাদুরী আপনি না করুন, সিনাটা একটু টান করে চলবেন তো!

বড় বিপর্যস্ত আমার এ জিন্দেগী বুঝলেন? আমার মতো জীবন যাদের তাদের সিনা টান ঢিলেতে কি এমন এসে যায়?

অনেক খানি এসে যায়।

মানে?

আপনাকে নিয়ে লোকে যখন হাসাহাসি করে তখন আমার কষ্ট হয়।

কষ্ট হয় আপনার?

খুবই কষ্ট হয়। আপনার মতো এমন একটা সৎ-সুন্দর মানুষের এই জিল্লতি আমি সহ্য করতে পারিনে।

সত্যি?

সত্যি।

কেন?

জানিনে।

তটিনীর মুখমন্ডল লাল হয়ে উঠলো। তাজউদ্দীন বললো-এই বলতেই এসেছিলেন?

হ্যাঁ। সেই সাথে আপনার কাছে মাফ চাইতেও এসেছি।

মাফ!

না জেনে আমিও আপনাকে কম উপহাস করিনি। আসলে আপনার এই তুলনাহীন আচরণ আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মগজে আমাদের ঢুকেনি বলেই নির্বোধ নালায়েক বোধে বরাবরই তাচ্ছিল্যের চোখে আপনাকে আমি দেখেছি আর খোঁচা দিয়েছি কথায় কথায়। এসব এখন মনে হতেই লজ্জায় আমার দুই চোখ ঢেকে আসছে।



www.pathagar.com

তটিনী বিশ্বাস অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠলো। তাজউদ্দীন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–আরে না–না। আপনি আমাকে এমন কোন তাচ্ছিল্যও করেননি। আর আমিও এমন কোন অতিমানব নই। এ নিয়ে এত পেরেশান হওয়ার কি আছে?

কি আছে না আছে জানিনে। পারলে মেহেরবানি করে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন– এই আরজুটুকু রইলো আমার–

তটিনীর কণ্ঠস্বর খানিকটা কেঁপে উঠলো। সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার গমনপথের দিকে একনজরে চেয়ে রইলো তাজউদ্দীন।

## ৫

সেদিন বাদ মাগ্‌রিব ধুমাদিঘীর নির্জন আম বাগানে জন সমাগম ঘটতে লাগলো। দেখতে দেখতে আম বাগান জনাকীর্ণ হয়ে গেল। এই জনতার অধিকাংশই সেপাই। ভাগ্যাহত সেপাই। বিভিন্ন স্থানে এই সেপাইরা বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। গোপনস্থানে লুকানো থাকে প্রত্যেকের হাতিয়ার–তীরধনুক, নেজা–বল্লম, ঢাল–তলোয়ার। ঘোড়া থাকে বিশ্বস্ত গৃহস্তদের গৃহপালিত পশুর সাথে। ডাক পড়লেই এরা এসে জমায়েত হয় এক জায়গায়। পয়দা হয় বিপদ–মুসিবত মোকাবেলার এক বাহিনী। এদের পেছনে শ্রম দেন শায়খ আনোয়ার, শায়খ জাহিদ, আলেম ওলামা, সুফী দরবেশ ও বুজুর্গান ব্যক্তিবর্গ। পয়সা আসে বিভিন্ন খানকা–মাদ্রাসা আর অতিথি শালা থেকে। সুফী হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেবের ভান্ডার এদের জন্য অকৃপণ।

আজ এদের ডাক পড়েছে ধুমাদিঘির আম তলায়। শায়খ হোসেন সাহেবের ছেলেকে ফের খুন করেছেন রাজা গণেশ। অসংখ্য মুসলমানদের আহরহ খুনতো তিনি করছেনই, ইদানিং সুফীদরবেশের ওপরও হাত তুলছেন নির্দ্বিধায়। তাই বিক্ষুব্ধ ওলামাকুল গণেশের পতন কামনা করে মোনজাত করেছেন মসজিদে। পুত্রহারা শায়খ হোসেন সাহেবের খানকা মসজিদে এই প্রকাশ্য মোনাজাতের পয়গাম রাজা গণেশের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। পয়গাম পেয়েই গর্জে উঠেছেন রাজা গণেশ–তবেরে–

গোপন খবরঃ আজ রাতেই অতর্কিতে হামলা করে শায়খ হোসেন সাহেবকে সপরিবারে খতম করে দেয়া হবে এবং তাঁর ঘরবাড়ি খানকা–মসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। একদক্ষ সেনাপতির অধীনে একদল সুশিক্ষিত ফৌজের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।



www.pathagar.com

শায়খ হোসেন সাহেবের মকানের ওপর গণেশ বাহিনীর আজকের এই আসন্ন হামলা কোন মামুলী হামলা নয়। গ্রামগঞ্জের সাধারণ মুসল্লীদের ওপর হামলা করা নয়। এটা একটা পরীক্ষা মূলক হামলা। কোন শায়খ-সূফী-দরবেশের আস্তানার ওপর এভাবে সরাসরি হামলা করার আজ পর্যন্ত সাহস করেননি রাজা গণেশ। সুফী দরবেশদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে রাজা গণেশের দিলে একটা রীতিমতো দুর্বলতা আছে। ডেকে পাঠিয়ে বা বাইরে থেকে ধরে এনে কোতল করা হলেও, সরাসরি কোন সুফীদরবেশের আস্তানার ওপর ফৌজ পাঠাবার সাহস তিনি করেননি। নির্বিঘ্নে এই হামলা সুসম্পন্ন হলে এবং এতে কোন বিপর্যয় দেখা না দিলে, এমন হামলা চলতেই থাকবে অতঃপর। ছোটখাটো সুফী দরবেশের আস্তানা থেকে এ হামলা হজরত নুর কুতুব-ই-আলমের খানকা পর্যন্তও গড়াবে।

সাধারণ মুসলমানদের নিয়ে রাজা গণেশের তেমন দুশ্চিন্তা নেই। যে কোন সময় পিঁপড়ের মতো মারতে পারবেন তাদের। দুশ্চিন্তা এই সুফী দরবেশদের নিয়ে। এ কওমের এরাই হলো কেন্দ্রবিন্দু। এদেরকে নির্মূল করতে না পারলে, এদেশ থেকে ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করার অভিযান তাঁর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এ হামলার গুরুত্ব তাই অত্যন্ত বেশী। অধিক ফৌজের জটিলতা এড়িয়ে অতি দক্ষ স্বল্প সৈন্যের তড়িৎগতিশীল ও কর্মতৎপর এই বিশেষ বাহিনী তৈরী করেছেন রাজা গণেশ। আজ এরা সফলতা অর্জন করতে পারলে, এই কিসিমের কাজই হবে এক মাত্র কাজ এদের। প্রকাশ্য দিবালোকে এই ধরণের বীভৎসতা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণ ঘটাতে পারে ভেবে রাত্রির অন্ধকারে গোপন হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একমাত্র অলৌকিক শক্তি ছাড়া দিবালোকেও এই বাহিনীর হামলা সুফী মোল্লা-মুসল্লীরা রোধ করতে পরবেনা। রাত্রিকালে অতর্কিত এ হামলা রোধ করার প্রশ্নই উঠেনা।

অত্যন্ত তকলিফ করে রাজধানী থেকে এ তথ্য ভবঘুরে ভুলুখাঁ সংগ্রহ করে এনেছে। ভুলু খাঁ এক করিতকর্মা নওজোয়ান। বাউলের দলে সে একজন সেরা বাউল। খেলোয়ার দলে সে সকলের উস্তাদ। সাপুড়ে বেদে-বাজীকর সবার সে গুরু। কিন্তু এসব কাজের কোনটাতেই বিশেষ কোন পারদর্শিতা নেই তার। সবটাই সে চালিয়ে যেতে পারে এইটেই তার যা কৃতিত্ব। শুধু মেধা, কৌশল, আর ব্যক্তিত্বগুণে সে পারদর্শীদের ওপর প্রভূত্ব বিস্তার করেছে। তাদের সকলের স্বতস্ফূর্ত শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। তার যে কোন হুকুম তামিল করতে পারলে এরা প্রত্যেকেই নিজেকে ধন্য এবং গৌরবান্বিত মনে করে। ভুলুখাঁর জন্যে এককাতারে জান দিতে এরা হরওয়াক্ত খাড়া। ব্যবহার গুণে ভুলু খাঁ এদের সকলের মাথার মণি।

ভুলু খাঁর নামটাও ঠিক ভুলু খাঁ নয়। বাহালুল খাঁ। বাহালুলকে নিজেই সে ভেঙ্গে চুরে ভুলু করে নিয়েছে। ভবঘুরেও নয় সে। চৌকষ এক যোদ্ধা। এই সেই বাহালুল খাঁ। পাণ্ডুয়ার এক পারদর্শী সৈনিক। তৌহিদ বেগের পাশে দাঁড়িয়ে সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর পক্ষে বীরত্বের সাথে লড়েছে যে বাহালুল খাঁ, এই সেই বাহালুল খাঁ। তৌহিদ বেগ নজরে পড়েছে সবার। তাই তৌহিদ বেগকে হারিয়ে যেতে হয়েছে। বাহালুলকে সনাক্ত কেউ করেনি। তাই সে নির্বিঘ্নে ঘুরে ফিরছে সর্বত্র পথে, ঘাটে, রাজধানীতে।



www.pathagar.com

এই বাহালুল ওরফে ভুলু খাঁই ধুমাদীঘিতে জমায়েত এই ভাগ্যহারা সেপাইদের সহকারী অধিনায়ক। অধিনায়ক তৌহিদ বেগ।

সেপাইদের একত্র করে নিয়ে ভুলু ওরফে বাহালুল খাঁ আজকের এই এস্তেলার কারণ ব্যাখ্যা করলো। সে জানালো–শায়খ হোসেন সাহেবের পরিবারের ওপর এই আসন্ন হামলা প্রতিহত করাই আজ তাদের কাজ।

শায়খ হোসেন সাহেবের পরিবারের ওপর রাজা গণেশের জুলুমের বিস্তারিত বিবরণ বয়ান করে শুনালেন সুফী হযরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেবের আওলাদ শায়খ আনোয়ার সাহেব।

মযলুমের বাসস্থান ও খানকা মসজিদের অবস্থান সম্বন্ধে সেপাইদের সম্যক ধারণা দিলেন শায়খ আনোয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র শায়খ জাহিদ সাহেব।

রাত্রির অন্ধকারে ধুমাদীঘির নির্জন আম্রকানন সেদিন সেপাইদের নিদারুণ আক্রোশ আর দৃঢ় সংকল্পে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

সহকারী অধিনায়ক ভুলু খাঁর আদেশে সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করলো। প্রয়োজনীয় আহার ও পানীয় নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন উপস্থিত আলেম ওলামা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত হয়ে এলো। রাতও বাড়তে লাগলো। কিন্তু তৌহিদ বেগের তখনও পাত্তা নেই। তা দেখে শায়খ আনোয়ার সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ভুলু খাঁকে বললেন, কি ব্যাপার খাঁ সাহেব, তৌহিদ বেগ সাহেবের কাছে পয়গামটা আসলেই পৌঁছেছে তো? ভুলু খাঁ প্রত্যয়ের সাথে বললো–জরুর। আমার চেলারা দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সজাগ। প্রাণান্তেও কেউ এতটুকু গাফিলতি করবেনা।

কিন্তু এখনও যে বেগ সাহেব এসে পৌঁছলেন না?

বড় অসময়ে পয়গাম গেছে তাঁর কাছে। তাই হয়তো পৌঁছতে তাঁর বিলম্ব হচ্ছে।

শায়খ জাহিদ সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন–তাঁর কাছেই পয়গাম গেল অসময়ে? যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যে আমাদের তো তাহলে লোক বাড়াতে হয়?

ভুলু খাঁ হেসে বললো, সে ব্যবস্থা জোরদারই আছে আমাদের। এর চেয়ে অধিক লোক বাড়ালে গোপনীয়তা বজায় রাখা যাবেনা।

জাহিদ সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন–তাহলে বেগ সাহেবের কাছে পয়গামটা আরো আগে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলোনা কেন?

এই হামলার খবর যোগাড়ই তো করলাম আমি অসময়ে। এর পর আর সময় পেলাম কৈ?

না–মানে–

একা আমি কদিক আর সামলাই বলুন? অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে রাজধানীতে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে আমাদের আরো দক্ষ কিছু গোয়েন্দার প্রয়োজন, খবর–পরিবেশক নয়। পাশে আমার আর দু'একজন শক্ত লোক থাকলে এই অসুবিধাটা হয়না।

শায়খ আনোয়ার সাহেব বললেন, তাহলে বেগ সাহেবকে নিয়ে এ ব্যাপারে বসতে হয় আমাদের?



www.pathagar.com

ভুলু খাঁ বললো–হ্যাঁ, আজকের এই ঝামেলাটা পার করে দেয়ার পরই বসতে হবে আমাদের। নইলে একা আমি আর পারিনে। এই দেখুন না, রাজধানী থেকে ফিরে সেপাইদের এবং আপনাদের সবার সাথে যোগাযোগ করতে কি অবস্থা আমার?

জাহিদ সাহেব বললেন–সেতো অবশ্যই। কিন্তু আমি যা বলছি তাহলো–আমরা তো বেশ আগেই আপনার পয়গামটা পেয়েছি। পয়গামটা আমাদের আগেনা পাঠিয়ে বেগ সাহেবকে আগে পাঠালেই পারতেন!

ভুলু খাঁ ইষৎ হেসে বললেন–তা পারতাম। কিন্তু আপনারাও তো জানেন, আপনাদের কাছে পয়গাম অনেককে দিয়েই পাঠানো যায়, তাঁর কাছে তা যায়না। সঙ্গত কারণেই তাঁর ঠিকানা খুব অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত চেলা ছাড়া অন্য কোন চেলাই তা জানেনা। আমার সেই চেলাদের একজনকেও সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে পাইনি।

ও, আচ্ছা!

এনিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে উৎকণ্ঠার সাথে সকলেই তৌহিদ বেগের এন্তেজার করতে লাগলেন।

তৈরী হয়ে সেপাইরা এসে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ালো। রাতও আরো বেড়ে গেল। আর অপেক্ষা করা সমীচিন নয় আদৌ। রাতের যে কোন সময় দুশমনেরা এসে শায়খ হোসেন সাহেবের মকানে আঘাত হানতে পারে। তাদের বিলম্ব হলে গজব যা হবার তা হয়ে যাবে। দুশমনদের আগমনের আগেই ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের অবস্থান নেয়া চাই–ই। কিন্তু তখনও নেই তৌহিদ বেগ।

নায়ক ছাড়া নাটকের মতো অধিনায়ক ছাড়া লড়াই এর এক অস্বস্তিকর সংকল্প নিয়ে ভুলু খাঁ যখন ফৌজের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো–ঠিক তখনই সবার কানে এলো এক দ্রুত ধাবমান অশ্বপদ শব্দ। উদগ্রীব হয়ে সবাই সে দিকে নজর দিতেই তৌহিদ বেগের অশ্ব এসে সবার সামনে থামলো। ভগ্নোৎসাহ জনতা ফের উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

সফেদ শিরস্ত্রাণ পরিহিত মুখোশ–আঁটা তৌহিদ বেগ অশ্ব থেকে লাফ দিয়ে নেমেই সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো–পেরেশান হবার কারণ নেই। আমি শায়খ হোসেন সাহেবের মকান হয়েই আসছি। সেখানকার পরিবেশ পথ–ঘাট সরজমিনে বুঝে নিতে আমার একটু সময় লাগলো। সম্ভাব্য সকল রাস্তার মুখেই লোক বসিয়ে দিয়েছি। দ্রুত গামী অশ্ব আছে তাদের সাথে। দুশমনের আগমন বার্তা আগেই আমরা পাবো।

মারহাবা! মারহাবা!

উপস্থিত জনতা উল্লাসে আওয়াজ দিলো।

তৌহিদ বেগ ফের বললো–শায়খ সাহেবের বাড়ির তিনদিকেই ঘন বন। একদিকে সামান্য একটু খোলা। ঐ বনের মধ্যেই অর্ধচন্দ্র আকারে অবস্থান নেবো আমরা। ওখান থেকেই দুশমনদের চারদিক দিয়ে ঘেরাও করা হবে।

অতঃপর এই অভিযানের কৌশলগত কতকগুলো দিক সম্পর্কে সেপাইদের অবহিত করে এবং সৎকাজে আল্লাহর রাহে জান কোরবান করার উদ্দীপ্ত আহবান জানিয়ে সে ভুলু খাঁকে



www.pathagar.com

বললো–খাঁ সাহেব কওমের খেদমতে আপনার এই তকলিফ তুলনার অতীত। তারিফ করে আপনাকে আর খাটো করতে চাইনে। সেপাইদের নিয়ে আপনি আমাকে অনুসরণ করুন।

উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং কামিয়াবীর জন্যে তাদের দোয়া প্রার্থনা করে তৌহিদ বেগ তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। ভুলু খাঁ তার পেছনে সসৈন্যে রওনা হলো।

রজনী দ্বিপ্রহর। দশদিক নিঃঝুম! নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে নগর–বন্দর–বস্তি। অন্ধকারের আবরণে বেমালুম হারিয়ে গেছে এ জাহানের অস্তিত্ব। একমাত্র হুতুম পেঁচার সবিরাম আওয়াজ সঙ্গীহারা খেঁকশিয়ালের ক্ষণিক বিলাপ আর নেড়ীকুত্তার নেতিয়ে পড়া কান্নাটাই মুর্দা বিশ্বের নশ্বর দেহে প্রাণ সঞ্চার করছে।

শায়খ হোসেন সাহেবের পাড়াটাও গভীর নিদে অচেতন। অচেতন অন্যান্য তামাম মখলুকাত। শুধু জেগে জেগে প্রহর গুণছে তৌহিদ বেগের বাহিনী। অরণ্যের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে আছে তারা। হামলাকারী দুশমনদের তখনও কোন খবর নেই। তাদের আগমন সম্পর্কে ক্রমেই একটা সন্দেহের ছায়া এন্তেজাররত সেপাইদের মনে দানা বাঁধতে লাগলো। ভুলু খাঁর দিলও দোল খাচ্ছে বিভ্রান্তির দোলায়। তবে কি ভুল পয়গাম বয়ে এনেছে সে?

ছুটে এলো সদর রাস্তার প্রহরী। সে ব্যস্ত কণ্ঠে জানালো দুশমন নযদিক। অত্যন্ত নিকটে এসে গেছে তারা এবং হাতে হাতে মশাল জ্বেলে নিচ্ছে।

তৌহিদ বেগের মুখমন্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। সে খোশদিলে আওয়াজ দিলো–আলহাম্দু লিল্লাহ! মশালের ঐ আলোই হবে ওদের জীবনের আলো নিভিয়ে দেয়ার মদদ্দার।

নেজা–বল্লম আর তীর–ধনুক নিয়ে তৈরী থাকার নির্দেশ সে তৎক্ষণাৎ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিলো। জানিয়ে দিলো–সামনা সামনি লড়াই এর তেমন প্রয়োজনই আর হবেনা। ঐ মশালের আলোতে এক একজনকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারবে তীর–বল্লম –নেজা। কি দিয়ে কি হচ্ছে তা বুঝে ওঠার আগেই দুশমনদের সবাইকে শুইয়ে দেয়া চাই।

হলোও ঠিক তাই। শায়খ হোসেন সাহেবকে সপরিবারে পুড়িয়ে মারার ইরাদায় এবং তাঁর খানকা–মসজিদ–ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করার লক্ষ্যে, রাজা গণেশের এই বিশেষ বাহিনী অল্পক্ষণের মধ্যেই মশাল হাতে এসে শায়খ হোসেন সাহেবের মকানের বাহির আঙ্গিনায় দাঁড়ালো। প্রজ্জ্বলিত মশালের দেদীপ্যমান আলোতে শায়খ হোসেন সাহেবের বাহির আঙ্গিনা দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অপরদিকে আলোকিত এই আঙ্গিনাটুকুর বাইরে রাত্রির অন্ধকার আরো অধিক ঘন হয়ে জমাট বেঁধে গেল।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঐ জমাট বাঁধা অন্ধকারের আড়াল বেয়ে তৌহিদ বেগের বাহিনী দুশমনদের একেবারে সন্নিকটে চলে এলো এবং বিদ্যুৎবেগে দুশমনদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো। আলোতে অবস্থিত দুশষমনদের সবাইকে তারা দিনের মতো দেখতে লাগলো। কিন্তু



www.pathagar.com

দুশমনদের একজনও তাদের কাউকে দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা, অন্ধকারের মধ্যে তাদের এই অবস্থানের আভাসটুকুও পেলোনা।

মশাল হাতে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নেয়ার পর রাজার ফৌজ শায়খ সাহেবের মকানের ওপর হামলা চালানোর উদ্যোগ করতেই তাদের মাঝে নেমে এলো এক অভাবনীয় বিপর্যয়। অকস্মাত চারদিক থেকে বৃষ্টির মতো ছুটে এলো তীর-বল্লম নেজা। অভ্রান্ত নিশানা। চোখের পলক না পড়তেই দুশমন বাহিনীর অর্দ্ধেকটাই মরণ চীৎকার তুলে ঢলে পড়লো ধূলায়। অবশিষ্ট দুশমনেরা হতভম্ব অবস্থায় ব্যাপারটা বুঝে ওঠার চেষ্টা করতেই তাদের আবার অর্দ্ধেকটা গড়িয়ে পড়লো অমনি ভাবে।

অবস্থা আঁচকরে আতংকিত সেনাপতি বাদবাঁকী সেপাইদের তৎক্ষণাৎ হাতের মশাল ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলো। নির্দেশ পালন করাতে শেষরক্ষে না হলেও পরিস্থিতির মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো। সবদিকে সমানভাবে অন্ধকার বিরাজ করায় তৌহিদ বেগের সেপাইদের নেশানা আর আগের মতো অব্যর্থ হলোনা। বরং অনেকটাই ব্যর্থ হতে লাগলো। এই ফাঁকে দুশমনেরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তৌহিদ বেগের বাহিনী-তাদের ঘিরেছিল চারদিক দিয়ে। এই ব্যূহভেদ করে তারা বেরিয়ে যেতে পারলোনা। বরং ঘুরে ফিরে এসে তৌহিদ বেগের সেপাইদের হাতের মধ্যেই পড়তে লাগলো। রাজার ফৌজ। মরতে লাগলো আচমকা।

দুশমনদের সংখ্যা ক্রমেই নগণ্য হয়ে এলো। এই আতংকগ্রস্ত নগণ্য ফৌজ নিয়ে দুশমনপক্ষের সেনাপতি লড়াইয়ের নামে ক্ষণকাল ইতস্তত ছুটোছুটি করলো। অবশেষে ক্ষণিকের মধ্যেই অবশিষ্ট তামাম সেপাইসহ রাজা গণেশের এই অতিদক্ষ সেনাপতির ইহ জিন্দেগীর খোয়াব এক হয়ে মিশে গেল শায়খ হোসেন সাহেবের পগারের আবর্জনার সাথে।

রাত তখন শেষ প্রায়। দুশমনদের অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে তৌহিদ বেগের বাহিনী তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো ধুমাদীঘির আম বাগানে। ধুমাদীঘিতে পৌঁছেই তৌহিদ বেগ তার সেপাইদের বিদায় করে দিলো এবং শায়খ হোসেন সাহেবকে কিছুদিনের জন্যে তাঁর মকান থেকে সপরিবারে অন্যত্র সরিয়ে রাখার দায়িত্ব ভূলুর ওপর অর্পণ করলো। এরপর ভূলু খাঁর সাথে কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে রাজধানীতে গোয়েন্দা গিরির কাজে ভূলু খার সাহায্যে নিজেই সে আসবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে তৌহিদ বেগ স্বস্থানে ফিরে গেল।

প্রচণ্ড আর্তনাদ আর হৈহল্লোড়ে আতংকিত আশেপাশের জনতা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শায়খ হোসেন সাহেবের মকানে এসে তাজ্জব হয়ে দেখলো-শায়খ সাহেব সপরিবারে সহি সালামতেই আছেন, কিন্তু তাঁর মকানের সামনে লাশ আর লাশ।

লাশ গুলো যে তামামই রাজা গণেশের ফৌজের এটা সনাক্ত করতে উপস্থিত জনতার কাউকেই তকলিফ পেতে হলোনা। কিন্তু কার হাতে এই ফৌজের এই হালত হলো, মাথা কুটেও কেউ তা অনুমান করতে পারলোনা। তবে এটা সবাই অনায়াসে উপলব্ধি করলো যে, শায়খ হোসেন সাহেবকে সপরিবারে ধ্বংস করার মানসেই এই রাজফৌজের এখানে আগমন ঘটেছিল।



www.pathagar.com

সংগে সংগে কিংবদন্তির মতো এক অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হলো এনিয়ে। সকলেই বলাবলি করতে লাগলো–শায়খ সাহেব আল্লাহ ওয়ালা মানুষ। তার মকানে চড়াও হলে আল্লাহ এটা বরদাস্ত করবেন কেন? তিনি নিজ হাতে এই ঔদ্ধত্যের উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

এটা অবিশ্বাস করার মতো যুক্তি তেমন ছিলনা। কারণ রাজার এমন সুশিক্ষিত বাহিনীকে তাঁর রাজ্যের মধ্যেই এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মতো শক্তি এ রাজ্যে কোথাও বিদ্যমান আছে বলে কারো জানা ছিলনা। সবাই জানতো রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে একমাত্র মুসলমান সুফীসাধক আর ওলামায়ে কেরামরা। একমাত্র অলৌকিক শক্তি ছাড়া তাদের এমন কোন শক্তি নেই যে তারা এমন একটি সু সংগঠিত বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারেন।

এই অলৌকিক কাহিনীর কথা তৌহিদ বেগ আর ভুলু খাঁর কানে যখন পড়লো তখন তারা আল্লাহ পাকের শুক্‌রিয়া আদায় করলো। এতবড় একটা প্রলয় ঘটানোর পরও তারা নির্বিঘ্নে পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেল এটা তাদের জন্যে মস্ত একটা সুবিধে বই কি! সবই আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ছাড়া এই হামলার খবরও ভুলু খাঁ পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করতে পারতোনা।

এই খবর রাজার কানে পৌছামাত্র তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ মন্ডল ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ব্যাপারটা যে পুরোপুরি অলৌকিক একটা কিছু–এটা তিনি সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নিতে পারলেন না। আর তা পারলেন না বলেই তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছোট একটা সেনাদল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে–এটা কোন চিন্তার ব্যাপার নয় তাঁর। এমন অনেক ফৌজ অনেক ক্ষেত্রেই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁর চিন্তার কারণ–ছোট হলেও, এমন একটা সুদক্ষ বাহিনীকে এমন ভাবে ঘায়েল করেছে যে শক্তি, সেই শক্তি। সে শক্তি নগণ্য নয় মোটেই। এমন একটা ভয়ংকর শক্তি রাজ্যের মধ্যে বিরাজ করলে কোন রাজাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। রাজা গণেশ গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন–কোথা থেকে এলো এ শক্তি? কে আছে এর পেছনে? তবে কি তৌহিদ বেগ!!

তিনি সন্ত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ দরবার ডেকে বসলেন। পাত্র–মিত্র–সালারদের ওপর যারপরনাই তম্বি করলেন। গোয়েন্দাদের তৎপরতা কয়েকগুণে বাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু এতটা করার পরও, অলৌকিক শক্তির দিকটা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। তার অবচেতন মনে এটা সক্রিয় হয়েই রইলো। আর এর ফলে, কোন সুফী সাধকের খানকা–মসজিদ–মকানে ফৌজ পাঠানোর সাহস আপতত আর কিছুতেই তাঁর হলোনা।

www.pathagar.com

# ৬

মুহসীন বিশ্বাসের নির্দেশে বাঁশবাড়ির ঐ ফৌজী হামলার খবর নিয়ে সুফী সাহেবের খানকা শরীফে গমন করার পরবর্তী কাল থেকেই তাজউদ্দীন বেশ খানিকটা আওয়ারা। একটু একটু করতে করতে এখন সে বেশীরভাগ সময়ই গাঁয়ের বাইরে ঘোরে। তাঁতের কাজে আর বেশী বসেই না সে এখন। সে সময়ই সে পায়না। কখন কোথায় বেরিয়ে যায়, কখন কোথায় রাত কাটায়–তার কোনই ঠিক ঠিকানা নেই।

এটা লক্ষ্য করে মরিয়ম বিশ্বাস একদিন তাকে ডেকে বললেন–বাবা, আমার এই সংসারটা গোটাই তো তোমার। যদি চাও এখনই আমি লিখে দিতে রাজী। তবু তোমাকে আমি এইভাবে বাউরের মতো ঘুরে বেড়াতে দেবোনা।

আচমকা এই প্রসঙ্গ ওঠায় তাজউদ্দীন থতমত খেয়ে গেল: বললো–জি?

মরিয়ম বিশ্বাস বললেন–ইদানিং লক্ষ্য করছি, তোমার মন এখানে টিকছেনা। আহার বিশ্রামেও তোমার তেমন নজর নেই। হুট্ করে কখন কোথায় চলে যাও, কাউকে তা বলেও যাও না, আবার ঠিকমতো ঘরে ফিরেও আসোনা। এখানে কি কোন অসুবিধা হচ্ছে তোমার?

তাজউদ্দীন শরমিন্দা কণ্ঠে বললো–ছিঃ! ছিঃ! একি বলছেন? অসুবিধে হবে কেন? আপন মায়ের স্নেহ কেমন সেটা আমার খেয়াল নেই। আমার মনে হয় তার চেয়ে একবিন্দু কম স্নেহ আপনি আমাকে করেন না। আমার আহার–নিদ্রা সুখ–শান্তির জন্যে সর্বক্ষণই আপনি ব্যতিব্যস্ত থাকেন। এর চেয়েও অধিক কোন সুখের জায়গা কোথাও আর থাকতে পারে? আমার এত স্নেহ এত দরদ আর কোথায় পাবো আমি?

তাহলে আর আগের মতো ঘরে থাকোনা কেন? যখন তখন উধাও হয়ে কোথায় যাও তুমি?

তাজউদ্দীন বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিলো–কি সব খুন খারাবী শুরু হয়েছে দেশে আম্মা, যখন তখন জবোর জবোর খারাপ খবর আসছে। দেশের রাজা এখন মানুষ মেরে সাফ করে ফেলছে। আমার চেনা লোকদের বিপদ আপদের খোঁজ খবরটা নেয়ার জন্যে ইদানিং একটু ছুটোছুটিতে আছি। এনিয়ে আপনি পেরেশান হবেন না আম্মা। এই বালামুসিবতটা যে কয়দিন আছে, এ কয়দিন আমকে একটু দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে।

তটিনী বিশ্বাস নিকটেই ছিল: তাজউদ্দীন চলে গেলে সে আরো এগিয়ে এসে দুষ্টুমী করে বললো–ছেলের তো আপনার বয়সটা কম হয়নি জেঠীমা! ঘরে একটা বউ না থাকলে বাড়িতে তার মন টিকে কি করে?



www.pathagar.com

মরিয়ম বিশ্বাসের মনে ধরলো কথাটা। জবাবে তিনি বললেন–হ্যাঁ–মা, এইটে তুমি কথা একখান বলেছো বটে! শুধু ছেলের কেন, গোটা বাড়িটাই কেমন খাঁ খাঁ করে। একটা বউ এলে বাড়িটারই কি কম গৌরব বাড়ে?

তটিনী আরো উৎসাহ নিয়ে বললো, তবে আর বলছি কি? ঘরে একটা বউ আনুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

মরিয়ম বিশ্বাস খুশী হয়ে বললেন–তাহলে দেখেশুনে তোমরাই একটা মেয়ে ঠিক করে ফেলো মা। ছেলের যদি মনে ধরে তাহলে আর আমার কোন কথা নেই। ছেলের পছন্দই পছন্দ।

তটিনী একটু চিন্তা করলো। তারপর সে বললো–কেমন মেয়ে ছেলের আপনার পছন্দ হবে, সেটা জেনে নিয়ে বলবেন, আমরা দেখবো।

জেনে আবার নেবো কি? এই আমার রোকেয়া বা তোমার মতো একটা মেয়ে বের করো খুঁজে, দেখো–পছন্দ তার হয় কিনা।

তটিনী চমকে উঠলো। বললো–কি বললেন?

মরিয়ম এবার আফসোস্ করে বললো–বলবো আবার কি! আমার রুক্মিনীর বিয়ের আগে ছেলেটাকে যদি পেতাম তাহলে আর হাত্ড়াতে যেতাম কোথাও? তোমার বাপটার জন্যেই তো তোমারও এই দশা। সে যদি ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলতো, তাহলে কি তোমাকে আমি যেতে দিতাম অন্যের বাড়ি? বাড়ির মেয়ে বাড়িতেই আমি রেখে দিতাম। তোমার মতো বউ পেলে ছেলেও যে আমার বর্তে যেতো–এটা আমি হলফ করে বলতে পারি।

মরিয়ম বিশ্বাস সরল দিলে মনের খেদ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তটিনীর এতে সারা অঙ্গে কাঁপন ধরে গেল। সে কোন মতে প্রতিবাদ করে বললো–মেঝো জেঠীমা, ভাল হচ্ছেনা কিন্তু।

মেঝো জেঠীমার তখন আর অন্যদিকে খেয়াল নেই। তিনি তখন আপন ভাবেই বিভোর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন কেন বাবা, ছেলে কি আমার কুৎসিৎ না কানা খোঁড়া? এর চেয়ে ভাল বর কেউ মাথা খুট্লে পাবে কখনও?

ধ্যাৎ–

পড়িমরি ছুটে পালালো তটিনী। রাস্তাটাও –আবার তাজউদ্দীনের সামনে দিয়েই। সেখানে এসে তটিনীর পাদুটো আর ওঠেনা!

রাজধানীতে মেলা বসেছে বিরাট। বৈশাখী মেলা। পান্ডুয়ায় এই মেলা প্রতিবছরই বসে। চলেও মাসাধিক কাল। এই মেলার সময় এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে। দূরদূরান্ত থেকে অনেক ক্রেতা আসে এ মেলায়। ক্রেতা আসে বিদেশ থেকেও। এইসব ক্রেতারা এসে এদেশের কাপড় কেনে, ফসল কেনে, রং–বেরং এর মাটির জিনিস খেলনা–পুতুল –বাসন কেনে। হস্ত ও কুটির শিল্পের সৌখিন সৌখিন জিনিসও দেশী বিদেশী ক্রেতারা সখ করে ক্রয়



www.pathagar.com

করে। কেনাবেচা ছাড়াও, আমোদ-ফুর্তি রং-তামাসায় এ মেলা মুখর থাকে সর্বক্ষণ। হরেক রকম বাজী-খেলা, গান-বাজনা, বাহাস্ লড়াই, ধাঁধাঁ-ধূয়া চলতেই থাকে হরদম।

এবার এ মেলা আরো জমে উঠেছে খুব। দেশের রাজা নিজে এবার ঝুঁকে পড়ছেন মেলার দিকে। পূজা-অর্চনা-পার্বনাদি ধুমধামের সাথে পালন করছেন। ফলে, মেলার আকার-পরিধি বেচাকেনা ও রংতামাসা আগের চেয়ে অনেক গুণে বেড়ে গেছে। এই বৈশাখী মেলার বড় আকর্ষণ কাপড়। হরেক-রকম সূতি কাপড় বিপুল পরিমাণে বেচাকেনা হয় এখানে।

মরিয়ম বিশ্বাসের খানিকটা ওজর আপত্তি সত্ত্বেও, তাজউদ্দীন কাপড় নিয়ে এই মেলার দিকে রওনা হলো। মেলায় সে ফেরী করে কাপড় বেচবে, এই তার ইরাদা। এতে তার ব্যবসা করাও হবে আবার মেলা দেখাও হবে। ওদিকে আবার সোনা বাউলের দাওয়াতটাও আছে।

মুহসীন বিশ্বাসেরও কাপড় গেছে এই মেলায়। তার কয়েকজন কর্মচারী সেখানে দোকান খুলে বসেছে। কাজেই তাজউদ্দীনের যাওয়া নিয়ে অধিক কথা হলোনা।

রাজধানীর পাশেই এক নদী। রাজ প্রাসাদের খানিকটা নিকট দিয়ে রাজধানীর কোল ঘেঁসে লম্বালম্বি বয়ে গেছে এ নদী। শাখা নদী এটা। অল্প খানিক এগিয়েই বড় নদীতে পড়েছে। বোঁচকা করা কাপড় কাঁধের ওপর নিয়ে তাজউদ্দীন এসে এই নদীর তীরে দাঁড়ালো। খেয়াঘাট অনেক উজানে। সেখানে যেতে হলে পথ অনেক বেড়ে যায়। তাই তাজউদ্দীন এখানেই নদীটা পার হওয়ার মওকা-খুঁজতে লাগলো।

সে লক্ষ্য করে দেখলো ভাটি থেকে একটা পালতোলা ছোট্ট ডিঙ্গি উজান দিকে আসছে। প্রবল বেগে হাওয়া লাগছে পালে। এতে করে ডিঙ্গিখানা প্রতিকূল স্রোত কেটে তর তর বেগে ছুটে আসছে উজান দিকে। ডিঙ্গিটাতে আরোহী মোট তিনজন। একজন মাঝি আর দুইজন যাত্রী একহাতে হাল আর অপর হাতে পালের দড়ি শক্ত করে ধরে মাঝিটা পিছগলুইএ বসে আছে। যাত্রীরা একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। স্পষ্ট দেখা না গেলেও দুইজনই যে তারা তরুণ বয়সের মানুষ, তাজউদ্দীন তা সহজেই বুঝতে পারলো। নৌকার ঠিক মাঝখানে ফরাশ পেতে বসে হাস্য কৌতুকে মস্‌গুল আছে যাত্রীদ্বয়।

দেখতে দেখতে ডিঙ্গিখানা অনেক নিকটে চলে এলো। চেহারা আর লেবাস দেখে বোঝা গেল যাত্রীদ্বয় অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ। এ নৌকা তার কোন উপকারে আসবে কিনা ভাবতেই এক ভয়ংকর অঘটন ঘটে গেল। বাতাসের বেগ এমনিতেই ছিল প্রবল। তার ওপর হঠাৎ করে এক প্রচন্ড বাউরী বাতাস উঠে ঘুরতে ঘুরতে নৌকার পালে এসে আষ্টেপৃষ্ঠে লাগলো। এতে করে নৌকার পাল দুমড়ে-মুচড়ে ছিঁড়ে-ফেটে যেতে লাগলো। এই প্রবল ঝাপটায় পাল সামলাতে গিয়ে মাঝির হাত থেকে হাল গেল ফস্‌কে। সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গিখানা কাত হয়ে পাক খেতেই মাঝনদীতে সশব্দে তলিয়ে গেল।

শাখা নদী হলেও মাঝখানে নদীটা খুব গভীর এবং পাহাড়ী নদীর মতো স্রোতও খুব প্রবল। তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই নৌকা মাঝি, যাত্রী-সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

চমকে উঠলো তাজউদ্দীন। কাঁধের কাপড় ফেলে দিয়ে সে নদীর ভাটির দিকে দৌড় দিলো। কিয়ৎদূর এগুতেই সে দেখতে পেলো, ঘটনাস্থলের সামান্য একটু ভাটিতে দুটি মানবদেহ



www.pathagar.com

জড়াজড়ি করে ভেসে উঠে আবার তলিয়ে গেল। ছুটতে লাগলো তাজউদ্দীন। স্রোতের পাকে নরদেহ দুটি পুনরায় ভেসে উঠতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। প্রাণপণে সাঁতরিয়ে নিশানা মাফিক স্থানে গিয়ে সে ডুব দিয়ে ধরে ফেললো তাদের। দুইজনের দুই বহু এক বগলের তলে ফেলে অন্য হাতে দূরন্ত বেগে সাঁতরিয়ে ক্ষণিকের মধ্যেই তীরে এলো তাজউদ্দীন। মানুষ দুটিকে সে ডাঙ্গায় টেনে তুলে দেখলো–এরাই সেই তরুণ তরুণী যাত্রীদ্বয়। এরা পানি খেয়েছে অনেক এবং তখন সজ্ঞাহীন। তাজউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে এদের চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পেটের ওপর চাপ দিতেই মুখ দিয়ে গলগল করে পানি বেরিয়ে গেল এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া পুনরায় শুরু হলো।

দূর দুরান্তের অনেকের চোখেই এ দৃশ্য পড়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারদিক থেকে ছুটে এলো লোকজন। আরো খানিক ভাটিতে গিয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেল মাঝিটাও। মাঝিটা সাঁতার জানতো। সে নিজ শক্তিতেই প্রাণপণে সাঁতরিয়ে তীরের দিকে আসতেই লোকজন গিয়ে তুলে আনলো তাকেও।

উপস্থিত লোকজন নিয়ে কিছুক্ষণ সেবাশুশ্রুষা করতেই উঠে বসলো তরুণ তরুণী। কয়েক মুহূর্ত বিভ্রান্ত হয়ে বসে থাকার পরপরই জ্ঞান ফিরলো তাদের। ঘটনাটা আগাগোড়া স্মরণ হতেই তাজউদ্দীনের প্রতি তারা কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যেই আরো লোক ছুটে গেল সেখানে। তাদের মধ্যে কয়েকজন চীৎকার করে বলে উঠলো–একি! এতো আমাদের রাজকুমার!

কথা তাদের সত্য। এই বিপর্যস্ত নওজোয়ানটিই রাজা গণেশের পুত্র রাজকুমার যদু নারায়ণ, আর এই তরুণীটি অবনীনাথ সান্যালের কন্যা যমুনা সান্যাল। যমুনা সান্যালের নদী ভ্রমণের নিত্য নয়া সখের ফলশ্রুতিতেই তাদের এই বিপর্যয়। প্রথমে কয়দিন বজরায়, তারপর পানসীতে এবং অতঃপর এই জেলে ডিংগিতে চড়ে নদী ভ্রমণের খাহেশ হয় যমুনার। আজকের এই বিপর্যয় না ঘটলে হয়তো এরপর ভেলায় চড়ে নদী সফরের শখ হতো শ্রীমতির। তাদের চরম খোশনসীব যে, তাজউদ্দীন তখন উপস্থিত ছিল সেখানে আর বিপর্যয় ঘটার সংগে সংগে সে তাদের উদ্ধারে ছুটেছিল। সাঁতার না জানায় প্রথম থেকেই পানির তলে তলিয়েছিল তারা। উদ্ধার কাজে আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলে লাশ উদ্ধারই হতো। এ দুনিয়ার মুখ আর তারা দেখতোনা!

সংগে সংগে খবর গেল রাজপ্রাসাদে। খবর পেয়েই উদভ্রান্তের মতো ছুটে এলেন রাজা গণেশ ও অবনীনাথ সান্যাল। পেছনে পেছনে ছুটে এলো পাত্রমিত্র ও দাস দাসী। পুত্রকে জীবন্ত পেয়ে বর্তে গেলেন রাজা। তাজউদ্দীনই সেই ব্যক্তি যে নিজের জান বাজী রেখে এদের সঙ্গে সঙ্গে ডাঙ্গায় তুলে না আনলে মৃত্যু এদের নিশ্চিত ছিল জেনে, রাজা গণেশ কৃতজ্ঞতায় জাপটে ধরলেন তাজউদ্দীনকে। এরপর তাজউদ্দীনের খানিকটা আপত্তি সত্বেও রাজা গণেশ পুত্রের সাথে তাজউদ্দীনকেও পুত্রবৎ তুলে আনলেন রাজ প্রাসাদে। কৃতজ্ঞতার আধিক্যে রাজা গণেশ মুসলমান পাচক আর মুসলমান দাস দাসী নিয়োগ করলেন তাজউদ্দীনের খেদমতে।

একটানা কয়েকদিন রাজ প্রাসাদেই রয়ে গেল তাজউদ্দীন। রাজকুমার যদুনারায়ণ অহর্নিশ তাজউদ্দীনের সাথে সাথে রইলো এবং ব্যস্ত হয়ে তার সুখ স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করতে লাগলো।



www.pathagar.com

এতে করে উভয়ের মধ্যে যে দোস্তী গড়ে উঠলো, তা ক্রমে ক্রমে গভীর থেকে গভীরতম পর্যায়ে চলে গেল। যদুনারায়ণের চেয়ে তাজউদ্দীনের বয়সটা কিছু অধিক হওয়া সত্বেও বয়সের এই ফারাক আর তাদের মধ্যে রইলোনা। অতঃপর তাজউদ্দীন ফিরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেও ফিরে যেতে পারলোনা। যদুনারায়ণের অনুরোধে আরো কিছুদিন তাকে রাজ অতিথি হয়ে রাজ প্রাসাদেই থাকতে হলো। যমুনা সান্যালের অনুরোধে তাকে সান্যাল বাড়িতেও বার কয়েক যেতে হলো। যদুনারায়ণ প্রতিদিন তাকে ঘুরে ঘুরে রাজ প্রাসাদের সর্বত্র সব কিছু দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো।

এই দেখে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তাজউদ্দীন প্রায়দিনই কৌতুকের সাথে লক্ষ্য করতে লাগলো–তৌহিদ বেগের সন্ধানে রাজকর্মচারী আর সেপাই–সেনাদের হাজার রকম মহড়া ও দৌড়ঝাঁপ। একদিন গল্পচ্ছলে যদু নারায়ণ বললো বন্ধু, মুসলমানদের ওপর আমার বাবা খুবই চটে আছেন দেখে আপনি যেন মন খারাপ করবেন না। আমার বাবার রাগটা কিন্তু সবার ওপর নয়। যেসব মুসলমান আমার বাবাকে রাজারূপে বরদাস্ত করতে পারছেনা, তাঁর রাগটা কেবল তাদের ওপর আর তৌহিদ বেগের ওপর।

তাজউদ্দীন আগ্রহী হয়ে উঠলো। বললো–কেন, তৌহিদ বেগের অপরাধটা কি?

জবাবে যদুনারায়ণ বললো–না, অপরাধ নয়, তার ভয়। লোকটা নাকি মস্তবড় যোদ্ধা। ক্ষিপ্ত মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে সে যখন তখন যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। কারো কারো ধারণা, ইতিমধ্যেই রাজ সেপাইদের যে কয়টি বিপর্যয় ঘটে গেছে, তার সবটার পেছনে ঐ তৌহিদ বেগই আছে।

তাহলে আর তাকে ধরতে এত বিলম্ব করা হচ্ছে কেন?

যদুনারায়ণ হেসে বললো–আরে সেই ধরবেটা কাকে? কেউ তাকে চিনলে তো, আর সে লোকটা এদেশে থাকলে তো?

এদেশে নেই?

কেমন করে থাকবে? সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ নিহত হওয়ার পর থেকেই তো তার আর সৈন্যও নেই, আশ্রয়ও নেই। শুধু শুধু জান দেয়ার জন্যে সে পড়ে থাকবে এদেশে?

তবে আর তাকে খুঁজছে কেন?

আতংকে। মানে সন্দেহের বশে। যদি থেকে থাকে তাই। কিন্তু সবাই জানে, সে এদেশে নেই।

তাহলে রাজ ফৌজের যে সব বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে এসব কে ঘটাচ্ছে?

তা কিছু বলা যাবেনা। মস্ত মস্ত সাধু দরবেশ নিয়ে কারবার! কার মধ্যে কোন ক্ষমতা আছে তা কে বলতে পারে?

যদুনারায়ণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক নজরে তাকিয়ে থাকার পর তাজউদ্দীন বললো–তা ঠিক।

এ প্রসঙ্গে না থেকে তাজউদ্দীন ফের বললো–কিন্তু আপনি যে বললেন–যে সব মুসলমান আপনার বাবাকে বরদাস্ত করতে পারছেনা, শুধু তাদের উপরই চটে আছেন তিনি। এই এতবড়



www.pathagar.com

দেশে কারা তাঁকে বরদাস্ত করতে পারছেনা–এটা তিনি সঠিক ভাবে নিরূপণ করবেন কি করে? আর তা যখন সম্ভব নয়, তখন এ কথার কোন অর্থ নেই। তাঁর এই রাগের জন্যে অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে, এবং শুনতে পাই, ঘটছেও।

যদু নারায়ণ বললো–হ্যাঁ। ইতিপূর্বে তা ঘটেছে। কিন্তু আর তা ঘটবেনা।

মানে?

ইদানিং সেপাইরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছদ্মবেশে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা জরিপ করে দেখবে, রাজার বিরুদ্ধাচারণ সত্যি সত্যিই কোথায় কোথায় ঘটছে। সেটা জানার পরই শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

আচ্ছা।

এই ধরুন, আপনাদের ঐ এলাকায় পাকুড়তলা নামের কোন জায়গা আছে নাকি? সেখানেও ছদ্মবেশে সেপাই যাচ্ছে। রজব আলী নামের কে একজন লোক খুব উল্টাপাল্টা কথা বলে মুসলমানদের সাথে ছোট জাতের হিন্দুদেরও নাকি রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে খুব।

তাজউদ্দীন চমকে উঠলো। বললো–রজব আলী!

হ্যাঁ। এই রকমই সংবাদ এসেছে ওখান থেকে।

আপনি এসব কোথায় শুনলেন? আপনার বাবার কাছে?

না, রাজ দরবারেই শুনলাম সব। আমাকেও তো মাঝে মাঝে রাজ দরবারে বসতে হয়।

ও, আচ্ছা।

তাজউদ্দীন ঠান্ডাভাবে এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলো। অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে রাজকুমারের মনে সন্দেহের বীজ বুনতে গেলনা। কিন্তু ঐ দিনই বিকালে মেলা দেখার অছিলায় সে মেলায় এসে বাউলদের আখড়ার মধ্যে ঢুকলো এবং সকলের অলক্ষ্যে সোনা বাউলের হাতে একটা কাগজ গুজেঁ দিয়ে সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলো।

বিদায়ের আগের দিন যদুনারায়ণের সাথে তাজউদ্দীন রাজউদ্যানে পায়চারী করছিল। অনেকক্ষণ পায়চারী করার পর শ্রান্তি বোধে তাজউদ্দীন ঘাসের ওপর বসে পড়ার উপক্রম করতেই রে–রে করে বাধা দিলো যদু নারায়ণ। বললো–আরে করেন কি, করেন কি! একটু দাঁড়ান–

বলেই সে এদিক ওদিক চেয়ে হাঁক দিলো–এই কে ওখানে?

উদ্যানের পাশ দিয়ে এই সময় অভয়চরণ যাচ্ছিলেন। অভয়চরণ ভাদুড়ী। এ কয়দিন তিনি রাজ প্রাসাদের বাইরে ছিলেন। এই কারণেই আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অভয়চরণের সাক্ষাৎ পায়নি তাজউদ্দীন। আজকেই সকালের দিকে ফিরে এসেছেন অভয়চরণ।

গাছ গাছড়ার আড়াল থেকে আকস্মাত আওয়াজ আসতেই তিনি একটু চমকে উঠলেন। রাজকুমারের কন্ঠস্বর চিনতে পেরেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন–আমি অভয়চরণ ছোটকর্তা। শ্রীযুক্ত সিধুচরণের ভাইপো।

সিধুচরণ রাজা গণেশের মাস্‌তুতো ভাইয়ের শালা। তারই দূর সম্পর্কের ভাইপো এই অভয়চরণ। রাজা গণেশের সাথে সিধুচরণের দহরম মহরম ছিল। সেই সুবাদে অভয়চরণ



www.pathagar.com

রাজপ্রাসাদে এসে রাজ পরিবারের শতজনের একজন হয়ে আছেন এবং মৌজের সাথেই আছেন।

রাজপুত্র যদুনারায়ণকে অভয়চরণ ভয় করেন বাঘের মতো। একবার যদুনারায়ণের কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হওয়ায় রাজপ্রাসাদের ভাতের সাথে অভয়চরণের প্রাণটাও এ দুনিয়া থেকে উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সেই থেকেই তিনি বুঝে নিয়েছেন–রাজপ্রাসাদে তাঁর এই মৌজের সাথে অবস্থান সম্পূর্ণটাই রাজকুমারের অনুগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত। সেই থেকেই তিনি সে অনুগ্রহ অর্জনে দেহমন উৎসর্গ করে বসে আছেন।

অভয়চরণ সাড়া দিতেই যদু নারায়ণ বললো–ও, অভয়চরণ। জলদি এখানে কুরসী পাঠিয়ে দাওতো দেখি।

গদগদ কণ্ঠে অভয়চরণ বললেন–আজ্ঞে, এখনই দিচ্ছি কর্তা।

পাশেই বিশ্রামাগার। অভয়চরণ ছুটে এলেন বিশ্রামাগারে। কুরসী আছে সেখানে। লোক কেউ হাতের কাছে থাকুক আর না থাকুক, হুকুম যখন তার ওপরই হয়েছে তখন তারই নিয়ে যাওয়া বেহতর। বাগানও অতি নিকটে। তাই রাজকুমারের মনোরঞ্জনে নিজেই একখানা কুরসী নিয়ে বাগানের দিকে দৌড় দিলেন অভয়চরণ। কুরসী এনে রাজকুমারের সামনে পেতে দেয়ার উদ্যোগ করতেই একটু ফাঁকে দাঁড়ানো তাজউদ্দীনকে দেখিয়ে দিয়ে যদুনারায়ণ ধমক দিয়ে বললো–আরে! এই বেয়াকুফ, মেহমানকে আগে আসন দিতে হয়–এ জ্ঞানটাও এতদিনে হয়নি? দাও, উনাকে আগে দাও–!

চমকে উঠে চোখ তুলতেই অভয়চরণের চোখ দুটি চড়কগাছে উঠলো। সে দেখলো–তাজউদ্দীন তার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। অভয়চরণ তাজ্জব। এ কি! তাজউদ্দীন এখানে। অভয়চরণ ইতস্তত করতেই আবার ধমক দিলো যদুনারায়ণ। পুনরায় চমকে উঠে অভয়চরণ কুরসীখানা তাজউদ্দীনের সামনে এনে পেতে দিতেই তাজউদ্দীন অনুচ্চ কণ্ঠে বললো–বুঝলেন মশাই, এ দুনিয়ায় কেউ কারো গোলাম নয়। প্রত্যেক ইনসানেরই ইজ্জত আছে সমান সমান।

তাজউদ্দীনকে কথা বলতে শুনে যদু নারায়ণ বললো–কি বন্ধু কিছু বলছেন?

তাজউদ্দীন এর জবাবে বললো–না, বলছি, আপনি আগে বসুন।

যদু নারায়ণ শশব্যস্ত হয়ে বললো–আরে না–না, সেকি কথা! আপনি আগে বসুন, আমি বসছি–

বলেই সে অভয়চরণকে পুনরায় ধমক দিয়ে বললো–আরে এই উল্লুক, দাঁড়িয়ে কি দেখছো? আর একটা আনো, জলদি–

পড়িমরি করে অভয়চরণ দৌড় দিলো আবার। কুরসী এনে পেতে দেয়ার পর অভয়চরণ ঘরে ফিরে খোঁজ নিয়ে জানলেন এই তাজউদ্দীনই রাজ কুমারকে উদ্ধারকারী সেই ব্যক্তি, আর এই তাজউদ্দীনকে রাজ কুমার পেয়ার করেন প্রাণের অধিক। এটা জানার পর যে কয়দিন তাজউদ্দীন রাজ প্রাসাদে রইলো–অভয়চরণ সে কয়দিন ঘরের বাইরে এলেন না। অতপর বাঁশবাড়িতে যাওয়াটা তো দূরের কথা, বাঁশবাড়ির নামটাও মুখে আনার দুঃসাহস আর তিনি করলেন না।



www.pathagar.com

বাগানে বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার পর যমুনা সান্যালের তলব পেয়ে যদু নারায়ণ বন্ধুর কাছে ছুটি নিয়ে সান্যাল বাড়িতে ছুটলো। তাজউদ্দীন উঠে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ পায়চারী করে সদর ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই ফটকের বাইরে থেকে হঠাৎ তার কানে এলো আওয়াজ–

"এই যে, খেলার খেলা পায়রা খেলা,
দ্যাখনেওয়ালা দ্যাখ এবেলা,
খেলছে খেলা ভুলুর চেলা–

উৎফুল্ল হয়ে তাজউদ্দীন ছুটে এলো বাইরে। খানিকক্ষণ খেলা দেখার পর বকশিশ দেয়ার ফাঁকে খত বিনিময় করে তাজউদ্দীন বাজীকরকে বিদায় করলো।

বাজীকর প্রদত্ত খত নিয়ে তাজউদ্দীন তখনই তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করে সে খত খুলে বসলো। ভুলু ওরফে বাহালুল খাঁ লিখেছে–

উস্তাদ,

বাদতসলীম জানাই, একেই বলে, খোদার মার দুনিয়ার বা'র। সেই আপনিই গিয়ে রাজ প্রাসাদে অতিথি হয়ে থাকবেন, এটা কি কল্পনা করার কথা! অল্লাহ পাকের অসীম করুণা ছাড়া এমনটি কি কখনও সম্ভব?

আপনার খত পেয়েছি। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, আপনার খবর সত্য। রজব আলীর পাড়াতে অচিরেই আঘাত হানা হবে। পাকুড়তলার বামুন পাড়ার কয়জন সেপাই আছে রাজার ফৌজে। খেলোয়ারের ছদ্মবেশে তাদের সাথে আরো কিছু সেপাই এসে আড্ডা গেড়েছে বামুন পাড়ায়। তারা হা ডু ডু খেলার নামে পাকুড়তলার চারপাশের এলাকাতে ঘুরছে। বাঁশ বাড়ির দিকেও তারা যাবে। খেলার নামে ঐ সেপাইরা ঐ এলাকার কোথায় কোথায় মুসলমানদের গণেশ বিরোধী তৎপরতা বেশী তা জরিপ করে বেড়াচ্ছে। এরপর রাজধানী থেকে আরো সেপাই আনবে তারা এবং হামলা চালাবে একটার পর একটা। রজব আলীর বাড়ি থেকেই শুরু হবে হামলা তাদের। আপনার এ পয়গামও সত্যি যে, এই জরীপ করা কাজে ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে আরো অনেক সেপাই অনেক দিকে বেরিয়েছে। আসল হদিস তারা প্রায়ই পাবেনা। কিছু অসৎ লোকের দুশমনির কারণে আরো কিছু নিরীহ লোকের প্রাণ যাবে।

আমার একার পক্ষে এতদিক সামাল দেয়া সম্ভব নয়। কয়দিনের জন্যে হলেও এখন আপনার বাঁশবাড়িতে একবার জলদি আসার প্রয়োজন।

খাদেম
বাহালুল খাঁ।

www.pathagar.com

# ৭

তাজউদ্দীন বাঁশবাড়িতে ফিরে এসে দেখে, এ অঞ্চলে হাডুডু খেলার হিড়িক পড়ে গেছে। এই খেলার প্রতি প্রশাসনের পৃষ্ঠপোশকতা আচমকা বেড়ে গেছে।

হাডুডু খেলা এদেশের প্রাচীন খেলা। এ অঞ্চলে এর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। সময় সময় খুব ধুমধাম করেই হাডুডু খেলার মহড়া এ অঞ্চলে হয়। খেলার দল গজিয়ে ওঠে গ্রামে গ্রামে। সাধারণত বর্ষাকালে যখন ক্ষেত খামারের কাজকাম মন্দা হয়ে আসে তখন এ খেলা খুব জোরদার হয়ে ওঠে। নৌকা বাইচ, বাউলের বাহাস, ষাড়ের লড়াই, ঘোড়ার দৌড়-ইত্যাদির মতো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হাডুডু খেলার মৌসুম আসে ফি বছর।

আসার পথে তাজউদ্দীন পাকুড়তলা হয়ে এসেছে। সে লক্ষ্য করে দেখেছে, ঘাটের ওপর বুধু হালদার, বিষ্ণুপাল আর রজব আলীরা নিশ্চিন্ত মনে দোকান খুলে বসে আছে। কারো মধ্যে কোন ভিন্ন রকম উত্তেজনা নেই। কিন্তু ভোলা ভট্টচার্যের সাথে বামুন পাড়ার অনেকেরই বাজারে আনাগোনা অনেক খানি বেড়ে গেছে। পাকুরতলার ঠান্ডামারা বাজারটা আগের চেয়ে অনেকখানি গরম হয়ে উঠেছে। অনেক নয়া আদমীর ভিড় বেড়েছে বাজারে। তার চেয়েও বেশী বেড়েছে হাডুডু খেলার আনয়াম। বাজারের এ পাশে ওপাশে এবং বাজার থেকে একটু দূরে খোলা জায়গাগুলোতেও হেথা হোথা হাডুডু-ঘরের নকসা কাটা হয়েছে। জটলা করে মহড়া চলছে হাডুডু খেলার। বামুন পাড়ার একদল চেনা-অচেনা নওজোয়ানদের অনুকরণে অল্পবয়স্ক ছেলেরাও নানা দলে ভাগ হয়ে বাজারের চারপাশে হাডুডু খেলার হিড়িক পয়দা করেছে। অনেকের মুখেই এখন হাডুডু খেলার গল্প। কোন গাঁয়ের কোন দল কবে কোথায় জিতেছে, কোন দল কোনদিনই কারো কাছে হারেনি, পাকুড়তলার দল সবদলকেই কেমন ভাবে কাত করে দিয়েছে-ইত্যাদি কথাবার্তা। এরই মধ্যে কে একজন বলে উঠলো-বাঁশবাড়ির দর্প এবার শ্যাষ! পাকুড়তলার এখনকার দলের সামনে এক লহমা দাঁড়াবার তাকদও এ অঞ্চলের কোন ব্যাটার নেই।

অন্য একজন বললো-বাঁশবাড়ির সাথে লড়াইটা শক্ত লড়াই-ই হবে। এরা যদি এভাবে মেরে না খেলে তাহালে বাঁশবাড়ির সাথে ফলাফলটা কি হবে, তা সঠিক বলা যাবে না।

বাজারের একপাশে দাঁড়িয়ে চোখ কান ছেড়ে দিয়ে তাজউদ্দীন সব কিছু দেখলো এবং শুনলো। সহজ-সরল গ্রামবাসীদের মধ্যে খেলার নামে হুজুগ পয়দা করে দিয়ে রাজা গণেশের ফৌজ কিভাবে তাদের মতলব হাসিল করার তালে ঘুরছে, তা লক্ষ্য করে তাজউদ্দীনের হাসি পেলো।



www.pathagar.com

রজবআলী পাকুরতলার পূব পাড়ার লোক। পাড়াটার অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান এবং অল্প সংখ্যক নীচু শ্রেণীর হিন্দু। বিষ্ণুপালের পশ্চিম পাড়ায় কিছু মুসলমান কলু আর তাঁতী বাদে অধিকাংশই কামার-কুমার, জেলে-নাপিত, ধোপা-চাঁড়াল ইত্যাদি নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস। উত্তর পাড়ায় বাস করে বামুন-কায়েত ইত্যাদি উঁচু শ্রেণীর হিন্দুরা।

এই সকল নিরীহ আর পরিশ্রমী ছোটজাতের হিন্দু আর খেটে খাওয়া মুসলমানেরা সব সময়ই একাত্ম হয়ে বাস করে। আত্মিক সম্পর্ক নিয়ে চলা ফেরা করে। সব কিসিমের আচার অনুষ্ঠান, মেলা-খেলা, আমোদ-ফুর্তি একাত্ম হয়ে করে। উত্তর পাড়ার বামুন কায়েতদের কোন তোয়াক্কাই তারা রাখেনা।

এটা বরদাস্ত করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে উত্তর পাড়ার বামুনদের। হিন্দু হয়ে তাদের সেবায় তাদের অধীনে না থেকে মুসলমানদের সাথে ভাইবেরাদর হয়ে ভিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে তারা আলাদা ভাবে বাস করবে-আর তারা এটি এখানে হতে দিতে রাজী নয়। মুসলমান সুলতানদের আমল থেকেই এইসব ছোটজাত হিন্দুদের দিমাগ বিগ্‌ড়ে দিয়েছে ঐ ম্লেচ্ছ আর বেয়াড়া মুসলমানেরা। এই ব্যাটাদের টিট্ করতে পারলেই এইসব নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা ফের তাদের তাঁবেদারে চলে আসবে-এই তাদের ধারণা।

রজব আলী পূব পাড়ার অন্যতম প্রধান। এরা গণেশ বিরোধী হোক না হোক, সেই বাহানাতেই তাদের শায়েস্তা করার ইরাদায় উত্তর পাড়ার বামুনেরা রাজসেপাইদের সংবাদ দিয়ে এনেছে এবং খেলোয়াড়ের পরিচয়ে এদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এই বামুনপাড়ার এরাই এখন পাকুড়তলার অপরাজেয় খেলোয়াড় দল। এরা বাজীধরে গ্রামে গ্রামে হাডুডু খেলে বেড়াচ্ছে।

বাড়িতে এসে পা দিতেই বাহির আঙ্গিনায় তটিনীর সাথে তাজউদ্দীনের দেখা। তটিনী তখন মহাব্যস্ত। বাঁশবাড়ির হাডুডু দলের একরকম সে-ই এখন নেত্রী। বাঁশবাড়ির বিশ্বাস পরিবারই বরাবর এই দলের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। মরিয়ম বিশ্বাসের মরহুম পুত্র রবীন বিশ্বাস, তটিনীর বাবা সুরেশ্বর বিশ্বাস এবং সবার ওপরে মহেশ্বর ওরফে মুহসীন বিশ্বাস বাঁশবাড়ির দলটি চালনা করে এসেছেন। দলের পেছনে খায়-খাটুনী খরচ খরচান্ত তামাম কিছু বিশ্বাসেরাই করে এসেছেন এযাবত। এখন সুরেশ্বর বিশ্বাস নকরীতে, রবীন বিশ্বাস মৃত এবং মহেশ্বর বিশ্বাস বৃদ্ধ। অথচ বিশ্বাস পরিবারের উদ্যোগ ছাড়া বাঁশবাড়িতে উদ্যোগ নেয়ার লোকও আর কেউ নেই। পয়সা কড়ি খরচ করতে বিশ্বাস বাড়ির আজও কারো আপত্তি নেই। কিন্তু ঝামেলা পোয়ানোর লোকের এখন অভাব। মুহসীন বিশ্বাস আর আগের মতো দৌড়ঝাপ করতে পারেন না। মানসিক উৎসাহটাও এখন আর তাঁর নেই।

ফলে, তটিনীই এবার দাঁড়িয়েছে দলের পক্ষে। চাকর বাকর লাগিয়ে খেলোয়াড়দের এত্তেলা দিয়ে জড়ো করেছে সে-ই। গাঁয়ের এতদিনের ঐতিহ্য আর ইজ্জতটা এভাবে হারিয়ে যাবে, তটিনী তা মেনে নিতে নারাজ।

বাঁশবাড়ির হাডুডু দলের একটা ঐতিহ্য আছে ঠিকই। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বাঁশবাড়ির দল কারো কাছে হারেনি। বিশেষ বিশেষ খেলায় বাঁশবাড়ির দলটাকেই ভাড়া করে নিয়ে যায় অনেক গাঁয়ের লোক। হাডুডু খেলার আস্তানা হিসেবে বাঁশবাড়িই এ অঞ্চলে মশহুর।



www.pathagar.com

প্রতি বছর বিভিন্ন গাঁয়ের দল আসে বাঁশবাড়িতে খেলতে। বিশ্বাসদের বাড়ি সংলগ্ন ছায়াঘেরা ময়দানে এসে এক এক গ্রামের দল এক এক গ্রামের দলের সাথে খেলে। খেলার আনযামাদি পরিচালনা আর খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বাঁশবাড়ির হাডুডু দলের কর্তৃপক্ষই।

পাকুড়তলার আস্ফালন লক্ষ্য করে তটিনীর উদ্যোগে এ দায়িত্ব এবারও বাঁশবাড়িই নিয়েছে। গাঁয়ের ইজ্জতের প্রতি একটা মেয়েছেলের এই দরদ দেখে গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সকলেই এগিয়ে এসেছেন সামনে। মুহসীন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা এখন কোমর বেঁধে নেমেছেন হাডুডু খেলার আনযামে। কিছু পয়সা কড়ি খরচ করা ছাড়া তটিনীর আর ঝামেলাই তেমন নেই। সে এখন শুধু পাকুড়তলার আস্ফালন ঠান্ডা করার এন্তেজারে আছে।

পাকুড়তলা দর্পের সাথে জানিয়েছে, কোন আলতুফালতু দলের সাথে খেলতে তারা বাঁশবাড়িতে আসবেনা। বাঁশবাড়ির দল যদি তাদের সাথে খেলার হিম্মত রাখে, তাহলে যেন তৈরী থাকে বাঁশবাড়ির খেলোয়াড়রা। পাকুরতলার দল তাহলে খেলতে আসবে বাঁশবাড়িতে। তাদের এ ঘোষণা গ্রহণ করেছে বাঁশবাড়ি।

তাজউদ্দীন বাড়ির ওপর উঠতেই হৈ হৈ করে সামনে এলো তটিনী। খানিকটা ক্ষোভের সাথেই বললো-এই যে, আপনি তাহলে এলেন?

তাজউদ্দীন স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলো হ্যাঁ, এলাম।

ভাল। আমি তো ভাবলাম, আর আসবেনই না আপনি।

মানে।

আপনার ওপর অনেকটা ভরসা ছিল আমার। এ বাড়িতে তো সামর্থ বান পুরুষ মানুষ নেই কেউ। আপনাকে পেয়ে বুকে আমার বল ছিল মস্তবড়। কিন্তু সেই আপনি যে এমনভাবে নিরাশ করবেন আমাকে তা কখনও ভাবিনি। এইজন্যেই তো লোকে বলে বিদেশীর ওপর অধিক ভরসা করতে নেই।

হলোটা কি তা আগে বলবেন তো?

আপনিই এখন এ বাড়ির একমাত্র সামর্থবান পুরুষ মানুষ। প্রয়োজনের সময় সেই আপনাকেই যদি হাতের কাছে না পাওয়া যায়, দিনের পর দিন আপনি যদি বাইরে বাইরে পড়ে থাকেন, তাহলে আফসোস্‌টা হয়না কার?

তটিনীর ক্ষোভের কারণটি কিঞ্চিৎ আঁচ করে তাজউদ্দীন কৈফিয়াত দিয়ে বললো-তা, মানে এখন আমি একটু অসুবিধায় আছি। দেশে এখন মস্তবড় মুসিবত বুঝলেন? মুসলমানেরা উঠতে বসতে কতল হয়ে যাচ্ছে।

তটিনী বিশ্বাস ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো কতল হয়ে যাচ্ছে তো আপনার কি? আপনি কি আপনার স্বজাতির রক্ষাকর্তা? না একটা সেপাইয়ের মোকাবেলা করারও হিম্মত আপনার আছে?

না, মানে সবাই যদি মরে যায়-

www.pathagar.com

, যাক। তবু আপনার কিছু করার নেই। কিছু করতে আপনি পারবেনও না। বরং আপনি যাতে না মরেন, সে দায়িত্ব আমার।

কি রকম?

আমার প্রাণ থাকতে মরতে আপনাকে দেবো না। মরলে দুইজন আমরা এক সাথে মরবো– এ ওয়াদা আপনাকে আমি দিচ্ছি! আর ভয় পাওয়ার কারণ আছে, না, বলার কিছু আছে আপনার?

এক সাথে মরবো।

হ্যাঁ, বাঁচলে একসাথে বাঁচবো, মরলে এক সাথে মরবো। আমি না মরে আপনাকে মরতে দেবো না।

তটিনীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো তাজউদ্দীন। এরপর সে বললো–আমার জন্যে এতটা করবেন আপনি?

বললামই তো, করবো। আর কি ওয়াদা করতে হবে আমাকে?

এতে আপনার লাভ?

তটিনী সচকিত হলো। ঝোঁকের মাথায় সে যা বলে ফেলেছে তা উপলব্ধি করতেই তার মুখমন্ডলে এক ঝলক রক্ত ছুটে এলো। কিন্তু তাজউদ্দীনের প্রশ্নের ধরনে তার রাগ আরো বেড়ে গেল। সে উষ্ণ কণ্ঠে বললো–ওটা আপনি বুঝবেন না। ওটা বোঝার মতো জ্ঞান থাকলে অনেক আগেই তা বুঝতেন এবং এ বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়তেন না। তা থাক সে কথা। এদিকে হাডুডু খেলার ধুম পড়েছে শুনেছেন?

তাজউদ্দীন মাথা হেলিয়ে জবাব দিলো–শুনেছি।

আমাদের গাঁয়েও হাডুডু খেলা হবে–এটা শুনেছেন?

না।

তাহলে শুনে রাখুন, আমাদের গাঁয়েও হাডুডু খেলা হবে।

হবে?

হবে। এবং সে দায়িত্ব আমার ঘাড়েই পড়েছে।

আপনার ঘাড়ে!

তো আর কার ঘাড়ে পড়বে? বেটা ছেলে হয়ে এ দায়িত্ব নেয়ার জন্যে আপনি যখন থাকবেন না এখানে, তখন মেয়ে ছেলে হলেও এ দায়িত্ব আমি ছাড়া আর কে বইবে বলুন?

তা, মানে–

আপনি থাকলে অনেকখানি সুবিধে হতোনা আমার?

সুবিধে? কিন্তু ওসব তো আমি বুঝিনা বেশী। থাকলে আর কিইবা এমন কাজে লাগতে পারতাম আপনার?

খুব বেশী কাজে লাগতে পারতেন কিনা সে সম্বন্ধে এখনও আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু জেঠা মশাই বুড়ো মানুষ। তাকে সব সময়ই হাতের কাছে পাইনা। আপনি আমার পাশে থাকলে সাহসটাতো বাড়তো আমার?



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে গেল না। বললো–আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর আর খেলা খতম না হওয়া তক আমি আপনার পাশ থেকে নড়বোনা–এ কথা আপনাকে আমি দিলাম হলো তো?

হ্যাঁ নড়বেন না। একটা অসহায়া মেয়ের প্রতি এটুকু দরদ থাকা উচিত আপনার।

দিন তিনেক কেটে গেল। সোনা বাউলের দলের এক বাউল এলো বাঁশবাড়িতে। একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করার অছিলায় তাজউদ্দীনের হাতে একটা পত্র গুঁজে দিলো সে। কোন নয়া নির্দেশ আছে কিনা, ভুলু খাঁ তা জানতে চায়। গোটা গাঁ ভিক্ষে করে ওয়াপস্ যাবার পথে তাজউদ্দীনের নিকট থেকে জবাব নিয়ে চলে গেল সোনা বাউলের সঙ্গীটা। তাজউদ্দীন ভুলু খাঁকে লিখলো

আর একদিন পর রাজা গণেশের সেপাইরা বাঁশবাড়িতে হাডুডু খেলতে আসছে। আমার লোকজনেরা পাকুড়তলার ঐ সেপাইদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছে। শুনলেও হাসি পায়, লড়াই এর ময়দান ছেড়ে ওরা চুটিয়ে এখানে হাডুডু খেলে বেড়াচ্ছে। এ অঞ্চলের লোকদের ওরা বোকা বনিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই মামুলী খেলাটাতেও তারা তাদের জঘণ্যতার পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছে। ন্যায়ত ভাবে হার হলেও সে হার তারা মেনে নিতে রাজী নয়। খেলার মাঠে তাদের খন্নাসপনার যে হদিস পাচ্ছি তাতে গোলমাল এখানে জরুর একটা বাঁধবে। বাঁশবাড়ির দল একটা মজবুত দল। মেরে না খেললে সেপাই হলেও এদের ওরা এঁটে উঠতে পারবে না। কিন্তু হারতেও ওরা একদমই চাইবে না। ফলে নিশ্চয়ই একটা হৈ চৈ এর আশংকা আছে এখানে। আর তেমনটি সত্যি সত্যিই ঘটলে বাঁশবাড়ির পাহারায় আমাকে বাঁশবাড়িতেই থাকতে হবে। কিছু সেপাই আমার এখানে রেখে, আপনি বাদবাকী সেপাই নিয়ে ঐদিন পাকুড়তলায় মোতায়েন থাকবেন। আঘাত কিছু হানলে ওরা এখান থেকে ফিরে গিয়েই হানবে। ঐ রাতটার জন্যে আপনি পাকুড়তলায় থাকবেন। পরের দিন আমিও গিয়ে যোগ দেবো আপনার সাথে। পাকুড়তলার বাসা ওদের না ভাঙতে পারলে, এ এলাকার পাহারাতেই সবাইকে আমাদের আটকে থাকতে হবে।

"আমি"

নির্দিষ্ট দিনে বিশ্বাসদের ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। বাঁশবাড়ির দল এ অঞ্চলের সেরা দল। ওদিকে আবার পাকুড়তলার দলও এ পর্যন্ত কারো কাছে হারেনি। কাজেই একটা জবরদস্ত খেলা হবে জেনে, চারদিক থেকে অগণিত দর্শক ছুটে এলো বাঁশবাড়িতে। রেওয়াজ মাফিক, মাঠের ভেতরের দর্শকরা খেলার জন্যে দাগ কাটা অংশটার চারপাশ দিয়ে বসে পড়লো। পেছনের দর্শকরা মাঠের প্রান্ত ঘিরে চারদিক দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁশবাড়ির দর্শকেরা ময়দানের একপাশে এক উঁচু জায়গায় এসে এক সাথে বসে পড়লো। শুধু পুরুষ মানুষই নয়,



www.pathagar.com

অনেক মেয়ে মানুষও খেলা দেখতে এলো এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসলো। আশপাশের গণ্যমান্য লোকজন সহকারে খেলার উদ্যক্তারা এসে ঐ উঁচু জায়গার পাশে এক আসন পাতা জায়গায় আসন গ্রহণ করলেন। তটিনী বিশ্বাসের বাঁয়ে রইলেন মহসীন বিশ্বাস, ডাইনে তাজউদ্দীন।

যথা সময়ে দুই গাঁয়ের দুইদল খেলার দাগকাটা ঘরের মধ্যে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো। এক এক দলে নয়জন করে খেলোয়াড়। খেলা হবে তিন দফা। দুই দফা জিতবে যারা তারাই জয়ী হবে। পর পর দুই দফা কেউ জিতলে খেলা দুই দফাতেই শেষ হবে। তিন দফা খেলার আর দরকারই পড়বে না।

পরিচালকের নির্দেশে শুরু হলো খেলা। প্রথমদিকেই দর্শকদের চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বাঁশবাড়ির খেলোয়াড়েরা এক নিঃশ্বাসে বোল বা আওয়াজ ধরে গিয়ে পাকুড়তলার তিন তিন জন খেলোয়াড়কে ছুয়ে দিয়ে এলো। এতে করে ঐ তিন তিন জন খেলোয়াড়কে মরা বা বাতিল বলে গণ্য হয়ে খেলার দাগকাটা ঘর থেকে বাইরে চলে আসতে হলো ও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হলো। এতদ্‌দৃশ্যে দর্শকেরা এক রকম নিশ্চিত হয়ে গেল যে, বরাবরের মতো বাঁশবাড়ির দলই এবারও জয়ী হবে। দর্শকদের সমর্থন বাঁশবাড়ির দিকে গড়িয়ে পড়লো।

ক্ষেপে গেলো পাকুড়তলার খেলোয়াড়রা। তারা তো শুধু খেলোয়াড়ই নয়, তারা সৈনিক এবং ক্ষমতাসীন রাজ সৈনিক। ছদ্মভাবে থাকলেও এ হীনতা মেনে নিতে কখনো তারা রাজী নয়। তারা চা'ল বদল করলো। এরপর যারা বোল্ ধরে তাদের আক্রমণ করতে আসতে লাগলো, বাতিল হওয়ার ভয় না করে, তাকে তারা ধরে হাতপা মুষড়ে মুষড়ে ভাঙ্গতে লাগলো। অনেক ক্ষেত্রে খেলার নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাউকে আচমকা নিজের ঘরে টেনে এনে বা বাতিল হওয়ার পরও অকারণে অনেকক্ষণ ধরে রেখে হাত-পা ভাঙ্গতে লাগলো। এ ছাড়া, বাতিল হওয়ার পরও তারা বাতিল নয় বলে গায়ের জোরে খেলতে লাগলো। এতে করে একদিকে যেমন দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হলো অন্যদিকে তেমনি বাঁশবাড়ির খেলোয়াড়রা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ইতিমধ্যেই বাঁশবাড়ির একজন চৌকষ খেলোয়াড়ের পা এরা বোল্‌ছাড়ার পরও এমনইভাবে ভাঙ্গলো যে, তাকে কাঁধে করে খেলার মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হলো। এতে তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। কিন্তু পরিচালক পাকুড়তলার পক্ষেরই লোক। তিনি পাকুড়তলার পক্ষ সমর্থন করে খেলা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর বাঁশবাড়ির দলের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেল। একের পর এক মরা হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে তারা প্রথম দফার খেলাতে পরাজয় বরণ করলো।

এবার দ্বিতীয় দফার খেলা। এবারও পাকুড়তলার দল জিতলে, এই দফাতেই খেলা শেষ। দ্বিতীয় দফা খেলার আগে বাঁশবাড়ির আটজন খেলোয়াড় তাদের আহত খেলোয়াড়ের জায়গায় অন্য একজন নিয়ে নয়জন হওয়ার জন্যে বাঁশবাড়ির খেলা-জানা লোকজনদের ডাকাডাকি করতে লাগলো। কিন্তু পাকুড়তলার খেলোয়াড়দের হাতে অন্যায়ভাবে মার খাওয়ার ভয়ে তাদের ডাকে কেউ সাড়া দিলোনা। শেষ পর্যন্ত আটজন নিয়েই বাঁশবাড়ির দল দ্বিতীয় দফার খেলা খেলতে নামলো।



www.pathagar.com

কিন্তু বাঁশবাড়ির দলপতি প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই ভগ্নোৎসাহ খেলোয়াড় নিয়ে সেপাইদের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারলো না। পর পর দুইজন খেলোয়াড় আক্রমণ করতে গিয়ে দুশমনদের হাতে ধরা পড়লো এবং অন্যায়ভাবে যখম হয়ে বাতিল বলে গণ্য হলো। এতে বাঁশবাড়ির দল অধিকতর নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। এর ওপর আবার আচানক এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটে গেল। পাকুড়তলার একজন খেলোয়াড় বোল ধরে বাঁশবাড়ির আঁকের মধ্যে এলে তাকে অসাবধানভাবে ধরতে গিয়ে বাঁশবাড়ির দুইজন খেলোয়াড় আটকাতে পারছেনা দেখে এই প্রায় ফস্‌কে যাওয়া খেলোয়াড়কে বাঁশবাড়ির আরো তিনজন খেলোয়াড় গিয়ে ধরতে ধরতেই সে ফস্‌কে নিজ সীমানায় চলে এলো এবং বাঁশবাড়ির পাঁচ-পাঁচজন খেলোয়াড় এক সাথে মরা বা বাতিল বলে গণ্য হলো। রইলো শুধু বাঁশবাড়ি দলের দলপতি একা।

বাঁশবাড়ি দলের এই অবস্থা দেখে বাঁশবাড়িসহ অন্যান্য গাঁয়ের লোকজনও আফসোস্ করতে লাগলো এবং পাকুড়তলার দলের ওপর গরম হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় দফার খেলাও এখন শেষ প্রায়। দলপতিকে একা দেখে পাকুড়তলার দলপতি উপহাস করে বললো-কি মিয়া, এবার হার স্বীকার করে লেজ গুটিয়ে পালাবে, না রদ্দা মেরে শুইয়ে দেবো তোমাকেও?

বাঁশবাড়ির এই দলপতি এক জানবাজ খেলোয়াড়। সে সক্রোধে বললো-অসম্ভব! যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! আচানক এক বিপর্যয় ঘটে গেছে বলেই ভেড়ার মতো পালিয়ে যাবো আমি? আমার তো একজন খেলোয়াড় পাওনা আছেই। ঐ একজন খেলোয়াড় নিয়েই আমি শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

বলেই সে বাঁশবাড়ির উদ্যক্তাদের লক্ষ্য করে বললো-আপনারা দেখছেন কি? একজন কাউকে শিগিগর পাঠিয়ে দিন। তাকে নিয়েই শেষ চেষ্টা করে আমি দেখি।

বাঁশবাড়ির লোকেরা তখন হতাশায় বিষণ্ন। এতদিন পর হঠাৎ এই পরাজয় গ্রহণ করতে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। দলপতির কথায় আশা এলো তাদের দিলে। তৎক্ষণাৎ তারা লোক পাঠানোর জন্যে একে ওকে অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু ঐ একই কারণে অর্থাৎ পাকুড়তলার খেলোয়াড়দের হাতে অন্যায় ভাবে যখম হতে কেউ রাজী হলো না।

তটিনী বিশ্বাসের তখন প্রায় সংগাহীন অবস্থা। এত দৌড়-ঝাঁপ আর যোগাড়-যন্ত্রের পর এমন একটা পরিণতি সে কল্পনা করতে পারেনি। ন্যায়সঙ্গত লড়াই করে হেরে যাওয়া সহ্য হয়। কিন্তু একি অন্যায় লড়াই, আর একি হঠাৎ বিপর্যয়। দলপতির আহবানে কাউকে সাড়া দিতে নাদেখে সে ক্ষোভে দুঃখে উঠে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিয়ে বললো এই বাঁশবাড়িতে হিম্মতদার পুরুষ মানুষ একজনও কি নেই? সকলেই কি আমার মতো আউরাত? গাঁয়ের এতবড় এক ঐতিহ্য, গোটা গাঁয়ের ইজ্জত, এমন ভাবে মিস্‌মার হয়ে যাচ্ছে তা দেখেও কি কারো গায়ের খুন গরম হয়ে উঠছেনা?

তটিনীর আওয়াজে ময়দানটা তামামই খামোশ হয়ে গেলো। নিঃশ্বাস ফেলার কথাও যেন ভুলে গেল সকলেই। পাকুড়তলার সেপাইরা লোলুপ দৃষ্টিতে দেখলো-তুলনাহীন খুপসুরতের এক অদ্বিতীয়া যুবতী উপ্‌ছে পড়া যৌবন নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। যেমনই তার দেহের গঠন, তেমনি তার রূপলাবণ্য। জয়লাভের উম্মিদে যুবতীটি দিওয়ানা হয়ে উঠেছে। তা দেখে



www.pathagar.com

পাকুড়তলার সেপাইরা এক সাথে হো হো করে বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠলো। তাদের দলপতি ফের বললো–তেমন কেউ আর নেই দেবী। সাধ থাকলে আপনিই এগিয়ে আসুন। শেষ খেলাটা প্রাণভরে আপনাকে নিয়েই খেলে যাই আমরা।

সবাই আবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ একইভাবে অট্টহাসি হেসে উঠলো। লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে, দুঃখে তটিনী বিশ্বাস খপ্ করে নিজ আসনে বসে পড়লো। তার দুই চোখে উদগত অশ্রুধারা ছলছল করতে লাগলো।

পাশে বসা তাজউদ্দীনের দুই হাত তখন মুষ্টিবদ্ধ হয়ে সাঁড়াশীর মতো শক্ত হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং শক্ত কণ্ঠে বললো। আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু চেষ্টা করে দেখতাম।

চমকে উঠলো তটিনী। সে প্রবল আপত্তির সাথে বললো–আপনি! সেকি! না–না কখনো না। সাদাসিধে নিরীহ মানুষ আপনি। ঐ বর্বরদের বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়িয়ে কিছু করতে পারবেন না।

তাজউদ্দীন ফের বললো–পারা না পারা পরের কথা। আমি আপনাদের এজাযতটুকু চাচ্ছি।

তটিনী ঐ একইভাবে বাধা দিয়ে বললো–না–না, ঐ অমানুষদের মধ্যে আমি অপনাকে ছেড়ে দিতে পারবো না। আপনাকে আমি কিছুতেই পঙ্গু হতে দেবো না।

তাজউদ্দীনের কণ্ঠ এবার কর্কশ হয়ে উঠলো। সে বললো–দুর্বলতা প্রকাশের জায়গা এটা নয়। বাঁশবাড়ির নেমক খেয়েছি আমি। এর ইজ্জত বাঁচানোর কোশেশ্ করতেই হবে আমাকে।

বলেই সে দলপতিকে লক্ষ্য করে আওয়াজ দিলো–একটু দাঁড়ান। আমি আসছি–।

তাজউদ্দীনকে এগুতে দেখে চেনাজানা অনেকেই দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠলো। কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বললো–কত হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!

অন্য একজন বললো–সাত চড় মারতে যার মুখ দিয়ে 'রা' শব্দটি বেরোয় না, সে যাছে ষাঁড়ের সাথে লড়তে!

সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়জন বললো–যাক না। পিটিয়ে কেমন তক্তা বানিয়ে দেয়, গেলেই তা টের পাবে বাছাধন।

নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালবোধে তাজউদ্দীনকে নিয়েই বাঁশবাড়ির দলপতি খেলা শুরু করলো। এবার বাঁশবাড়ির পক্ষের আক্রমণের পালা। দলপতি তাজউদ্দীন কে বললো–আপনি নয়া আদমী। আপনি দাঁড়ান। আমিই গিয়ে আক্রমণটা করে আসি। আপনার শুধু কাজ হবে ওদের কেউ যখন আমাদের আক্রমণ করতে আসবে, তখন আমি তাকে ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও তৎক্ষণাৎ জাপ্‌টে ধরে ফেলবেন। ফস্‌কে যায়না যেন?

বাঁশবাড়ির দলপতি বোল ধরে শত্রু সীমানায় গেল এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিরাপদ স্থান থেকে আত্মরক্ষা করে ফিরে এলো। এবার পাকুরতলার এক হৃষ্টপুষ্ট নওজোয়ান তার সঙ্গীদের দর্পের সাথে বললো–আপনারা দাঁড়ান। ব্যাটাদের দু'জনকে আমি একসাথে সাবাড় করে আসি।

বলেই সে বোল ধরে সগর্বে তাজউদ্দীনের সামনে এসে লাফ দিয়ে পড়তেই যে কান্ড ঘটে গেল, তা দেখে গোটা মাঠের দর্শককুল সেরেফ তাজ্জব বনেই গেল না, ঘটনাটা বিশ্বাস করতে



www.pathagar.com

না পেরে বার বার চোখ মুছে তারা তা দেখতে লাগলো। চিলে যেমন ছোঁ মেরে মুরগীর বাচ্চা ধরে, ঠিক অমনিভাবে ছোঁ মেরে এক নিমেষের মধ্যেই আক্রমণকারীর একখানা হাত ধরে তাজউদ্দীন এমনিভাবে এক পাক দিয়ে ছেড়ে দিলো যে, কাউকেই আর গিয়ে তাকে চেপে ধরতে হলোনা। বাঁশবাড়ি দলের সীমানার মধ্যে লাটিমের মতো একই জায়গায় সে বন বন করে কয়েক পাক ঘুরে মাটিতে পড়ে ডিগবাজীর পর ডিগবাজী খেতে লাগলো। ডিগবাজী-খাওয়া শেষ হলে সে যখন মাটি হাতড়িয়ে উঠে বসলো, তার অনেক আগেই দম ফুরিয়ে যাওয়ায় বোল ফুরিয়ে গেল তার এবং বোল্ ফুরিয়ে যাওয়ায় সে বাতিল বলে গণ্য হলো। এটা লক্ষ্য করে দর্শক কুলের চক্ষুগুলি ছানাবড়া! তটিনীর চোখ তখন ধেঁধে গেছে বিস্ময়ে।

অতঃপর তাজউদ্দীন বোল্ ধরে শত্রু সীমানায় গিয়ে এত ক্ষিপ্র গতিতে দুশমনদের দুইজনকে ছুয়ে দিয়ে এলো যে, তারা তাকে ধরার বা সরে দাঁড়ানোর হুঁশ পাবার আগেই তাজউদ্দীন তাদের আওতার বাইরে চলে গেল। এবার "সাবাস্ সাবাস্" রবে নেতিয়ে পড়া দর্শকবৃন্দ আরো অধিক বিস্ময়ের সাথে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

এবার দুশমনদের আর একজন তাদের আক্রমণ করতে এলে তাজউদ্দীন অমনিভাবে খপ্ করে তাঁর হাত ধরে এমন টান মারলো যে, সে বাঁশবাড়ির দাগ কাটা ঘরের পেছন প্রান্তে এসে ঐ যে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, তাকে টেনে তোলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার নিজে নিজে উঠে দাঁড়াবার তাকদটকুও রইলো না।

এইভাবে দুশমনদের একের পর এক মরা বা বাতিল বানিয়ে তাজউদ্দীন দ্বিতীয় দফার খেলায় বাঁশবাড়ির পক্ষকে অলৌকিক ভাবে জয় যুক্ত করলো।

তৃতীয় দফার খেলাতেও তাজউদ্দীন ঐ একইভাবে পাকুড়তলার পক্ষে দুর্নিবার মুসিবত পয়দা করলো। একের পর এক মরা হয়ে পাকুড়তলার দলের যখন আর মাত্র দুইজন খেলোয়াড় বাকী এবং তাদেরকেও তাজউদ্দীন যখন বোল্ ধরে গিয়ে ছুইয়ে দিয়ে এলো, তখন মার মার রবে উঠে দাঁড়ালো সেপাইরা। অনেকগুলো খঞ্জর তাদের একজনের কাছে সংগোপনে কাপড়ে জড়িয়ে রাখা ছিল। খঞ্জরগুলো হাতে হাতে তুলে নিয়ে তারা ঝাপিয়ে পড়লো বাঁশবাড়ির খেলোয়াড়দের ওপর। তাদের সবার লক্ষ্য তাজউদ্দীন। তাজউদ্দীন সামনেই ছিল। তাকে লক্ষ্য করে একজন ছুরি মারার চেষ্টা করতেই তাজউদ্দীন খপ্ করে তার হাত ধরে ফেললো। ইতিমধ্যেই অন্য একজন তাকে লক্ষ্য করে ছুরি ছুড়ে মারলো। ছুরিটা তাজউদ্দীননের সরাসরি বুকে না লেগে তার কানের ওপর মাথার একপাশে লেগে অনেকখানি কেটে গেল এবং সেখান থেকে দর দর করে খুন ঝরতে লাগলো।

ক্ষেপে গেল তাজউদ্দীন। সে সঙ্গে সঙ্গে একজনের হাত থেকে একটা ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই তাজউদ্দীনের রক্ত দেখে মহাক্রোশে লাফিয়ে উঠলো গোটা ময়দানের হিন্দু-মুসলমান তামাম দর্শক ধর, ধর ব্যাটাদের বলে লাঠি ইট পাথর যে যা হাতের কাছে পেলো, তাই দিয়ে তারা সেপাইদের পিটুনী শুরু করলো। এলোপাতাড়ি মার!



www.pathagar.com

খেলার শুরু থেকেই সেপাইদের দুর্ব্যবহারে আর হঠকারিতায় দর্শককুল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। এবার তারা আর সহ্য করতে পারলো না। শুরু করলো মার। মাঠভরা দর্শকদের এলোপাতাড়ি পিটুনীতে দিশেহারা সেপাইরা প্রাণপণে দৌড় দিয়েও পরিত্রাণ পেলো না। দর্শকদের সাথে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাদেরকে পাকুড়তলা পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়ে বামুন পাড়া ঘিরে ফেললো।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিলো ভুলু খাঁর ফৌজেরা। জনগণের ছদ্মবেশে এলাকাবাসীর সাথে এক সময় মিশে গিয়ে ঐ অঞ্চলে অবস্থানরত সমুদয় সেপাইদের তারা খুঁজে খুঁজে বের করলো এবং হাড়ভাঙ্গা পিটুনী দিয়ে এই সেপাইদের টেনে নিয়ে গিয়ে তারা পাকুড়তলার কয়েক ক্রোশ দূরে পঙ্গু ও অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখে এলো। জনতার সাথে মিশে ভুলু খাঁর ফৌজেরা এমন ত্রাসের সৃষ্টি করলো যে, অন্তত এই সেপাইরা আর এ অঞ্চলে ভুলেও হানা দেয়ার সাহস পায়নি অতঃপর।

দর্শক মন্ডলীর আক্রমণে সেপাইরা দৌড় দিলে এবং দর্শক মন্ডলী তাদের পেছনে ধাওয়া করলে, পলকের মধ্যে বাঁশবাড়ির খেলার ময়দান ফাঁকা হয়ে গেল। তাজউদ্দীনের মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখেই তটিনী বিশ্বাস আসন থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। বেশুমার দর্শকের ভিড় ঠেলে সামনে এগুতে না পেরে সে হাত-পা ছুড়ছিল। ভিড়টা এবার ফাঁকা হয়ে আসতেই সে পড়িমরি ছুটে এলো তাজউদ্দীনের কাছে। তার পিছে পিছে মুহসীন বিশ্বাস ও অন্য কয়েকজন উদ্যক্তাও খেলোয়াড়দের কাছে ছুটে এলেন। খেলোয়াড়দের একজন ইতিমধ্যেই তাজউদ্দীনের ক্ষতস্থানে একখানা গামছা জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছিলো। কিন্তু রক্তের বেগ গামছার বাঁধন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসে ফোঁটা ফোঁটা আকারে তাজউদ্দীনের কাঁধের ওপর পড়ছিল।

তা দেখে তটিনী বিশ্বাস আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। ভুলে গেল স্থান কাল পাত্রের কথা। সে এসে সরাসরি তাজউদ্দীনের হাত ধরে টানতে লাগলো এবং টানতে টানতে সোজা নিজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু আসনের ওপর বসিয়ে দিলো। তাজউদ্দীনের প্রবল আপত্তি সত্বেও তটিনী এবার গামছা খুলে তাজউদ্দীনের ক্ষত স্থান নিজ হাতে ধুইয়ে দিয়ে কচি দুর্বা থেতো করে সেখানে লাগিয়ে দিলো এবং ঘর থেকে একখানা পরিস্কার নেকড়া এনে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলো। এরপর একখানা ভিজে গামছা দিয়ে তাজউদ্দীনের মুখমন্ডল ও সারাদেহ পরিস্কার করে মুছে দিয়ে তাকে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিলো।

প্রথম প্রথম সুদর্শন ও সরল সহজ তাজউদ্দীনের ব্যাপারে তটিনীর দিলে একটা মস্তবড় আফসোস্ ছিল। সে ভাবতো-আহা! এই নয়নাভিরাম চেহারার সাথে কিছুটা হুঁশবুদ্ধি আর কর্ম ক্ষমতা থাকতো যদি। তার এই আকর্ষণীয় অঙ্গসৌষ্ঠবের সাথে সামান্যতম বলবুদ্ধির যোগ দেখলেই তটিনী সেদিন পরিতৃপ্ত হতো। শেষ অবধি তটিনীর সেই আকিঞ্চন এমন আশাতীত ও বিস্ময়কর ভাবে পরিপূর্ণ হবে, তটিনী তা কল্পনাও করেনি এবং তা করার কথা নয়।

সেই নির্বোধ আর অপদার্থ তাজউদ্দীনের অসাধারণ হুঁশবুদ্ধি আর তাকদ দিনে দিনে যতই প্রকাশ পেতে লাগলো, তটিনী বিশ্বাস ততই গভীর থেকে গভীরতর ভাবে অভিভূত হতে


www.pathagar.com

লাগলো। আজকের এই খেলায় তাজউদ্দীনের এই নজীরবিহীন হিম্মত দেখে তটিনীর হুঁশবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। তার অবস্থা হলো বহ্নিমুগ্ধ শামার মতো। ফলাফলের কিছুমাত্র হিসেব নিকেশ না কষে সে ছুটে এলো তাজউদ্দীন রূপ আলোক-বর্তিকার দিকে। নিঃসংকোচে নিজেকে তাজউদ্দীনের খেদমতে নিয়োজিত করে সে অবলীলাক্রমে তার করণীয় করে গেল। কে তা দেখলো, কে কি ভাবলো, তা নিয়ে সে কিছুমাত্র বিচলিত হলো না।

প্রথমদিকে খানিকটা আপত্তি করার পর তাজউদ্দীনও এই দুর্বার টানের কাছে আত্মসমর্পণ করে সুবোধ বালকের মতো তটিনীর সব নির্দেশ পালন করে গেল। কোন কিছুতেই আর কোন আপত্তি তুললো না।

তাজউদ্দীন তার নিজ ঘরে ফিরে আসার পথেই ভিক্ষে করার অজুহাতে সোনাবাউলের শাগরেদ এসে তাজউদ্দীনের সামনে একটা চিরকুট ফেলে চলে গেল। তাজউদ্দীন চিরকুট কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এলো এবং চিরকুটটা চোখের সামনে মেলে ধরলো। ভুলু খাঁ লিখেছে

উস্তাদ, আপনি নিশ্চিন্তে আরাম করুন। কোন রকম পেরেশান হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নেই। আমাদের ফৌজের বৃহত্তর অংশটাই জনগণের সাথে এক হয়ে দুশমণদের ধাওয়া করছে। দুশমণদের ফয়সালা আমাদের ঐ ফৌজেরাই করবে। আপনার পাহারা ও খেদমতে কিছু সেপাই বাঁশবাড়িতে রেখে দিলাম। প্রয়োজন মাত্রই তাদের আপনি হাতের কাছে পাবেন। এছাড়া আমি তো এই আশেপাশেই আছি। জখমী শরীর নিয়ে খামাখা আপনি পেরেশান হতে যাবেন না।

বাহালুল খাঁ।

পত্রটা ছিঁড়ে গায়েব করে দিয়ে তাজউদ্দীন বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। পত্রের প্রসঙ্গটা দিল থেকে সরে যেতেই, তার দিল জুড়ে বসে গেল তটিনী। একি দুর্বার তার আকর্ষণ! নসীবের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত তাজউদ্দীন মহব্বতের পেয়ালায় মুখ লাগানোর কথা কোনদিনই সোচ্ করার অবকাশ খুঁজে পায়নি। ভরা পেয়ালা হাতের কাছে পেয়েও সে কোনদিনই তা ছোঁয়নি। বাঁশবাড়িতে আসার পর তটিনীর অনুপম রূপ লাবণ্য দেখেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ভয়ে সে তার হৃদয়ের ফটকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে। বেশ কয়েকটা ঝড় ঝাপটার ধাক্কাতেও সে প্রাচীর এ যাবত এতটুকু নড়েনি। কিন্তু আজ তার দিলে একি তুফান পয়দা করলো তটিনী! তাজউদ্দীনের দিলের সেই ইস্পাত কঠিন প্রাচীর আজ প্রবল বেগে নড়ে গেছে ভিত সমেত। তটিনীর খেদমত। তটিনীর দরদ, এবং সর্বোপরি তটিনীর মার্জিত রুচি ও অনাবিল অনুভূতি লা-ওয়ারিশ তাজউদ্দীনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে অদৃশ্য বাঁধনে। তার চোখের সামনে ক্রমেই যেন আবছা হয়ে যাচ্ছে তার সুদীর্ঘ সংকল্পের সূর্যদীপ্ত নিশানা। কওমের আহাজারী হৃদয়ের আহাজারীর সামনে যেন কমজোর হয়ে নেতিয়ে পড়ছে ক্রমেই।

শক্ত হলো তাজউদ্দীন। এই গতিকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। সামনে তার সফেন সমুদ্র। প্রমত্ত ঝড় তুফানের মাঝে এই সমুদ্রে তার কওমী কিস্তি ভাসমান। সেই কিস্তিরই সে অন্যতম বিশিষ্ট কান্ডারী। হাতের হাল মজবুত রাখার লক্ষ্যে পেছনের টান কমজোর করে দিতেই হবে তাকে।



www.pathagar.com

অনেকখানি রাত হয়েছে। লোক চলাচল পাতলা হয়ে এসেছে। ঝিমিয়ে গেছে ঘরেবাইরের বাৎচিত আর সাড়াশব্দ। তাজউদ্দীনের রক্ত দেখে চমকে উঠে অনেকক্ষণ আহাজারী আর আফসোস্ করার পর মরিয়ম বিশ্বাসও এখন নীরব হয়ে ঘুমিয়ে গেছেন ঘরে। সাঁঝওয়াক্তে তিনি এসে তাজউদ্দীনের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেছেন। তটিনী বিশ্বাস একবাটী গরম দুধ এনে জোর করেই তাজউদ্দীনকে পান করিয়ে গেছে। এরপর সব চুপচাপ। নিঃসঙ্গ তাজউদ্দীন নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছে তা তারই খেয়াল নেই। পাতলা একটা ঘুমের পর সে আবার জেগে গেছে। অর্ধোন্মেলিত চোখের সামনে আলোর রশ্মি প্রকট হয়ে উঠতেই সে বুঝতে পারলো, ঘরে তার দীপ জ্বলছে সেই থেকে। আরো তার খেয়াল হলো ভেজানো দুয়ার ভেজানোই আছে, বন্ধ করা হয়নি।

উঠি উঠি করেও আরো কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইলো তাজউদ্দীন। ইতিমধ্যেই দরজার পাশে মানুষের পদধ্বনি শোনা গেল। তাজউদ্দীন চমকে উঠে দরজার দিকে নজর দিয়েই দেখতে পেলো, ভেজানো দুয়ার ঠেলে তার ঘরে ঢুকছে তটিনী। হাতে তার সেঁক দেয়ার সরঞ্জাম।

দুয়ারটা ফের অল্প একটু ভেজিয়ে দিয়ে সেঁকের সরঞ্জাম নিয়ে তটিনী এসে সরাসরি তাজউদ্দীনের শয্যার পাশে বসলো। তা দেখে তাজউদ্দীন ধড়মড় করে উঠে বসতেই তটিনী বিশ্বাস স্মিতহাস্যে বললো–ও জেগেই আছেন তাহলে?

তাজউদ্দীন থতমত করে বললো–হ্যাঁ, তা আছি। কিন্তু –

কিন্তু কি?

আপনি এখনও ঘুমোননি?

পাশেই তো ঘর। আমি ঘুমিয়ে গেছি বলেই কি মনে হয়েছে আপনার?

না, মানে–আমি নিজেই একটু ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম তো! তাই কিছু ঠাহর করতে পারিনি। আপনি জেগেই ছিলেন এতক্ষণ?

সন্দেহ আছে আপনার?

তাজউদ্দীন হেসে বললো–না, তা থাকবে কেন? কিন্তু এতক্ষণ আপনি কি করলেন একা একা?

তটিনীও হাসি মুখে জবাব দিলো–বসে বসে ভাবলাম।

ভাবলেন!

হ্যাঁ ভাবলাম।

কি ভাবলেন?

ভাবলাম–মানে ভেবে দেখলাম যখমের ব্যথায় কষ্ট হচ্ছে আপনার।

আমার কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ। আর তাই উঠে গিয়ে এসবের আনযাম করলাম।

আগুনের ডিব্বা আর লবণের পুটলীর প্রতি ইঙ্গিত করলো তটিনী। তাজউদ্দীন প্রশ্ন করলো–ওগুলো কি হবে?



www.pathagar.com

সেঁক দিতে হবে। একটু খানি তো কাটেনি! অনেক খানি কেটে গেছে। এখন ব্যথা বেশী না থাকলেও, সেঁক না দিলে সকাল বেলা উঠতে পারবেন ব্যথায়? নিন্ শুয়ে পড়ুন।

মানে!

সেঁক দিতে হবেনা?

আপনিই দিয়ে দিবেন সেঁকটা?

তা না দিলে নিজে আপনি দিতে পারবেন ঠিক মতো?

তাজউদ্দীন ইতস্তত করে বললো-তা-মানে, এটা কি ঠিক হবে, বলুন?

কোনটা?

এইযে এই সেঁক দেয়াটা!

সেঁক দেয়ার আগে যা যা করেছি তা ঠিক হয়নি?

খুব একটা ঠিক হয়নি। তবু সে সব যা করেছেন, দিনে করেছেন। রাতে নয়।

দিনেরটা খুব একটা বেঠিক না হলে, রাতেরটাও তেমন কিছু বেঠিক হবে না।

কিন্তু এত রাতে একা আপনি আমার ঘরে এসেছেন, এটা দেখলে লোকে বলবে কি?

তটিনী এবার মাথা তুলে তীক্ষ্ণ নজরে তাজউদ্দীনের দিকে তাকালো। লহমা কয়েক এক নজরে চেয়ে থাকার পর সে নাখোশ কণ্ঠে বললো- লোকে বলবে কি-মানে? লোকের বলাবলিতে আমার কি এসে যায়?

এ কথার তাৎপর্য বুঝে উঠতে না পেরে তাজউদ্দীন কিছুটা বিস্ময়ের সাথে বললো-কিছুই এসে যায়না?

তটিনী আরো ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিলো-না কিছুই এসে যায় না। আমার এই জিন্দেগীটা আমার, না লোকের? আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথে লোকের ঐ বলাবলির সম্পর্ক কি? কি সম্পর্ক আছে তার আমার আশা আকাঙ্খার সাথে?

তাজউদ্দীন তাজ্জব হয়ে তটিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এর জবাবে একটা কথাও তার মুখে যোগালো না। তটিনী বলেই চললো-শৈশব থেকে আজতক এক নাগাড়ে আর অন্ধভাবে ঐ লোকে বলবে কি-এর মাশুল জুগিয়ে আসছি। এতে লোকের কি লাভ হয়েছে-জানিনা। কিন্তু আমি কি পেয়েছি? জিন্দেগীটা বিরাণ করে দিয়ে কি লাভ হয়েছে আমার? দীর্ঘশ্বাস বৈ তো আর কিছুই নয়! এতদিন আলোর সন্ধান পাইনি, আমি নড়িনি। কিন্তু আজ দেদীপ্যমান সূর্যালোকে পরম করণীয় হাতের কাছে পেয়েও ঐ বলাবলির তোয়াক্কা আর করতে যাবো কোন দুঃখে?

ক্ষোভের সাথে একটানা এত কথা বলে তটিনী একটু হাঁপাতে লাগলো। হতবুদ্ধি তাজউদ্দীন কথা খুঁজে না পেয়ে বললো-তা সে যা-ই হোক, একটা ধরাবাঁধা পরিমন্ডলে চলতে হয় আমাদের। শত ব্যথা দিলে জমা থাকলেও-

তড়াক করে মাথা তুললো তটিনী। তাজউদ্দীনের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে সে বললো-এখানে আসা আমার ঠিক হয়নি-এই তো?



www.pathagar.com

হকচকিয়ে গিয়ে তাজউদ্দীন বলতে গেলো–হ্যাঁ–মানে–তটিনী আরো বিগড়ে গেলো। সে সঙ্গে সঙ্গে বললো এটা আপনি পছন্দও করেন না।

পছন্দ? মানে–

আমার আচরণটাও বাড়াবাড়ির মতোই আপনার কাছে কষ্টকর।

না, ঠিক তা নয়।

ভয় নেই। আমি এমন কিছু করবো না যা আপনার অপছন্দ বা আপনার কাছে কষ্টকর। আমার প্রতি আপনার কি অনুভূতি জানিনা। স্বরূপ বা আত্মপরিচয় গোপন করে বর্ণচোরার মতো অপরকে যারা ধোকা দিয়ে চলে, তাদের অনুভূতি জানার মতো আগ্রহও আমার নেই। কথা আমার একটাই। আর সে কথা আমার আগেও আমি বলেছি, আবারও বলছি–আপনার কষ্টে আমার খুব কষ্ট হয়। কেন জানিনে, আপনার কষ্ট লাঘব করতে পারলে আমি খুব তৃপ্তি পাই। আর সেই জন্যেই এই সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলাম। আপনার বিরক্তি পয়দা করতে নয়।

তাজউদ্দীন নড়েচড়ে উঠলো। বললো–এ্যাঁ, সেকি! মানে–আপনি এসব–

সেদিকে কান না দিয়ে কথার খেই ধরেই তটিনী বিশ্বাস বললো–সে যাক। আপনি আশ্বস্ত থাকতে পারেন। এ ভুল আর আমার হবে না।

বলেই সেঁকের সরঞ্জাম এক পাশে রেখে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ালো তটিনী। তাজউদ্দীন শশব্যস্তে বললো–আরে–ছিঃ ছিঃ! একি বলছেন আপনি! আমাকে আপনি পুরোপুরি ভুল বুঝেছেন।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে তটিনী বিশ্বাস বললো–তা যা–ই বুঝে থাকি, এটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না যে, রূপে–গুণে, বলে বীর্যে এত যে সম্পদশালী তা মেষশাবকের মতো সে এত বুযদিল হয় কি করে? তার দিলটা এত সংকীর্ণ হয় কি করে? আর তার হৃদয় এমন উষর হয় কি কারণে?

তটিনী বিশ্বাস দ্রুতপদে দরজার কাছে চলে এলো। তা দেখে তাজউদ্দীন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে তড়িৎ বেগে তটিনীকে ডিঙ্গিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এরপর তটিনী কিছু বুঝে উঠার আগেই দুই হাতে তার দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে তাজউদ্দীন বললো–দাঁড়ান। শুধু ঐটুকু জেনে গেলেই চলবে না। সেই সাথে এটাও আপনাকে জেনে যেতে হবে যে, মওকা বুঝে সওদা অন্তত দিলের বাজারে সব লোকেরা করে না। আর তা তারা করে না বলেই এ বাজারে যুগে যুগে ফতুর হয় তারাই। এটা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। আমাকেও অমনিভাবে ফতুর করে দেয়ার কোন অধিকার আপনার নেই। আমাকে আপনি এমনভাবে নিঃস্ব করতে পারেন না।

তটিনী বিশ্বাস আস্তে আস্তে মাথা তুলে বিহবল নেত্রে তাজউদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তাজউদ্দীন অনুনয় করে বললো–না, আপনি তা পারেন না।

তটিনীর কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে হাত দু'খানা নামিয়ে নিলো তাজউদ্দীন। প্রদীপের স্বল্পালোকে তটিনী লক্ষ্য করলো, তাজউদ্দীনের দুই চোখ তখন আসুঁভারে বিপর্যস্ত। মোহাবিষ্ট



www.pathagar.com

হয়ে তটিনী বিশ্বাস তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলো তাজউদ্দীনের প্রেমাপ্লুত দুই নয়নের দিকে। তটিনীর অজ্ঞাতেই তারও দুই নয়ন ভরে গেল বিগলিত আনন্দের ধারায়।

তাজউদ্দীনের চোখের ওপর চোখ দুটি স্থির করে তটিনী এবার তৃপ্তির হাসি হেসে বললো– সত্যিই, আপনার তুলনা একমাত্র আপনিই। এর কোন দুস্‌রা নেই!

তৃপ্ত দিলে স্মিত হেসে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল তটিনী।

## ৮

খুন আর খুন! হরদম খুন হচ্ছে বাংলা মুলুকের মুসলমান। পাইকারী হারে লোপ পাচ্ছে মুসলমানদের অস্তিত্ব। এখন আর বাছ–বিচারের তোয়াক্কা নেই পাণ্ডুয়ারাজ গণেশ ভাদুড়ীর। বাছ–বিচারে গেলেই একের পর এক বিপত্তি দেখা দিচ্ছে। ছোটজাতের হিন্দুরাও চায়না– মুসলমানেরা নিশ্চিহ্ন হোক এদেশ থেকে। প্রতিরোধের কাতারে তারাও এসে শামিল হচ্ছে। জাতবিচারের বালাই কিছু এমুলুকে থাকুক, এটা আদৌ তাদের কাম্যনয়। তারা চায়– এক হয়ে যাক ছোট বড়। ব্রাহ্মণ শূদ্র এক আসনে পাশাপাশি বসুক। এক পাত্রে পানাহার করুক। কবর হোক কৌলিন্য প্রথার।

এসব কথা ভাবতেও রাজা গণেশের শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে ওঠে। নরকের পথ সাফ করতে চায় নরাধমেরা। মুসলমানদের সংস্পর্শেই এইসব ছোটলোকদের মাথায় এই দুর্বুদ্ধি গজিয়েছে। হিন্দুধর্মের সনাতন বিধানগুলি বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এই ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা– এদেশ থেকে মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ সাধন। অবলম্বনের অভাব ঘটলেই বিষ দাঁত ভেঙ্গে যাবে এইসব অস্পৃশ্য ছোট লোকদের। কুলিনদের পায়ের তলে পুনরায় এসে আছড়ে পড়তে পথ পাবে না পাপিষ্ঠরা।

কাজেই মসনদের নিরাপত্তার প্রশ্নের সাথে মুসলমানদের নির্মূল করার আরো অনেক তাকিদ রাজা গণেশকে অহরহ তাড়া করে ফিরছে। রাজা গণেশ তাই সেপাইদের পতি আদেশ দিয়েছেন জলদি এদেশকে ইসলাম মুক্ত করা হোক। আর কোন বাছ–বিচারের বাহুল্যে না থেকে ইসলামকে তড়িৎবেগে বিতাড়িত করা হোক।

অতএব এখন আর অবধি নেই খুনের। গোপনে, প্রকাশ্যে, নিশীথে, দিবসে–যত্রতত্র, যখন তখন খুন হচ্ছে তৌহিদের অনুসারীরা, সেরাতুল মুস্তাকিমের রাহীরা। এই খুনের আর অছিলাও লাগে না কিছু এখন।

www.pathagar.com

হযরত নূর কুতুব-ই-আলম অস্থির হয়ে উঠেছেন। অভিযোগ আর আহাজারীর ঝড় তাঁকে তাঁর ইবাদতের আসনে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। স্থিরভাবে চিন্তা করার অবকাশটুকুও পাচ্ছেন না। এই মযলুমদের এ মুলুকে তিনিই ভরসাস্থল। তারই মুখাপেক্ষী এ মুলুকে এ কওমের সকলেই।

প্রতিরোধে নিয়োজিত এ পক্ষের ক্ষুদ্র শক্তিটাও রাজা গণেশের ব্যাপক বল প্রয়োগের সামনে কমজোর হয়ে পড়েছে। দেশব্যাপী অবিরাম এই খুন-লুট তারা আর প্রতিরোধ করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তৌহিদ বেগের সামর্থের বাইরে গেছে পরিস্থিতি। তারাও এসে দাঁড়িয়েছে সুফী সাহেবের সামনে। পথনির্দেশ চায় সবাই।

সেদিন শুক্রবার। সুফী সাহেবের খানকা মসজিদে জুময়ার নামাজ শেষ হলো। চলমান তুফান থেকে নাজাত পাওয়ার মানসে আল্লাহ পাকের কাছে সমবেতভাবে মুনাজাত করা হলো। মুসল্লীদের সামনে দাঁড়িয়ে তাজউদ্দীন এই মুসিবতের মোকাবেলায় স্ব স্ব বুদ্ধিতে পরিকল্পনা উদ্ভাবন ও তা হিম্মতের সাথে বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য পেশ করলো। সে বললো- অন্যের মদদের অপেক্ষায় বসে থাকার পরিস্থিতি আর নেই। হেফাজতির প্রশ্নে প্রত্যেকেই এখন ব্যতিব্যস্ত। প্রত্যেকেই এখন পেরেশান। সুতরাং অন্যের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে না থেকে সকলেই এখন নিজের পায়ে নিজেই উঠে মজবুত হয়ে দাঁড়ান এবং সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মুসিবতের মুখোমুখি জেহাদ করে যান। তাতে কামিয়াব হতে না পারলেও, কাপুরুষের মতো অসহায়ভাবে মরার চেয়ে হাতিয়ার হাতে শহীদ হওয়ার সওয়াব হাসেল করুন। চরমে না উঠলে কোন কিছুরই হঠাৎ করে ফয়সালা হয়ে যায়না। নিজের করণীয়টা নিষ্ঠার সাথে করতে হবে সবাইকে। অবশিষ্টটা আল্লাহ পাক দেখবেন।

নামাজ অন্তে মসজিদ থেকে বেরিয়েই সুফী হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব সহ শায়খ আনোয়ার, শায়খ জাহিদ, তাজউদ্দীন, তুলু খাঁ ও অন্যান্য তামাম মুসল্লীরা তাজ্জব বনে গেলেন দেশী উদ্বাস্তুর কাতারে পরদেশী উদ্বাস্তুর এক বিরাট কাফেলা দেখে। সুফী সাহেবের খানকা শরীফে দেশী উদ্বাস্তু আর মযলুমের ভিড়েই তিল ধারণের ঠাই ছিলনা। তার ওপর আবার বালবাচচা ও লোটা কম্বল কাঁধে নিয়ে এই বহিরাগত উদ্বাস্তুদের কাফেলা এসে হাজির হওয়াতে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বহিরাগত এই উদ্বাস্তুরা তামামই দ্বারভাঙ্গার মুসলমান।

মিথিলা বা ত্রিহুতের অন্তর্গত দ্বারভাংগার এই উদ্বাস্তুরা অতিকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাংলা মুলুকে সুফী হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের আশ্রয়ে এসেছে। এসেই তাঁরা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে সুফী সাহেবকে জানালো যে, ত্রিহুত রাজ শিবসিংহের মুসলমান নিধন উৎসবের শিকার হয়ে তারা দ্বারভাঙ্গা থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও দাঁড়াবার স্থান না পেয়ে বাংলা মুলুকে সুফী সাহেবের আশ্রয়ে এসেছে।

অদৃষ্টের পরিহাস! এদের অনেকেই এখনও জানেনা যে, জান বাঁচানোর উম্মিদে তারা উত্তপ্ত কড়াই থেকে লাফ দিয়ে জ্বলন্ত চুলার মধ্যে পড়েছে। যে আগুনের ভয়ে দ্বারভাঙ্গা ত্যাগ করেছে



www.pathagar.com

তারা তার চেয়েও তীব্রতর দাহে দগ্ধীভূত হয়ে বাংলা মুলুকের মুসলমানেরা পলায়নের পথ খুঁজে পাচ্ছেনা।

হযরত নূর কুতুব-ই-আলমের কাছে এটা শুধু বোঝার ওপর শাকের আটিই নয়, একটা রীতিমতো পাহাড়। তবুও আগন্তুকদের আশ্রয় দানের যথাসাধ্য ব্যবস্থা তিনি সঙ্গে সঙ্গে করলেন। অতপর ত্রিহুত রাজের হঠাৎ এই মুসলমান নিধনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু তাঁর সামনে অবস্থিত আগন্তুকদের একজনও এর সঠিক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারলোনা। খন্ডাকারে যে যা বললো তা থেকে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া গেলনা। সঠিক ব্যাখ্যা দিলেন ত্রিহুত থেকে সদ্যাগত বাংলার এক সেপাই। তিনি ত্রিহুত রাজার বাহিনীতে চাকরীরত ছিলেন। শিব সিংহের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি অতি অল্পদিন আগে স্বদেশে ফিরে এসেছেন এবং রাজা গণেশের বিরুদ্ধে জেহাদে শরিক হয়েছেন। ত্রিহুতের পূর্বা পর যে অবস্থা তিনি তুলে ধরলেন, তা নিম্নরূপ-

শিবসিংহের আগে ত্রিহুতের রাজা ছিলেন শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ। ক্ষত্রিয় গোত্রের এই দেবসিংহ ছিলেন অতি অমায়িক মানুষ। বাংলা মুলুকের ব্রাহ্মণ রাজগুরু মহাদেব চক্রবর্তীও উদার ও ন্যায় পরায়ন পন্ডিত ছিলেন। ধর্মীয় রীতিনীতি নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন তিনি। কিন্তু কোন কিছু নিয়েই তিনি গোড়ামী করতেন না বা কট্টর পন্থা অবলম্বন করতেন না। গুরু শিষ্য দুইজনই মানুষকে ভালবাসতেন এবং ছোট-বড়, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পাপাচারকে ঘৃণা করতেন তাঁরা। মানুষের হীনমন্যতা অসহ্য ছিল তাঁদের কাছে। কিন্তু মানুষ ছিল তাদের কাছে পবিত্র। মানুষকে তাঁরা ঘৃণা করতেন না কখনও।

রাজপুত্র শিবসিংহের চরিত্র ছিল বিলকুল এর বিপরীত। তিনি ছিলেন লোভী, লম্পট, দাম্ভিক ও পরশ্রীকাতর। মানুষের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ তাঁর ছিলনা। তিনি না ছিলেন অন্যের প্রতি সহনশীল, না মানতেন নির্দিষ্ট কোন রীতিনীতি। অন্য জাতির আচার অনুষ্ঠান তিনি বরদাস্ত করতে পরতেননা। অথচ নিজ জাতির আচার অনুষ্ঠানের প্রতিও আদৌ তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন না। সুরা, সম্পদ ও আউরাত-এই তিন পদার্থের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্বার। হৃদয়ের আবেদন বলে কোন পদার্থ তার মধ্যে ছিলনা। স্বার্থের কাছে মাতা পিতা ভাই-বেরাদার-সকলেই ছেঁড়া পয়জারের মতো মূল্যহীন ছিল তাঁর কাছে। দ্বারভাঙ্গার শাসনভার ন্যস্ত ছিল তাঁর ওপরই।

একদিন রাজা দেবসিংহ দরবারে বসে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। যে প্রজাদের অর্থে রাজভোগ খান তিনি। সেই প্রজাদের সুখ শান্তির যথা সম্ভব সব ব্যবস্থা করতে তিনি একান্ত আগ্রহী। পাত্রমিত্র সেনাসৈন্যদের তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন। পরিকল্পনা উদ্ভাবনের আদেশ জারী করছেন। রাজগুরু মহাদেব চক্রবর্তী পাশে বসে রাজাকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সহযোগিতা করছেন। এমন সময় একদল ফরিয়াদি দরবার কক্ষের দুয়ারে এসে দাঁড়ালো। রাজ-আদেশে তারা সিংহাসনের সামনে এসে করজোড়ে



www.pathagar.com

বললো–মহারাজ, আমরা দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত দেউপাড়া গ্রামের ধোবী সম্প্রদায়। আমাদের একটা নালিশ আছে মহারাজ।

সভার কাজ স্থগিত রেখে রাজা দেব সিংহ বললেন–বলো কি তোমাদের নালিশ?

ফরিয়াদীদের একজন আরো একটু সামনে এসে করজোড়ে বললো–নালিশটা বড় কঠিন মহারাজ। অভয় না দিলে, এ নালিশ পেশ করার সাহস আমাদের নেই।

রাজা বললেন–যা বলতে চাও, নিঃসংকোচে বলো। ফরিয়াদী জড়িত কণ্ঠে বললো–মহারাজ, রাজকুমার শিবসিংহের লোক আমাদের দেউপাড়া গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। সামনে যাকে পেয়েছে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে।

রাজা দেবসিংহের দুইচোখ জ্বলে উঠলো। তিনি প্রশ্ন করলেন–কারণ?

কারণটা বড় দুঃখজনক মহারাজ। আমাদের গ্রামের মহিম ধোপার মেয়ে মোহিনী খুব সুন্দরী। রাজকুমারের নজরে পড়ে অভাগী।

তারপর?

রাজকুমারের লোকজন এসে জোর করেই তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। তা দেখে আমরা গ্রামবাসীরা সবাই মিলে সেই লোকজনদের ঘেরাও করে মোহিনীকে উদ্ধার করি এবং ওদেরকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেই–এই কারণ মহারাজ।

রাজা দেবসিংহ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ফরিয়াদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন–শুধুই তাড়িয়ে দিলে?

ওদের আমরা একদম খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু রাজকুমারের লোক বলে–

ওদের তোমরা ছেড়ে দিয়েছ?

আজ্ঞে মহারাজ।

এখন ওরা আবার ফিরে এসে তোমাদের খতম করছে?

মহারাজ অন্তর্যামী।

ঠিকই করছে।

আজ্ঞে?

তোমাদের যা উচিত প্রাপ্য, ওরা তাই তোমাদের দিচ্ছে। তোমরা এখন যেতে পারো।

চমকে উঠলো ফরিয়াদীরা। অসহায় কণ্ঠে বললো, মহারাজ।

এবার জবাব দিলেন রাজগুরু মহাদেব চক্রবর্তী। তিনি বললেন শাস্ত্রে বলে, কুকুর বুঝে মুগুর ব্যবহার না করলে, বিপদের সম্ভাবনা অনেক। সাপ–বাঘ–দুর্জন–এদের গায়ে হাত দিলে তাদের একদম খতম করে দেয়াই বিধান। নইলে তারা পাল্টা আঘাত হানবেই।

কিন্তু–

তোমরা যদি ঐ দুরাচারদের দস্তুর মতো শাস্তি দিয়ে ওদের প্রাণে আতংকের সৃষ্টি করতে, রাজকুমারের লোক বলে খাতির করতে না যেতে, অন্তত ওরা আর তোমাদের গ্রামে ফিরে আসার সাহস করতোনা।

ওরা সাহস না করলেও তো রাজকুমার ছাড়তেন না। তিনি তাঁর সেপাইদের পাঠাতেন।



www.pathagar.com

রাজা দেবসিংহ বললেন–সে সুযোগই তাঁকে আমি দিতামনা। দুর্বৃত্তদের দস্তুর মতো শায়েস্তা করে এসে তোমরা যদি ব্যাপারটা আমার কানে দিয়ে যেতে, তোমাদের আজ এ দুর্গতি হতোনা।

আমরা গরীব কাঙ্গাল মানুষ মাহরাজ। কি করলে কি হবে, তা কেমন করে বুঝবো আমরা?

ঠিক আছে। তোমরা তোমাদের গ্রামে ফিরে যাও। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

গ্রামে ফিরে যাবো! কিন্তু মহারাজ–

ভয় নেই। তোমাদের সব দায়িত্ব এরপর থেকে আমার ওপর– রইলো।

ফরিয়াদীরা চলে গেল। রাজা দেবসিংহ তাঁর সেনাপতিকে ডেকে ফরিয়াদীদের হেফাজত করা সহ তাদের পূর্নবাসন করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তলব দিলেন দ্বারভাঙ্গার শাসন কর্তা পুত্র শিব সিংহকে।

একদিন পরই রাজকুমার শিব সিংহ দরবারে এসে হাজির হলেন। সভাসদে পরিপূর্ণ রাজদরবার। শিব সিংহ এসেই তার পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন মাহরাজ আমাকে তলব করেছেন কেন?

রাজা দেব সিংহ বললেন তোমার বিরুদ্ধে নালিশ আছে।

শিব সিংহ নাখোশ দীলে বললেন–নালিশ! আমর বিরুদ্ধে নালিশ?

হ্যাঁ। তোমার লোকজন এসে দেউপাড়ার মহিম ধোপার মেয়েকে নাকি ধরে নিয়ে যাচ্ছিল?

শিব সিংহের কপালে একটা কুঞ্চন দেখা দিলো। চোখ দুটি দপ করে জ্বলে উঠলো। তিনি দম্ভের সাথে জবাব দিলেন হ্যাঁ, যাচ্ছিল।

দেব সিংহ প্রশ্ন করলেন–কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?

আমার বাস ভবনে।

কেন?

কাজের জন্যে। আমার ভবনে কাজ করার জন্যে। ও ব্যাটা ছোটলোক মহিম ধোপার এত স্পর্ধা যে, বার বার খবর দেয়া সত্বেও সে তার মেয়েকে আমার বাড়িতে পাঠায়নি।

তোমার বাড়িতে কাজ করতে ওদের যদি আগ্রহ না থাকে, তাহলে পাঠাবে কেন?

পাঠাবেনা মানে? ওদের জন্যই তো আমাদের সেবা করার জন্যে। আমাদের মনোতুষ্টির জন্যে। আমাদের মনোরঞ্জন করাইতো ঐ ব্যাটা ছোটজাতদের একমাত্র কাজ। ওদের একমাত্র ধর্ম। ওদের আগ্রহ–অনাগ্রহের অপেক্ষা কি এখানে?

তাই তুমি লোক পাঠিয়ে ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিলে?

হ্যাঁ। ছোটজাতের লোকদের তো আর সব সময় সহজভাবে সোজা পথে আনা যায়না। মাঝে মধ্যে মুগুর হাঁকাতে হয় বৈকি?

সেতো ঠিকই। তা–ঐ মুগুর হাঁকানো দেখে দেউ পাড়ার সব মানুষ ক্ষেপে গিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিলো?

শুধুই তাড়িয়ে দেয়া? কুকুর তাড়া তেড়েছিলো। ছোটলোকদের কি স্পর্ধা।



www.pathagar.com

তাই তুমি ক্ষেপে গিয়ে ওদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছো?

হ্যাঁ পুড়িয়েছি

ওদের অনেককে হত্যাও করেছো?

করবো না মানে? ব্যাটাদের এত স্পর্ধা।

রাজা দেবসিংহের চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগলো। তিনি শক্ত কণ্ঠে বললেন–এখন তোমার এই স্পর্ধার জন্যে তোমাকে যদি মৃত্যু দন্ড দেই আমি?

শিব সিংহ থমকে গেলেন। ক্রুদ্ধও হলেন। বললেন–বিনা অপরাধেই?

গর্জে উঠলেন দেবসিংহ। বললেন–বিনা অপরাধে! মার্জনাহীন অপরাধে অপরাধী তুমি। আর তোমার সে অপরাধ তুমি নিজেই প্রমাণ করেছো?

শিব সিংহও শক্ত কণ্ঠে বললেন–কিন্তু অপরাধটা হলো কিসে আমার?

বটে! দেউপাড়ার গ্রামটা জ্বালিয়ে দাওনি তুমি? হত্যা করোনি গ্রামবাসীদের?

সেতো আগেই স্বীকার করেছি। কিন্তু এখানে অপরাধটা হলো কি!

দেব সিংহ অবাক হয়ে পুত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। পরে বললেন–কোন অপরাধই হলোনা?

অপরাধের কিছুই তো আমি দেখিনা?

কিছুই তুমি দেখোনা? মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে মানুষকে হত্যা করতে বিবেকে তোমার একটুও বাধেনা?

শিব সিংহ এর জবাবে স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বললেন বিবেক! বিবেকে বাধার মতো কি আছে এখানে? আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, মহারাজ এটাকে কোন নজরে দেখছেন। তিনি কেন ভুলে যাচ্ছেন–বাগানের আগাছার মতো এইসব ছোট লোকেরা তো সমাজের জঞ্জাল। এদের একদম সাফ করে ফেলে দেয়াই উচিত।

পুত্রের এই মানসিকতার পরিচয় পেয়ে রাজা দেবসিংহ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বললেন–তাহলে মানুষের কাপড় ধুয়ে দেবে কে? তুমি?

আগুনের সেঁকা লাগলো শিবসিংহের গায়ে। তিনি ক্রোধ ভরে বললেন–মহারাজ কি আমাকে অপমান করার জন্যেই ডেকেছেন?

যদি সেই জন্যেই ডেকে থাকি, তাহলেও কি দোষের কিছু করেছি? এত মানুষকে এতভাবে অপমান আর নির্যাতন করার পরও যদি তোমারটা দোষের কিছু না হয়, আমিতো মাত্র একজন মানুষকে করেছি, আমারটা দোষের হবে কেন?

শিবসিংহ দম্ভের সাথে বললেন–একজনকে মানে! আমি রাজকুমার?

রাজকুমার হলেও তোমার দশটা মাথা বিশটা হাত নেই। তুমি একজন ওদের মতোই মানুষ।

ওদের মতো! কোথায় আমি আর কোথায় ওরা! আমি একজন ক্ষত্রিয়! নমস্য ব্যক্তি! ওরা তো অস্পৃশ্য! অধম জীব! প্রত্যুষে ওদের মুখ দর্শনও পাপ!

পাপ!



www.pathagar.com

নিশ্চয়ই। ঐতো রাজগুরু শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত মানুষ আপনার পাশেই উপবিষ্ট। তাঁকেই প্রশ্ন করুন–পাপ কিনা?

রাজ কুমার রাজগুরু মাহাদেব চক্রবর্তীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন। দেবসিংহ চক্রবর্তী মহাশয়ের দিকে নজরটা একবার ফেরালেন। অতঃপর কি বলবেন তা ভাবতেই রাজগুরু মহাদেব চক্রবর্তী বললেন–শাস্ত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যায় কি আছে তা থাক। আমাদের দেশাচার অনুসারে রাজকুমারের কথা ঠিক। প্রত্যুষে এদের মুখ দেখলে আমরা প্রীত হইনা, বিরক্ত হই। এটাকে আমরা কুলক্ষণ বলে মনে করি। আর সে কারণে এটাকে বলি পাপ।

রাজকুমার উৎসাহিত হয়ে বললেন–তাহলে?

রাজগুরু বললেন মহিম ধোপার মেয়ে মোহিনী অস্পৃশ্য। রাজকুমার শিবসিংহ একজন নিখুঁত ক্ষত্রিয় এবং তজ্জন্য একজন কুলীন ব্যক্তি। পদমর্যাদায় তিনি পবিত্র। মোহিনীর মেয়ে বা মোহিনীদের সাথে তুলনা হওয়ার কিছুমাত্র কারণ এখানে থাকতোনা, যদি অস্পৃশ্যকে সর্বক্ষেত্রেই অস্পৃশ্য মনে করে রাজকুমারের মতো আমাদের সমাজের সকল পবিত্র ব্যক্তিরাই ওদের থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু কি পরিতাপ! অস্পৃশ্যদের সুন্দরী রমনীরা আর তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য থাকেনা। অস্পৃশ্যদের সুন্দরী রমনী কন্যাদের নিজ গৃহে আহবান করতে, তাদের সেবা নিতে, তাদের সম্ভোগ করতে গিয়ে সবাই তারা ভুলে যান যে, ওরা অস্পৃশ্য এবং প্রত্যুষে ওদের মুখ দর্শনও পাপ।

ক্রোধে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে শিব সিংহ রাজগুরুকে লক্ষ্য করে বললেন–আপনি কি বলতে চান?

জাতিভেদ নিয়ে শাস্ত্রে যে ব্যাখ্যাই থাক, মানুষকে ঘৃণা করা মানুষকে নির্যাতন করা কোন মানুষের ধর্ম নয়, মানুষের কাজ নয়, মনুষ্যত্ব বিবর্জিত বর্বরের কাজ।

রাজকুমারের মেজাজ চরমে উঠে গেল। তিনি উদ্ধত কণ্ঠে বললেন–তবু আমি বলবো নির্যাতনই ওদের প্রাপ্য এবং দ্বারভাঙ্গার শাসন দন্ড যতদিন আমার হাতে আছে, ততদিন আমি ওদের কাউকে রেহাই দেবোনা।

রাজগুরু প্রশ্ন করলেন–কারণ কিছু না থাকলেও?

না থাকলেও মানে? যথেষ্ট কারণ আছে এর পেছনে। অনুগ্রহ আর অনুকম্পার তিল পরিমাণ দাবীদার এই ছোটলোকরা নয়। এদের স্পর্দ্ধা আর ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এদের আচরণের ফলে গোটা হিন্দুকুলের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

অতঃপর শিব সিংহ পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, মহারাজ কি দ্বারভাঙ্গার বর্তমান খবর রাখেন? এইসব ছোটলোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই স্ফীত করে তুলছে। দ্বারভাঙ্গা ক্রমেই মুসলমান প্রধান স্থানে পরিণত হচ্ছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগটা সামনে থাকায় ব্যাটারা আর তোয়াক্কাই করেনা আমাদের। আমার কাছে এই ব্যাটাদের ক্ষমা নেই।

দেবসিংহ বললেন–আমি সব জানি। কিন্তু এ জন্যে কে দায়ী? ওরা না মুসলমানেরা?

শিবসিংহ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন–দুইই।



www.pathagar.com

দেবাসিংহ তার চেয়েও চড়া কণ্ঠে বললেন–না, ওরা কেউ নয়। এর জন্যে দায়ী আমরা। অধিক দায়ী তোমার মতো কুলিনেরা। নিজের জাতি কোন লোক ছাড়তে চায় সহজে! ছাড়তে যখন তাদের বাধ্য করা হয়, তখনই তারা ত্যাগ করে স্বধর্ম।

শিব সিংহ বললেন–মানে?

দেবসিংহ ধিক্কারের সাথে বললেন, তোমাদের লজ্জা হয়না? ভিন ধর্মের লোকেরা তাদের আচরণ দিয়ে তোমার ধর্মের লোকদের তাদের ধর্মে টেনে নেয়, আর তোমরা তোমাদের আচরণ দিয়ে নিজ ধর্মের লোকদের নিজ ধর্মে রাখতে পারোনা, এরপরও দম্ভের সাথে কথা বলতে আসো?

শিব সিংহের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি চিৎকার করে বললেন–আমি জানতে চাই, আপনার উদ্দেশ্য কি?

বজ্র কঠিন কণ্ঠে দেবসিংহ বললেন–আমি তোমাকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি–এরপর আর একটা মানুষকেও যদি অন্যায় ভাবে নির্যাতন করো তুমি, তাহলে শুধু দ্বারভাঙ্গা থেকেই তোমাকে আমি পদচ্যুতই করবোনা। নির্মমভাবে হত্যা করবো তোমাকে।

ক্রোধে ফুলতে ফুলতে শিবসিংহ বললেন–আপনার যা খুশী তাই আপনি করবেন। কারো রক্তচক্ষুকে কখনও কোন পরোয়াই আমি করিনা।

বলেই রাজার কোন অনুমতির তোয়াক্কা না করে দর্পভরে দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন শিবসিংহ। তা লক্ষ্য করে চরম আদেশ দিতে গিয়েও বাৎসল্যজনিত কারণে দেবসিংহ নিশ্চল হয়ে রইলেন।

এর পরের ঘটনা করুণ! শিবসিংহ তার আচরণতো পরিবর্তন করলেনই না, বরং তলে তলে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশ্যে অসৎ আর বেঈমান সভাসদদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। অনেক প্রলোভন ও লোভ দেখিয়ে গোপনে সৈন্যদের হাত করতে লাগলেন। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে দেবসিংহ যখন সত্যি সত্যিই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন, তখনই তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের যুক্তিতে বাংলা মুলুকে ধর্ণা দিলেন এবং রাজা গণেশের শরনাপন্ন হলেন।

রাজা গণেশের লক্ষ্য এতদঞ্চল থেকে মুসলমানদের উৎখাত করে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, শিবসিংহের লক্ষ্য ত্রিহুতের মসনদ। সঙ্গে সঙ্গে মিল হলো দুজনের। রাজা গণেশ শিবসিংহকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করতে এই শর্তে রাজী হলেন যে, ত্রিহুতের মসনদ অধিকার করতে পারলে শিবসিংহকে ত্রিহুত থেকে মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করতে হবে।

শিবসিংহ আগে থেকেই মুসলমানদের বরদাস্ত করতে পারতেন না। এই শর্ত তিনি এক কথায় মেনে নিলেন। অতঃপর রাজা গণেশের সাহায্যে শিবসিংহ ত্রিহুত রাজ দেবসিংহকে পরাজিত ও বন্দি করে হত্যার আদেশ দিলেন এবং ত্রিহুতের রাজারূপে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এই শিবসিংহ মসনদে বসার পর থেকেই শুরু হয়েছে মুসলমান নিধন অভিযান। এ প্রক্রিয়া এখন চরম পর্যায়ে উঠেছে। দ্বারভাঙ্গাতে অনেক মুসলমান সুফী সাধক ও



www.pathagar.com

ধর্ম প্রচারক বাস করতেন। এঁদের অধিকাংশকেই শিবসিংহ ইতিমধ্যেই হত্যা করেছেন এবং অবশিষ্ট মুসলমানদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে জান প্রাণ সঁপে দিয়ে লেগেছেন।

বক্তা সেপাইটি তার কাহিনী শেষ করে সুফী হযরত নূর কুতুব-ই -আলম সাহেবকে অবশেষে জানালেন যে, শিবসিংহের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে দ্বারভাঙ্গা থেকে পালিয়ে এরা বাংলা মুলুকে এসেছে। এখানে যে আরো বেশী মুসিবত বিদ্যমান, এরা নিশ্চয়ই তা সঠিকভাবে জানেনা।

সেপাইটির কথা শেষ হলে শায়খ আনোয়ার সাহেব আফসোস করে বললেন-এর পরও কি কিছুই করার নেই আমাদের? জালেমের জুলুম চলতেই থাকবে এইভাবে?

সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। নিষ্প্রাণ পাথরের মতো তিনি অসাড় হয়ে বসে রইলেন। দৃষ্টি তাঁর উদাস-লক্ষ্য তাঁর ঝাপ্‌সা।

ইতিমধ্যেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। দ্বারভাঙ্গা থেকে আর একটা ছোট্ট দল ছুটতে ছুটতে এসে সুফী সাহেবের খানকা শরীফে হাজির হলো। তারা এসে দাঁড়াতেই শায়খ আনোয়ার সাহেব ফের আফসোস্ করে বললেন-ওরে কমবকতের দল, হেফাজতির উম্মিদে এ কোন আগুনের মধ্যে ছুটে আসছো তোমরা? দ্বারভাঙ্গার চেয়েও যে এ এলাকা এখন আরো বেশী খতরনাক্, এখবর কি কেউ তোমরা জানোনা?

নবাগতদের একজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো-না হুজুর আমরা এখানে এক লহমাও থাকার জন্যে আসিনি। আমরা ফের এখনই ওয়াপস্ যাবো অন্যদিকে। আমরা এসেছি এক নাখোশ পয়গাম বয়ে নিয়ে। আমরা জানতে পেরেছি দ্বারভাঙ্গার সুফী হজরত মখদুমশাহ সুলতান হোসেন সাহেব পাণ্ডুয়ার পাকদীল সুফী সাবেবের সহপাঠী ও দোস্ত। সেই পবিত্রাত্মা মখদুমশাহ সুলতান হোসেন সাহেবের ওপর চরম আঘাত হানার জন্যে রাজা শিবসিংহ স্বয়ং বেরিয়ে গেছেন ফৌজ নিয়ে। হজরত মখদুম শাহ সুলতান হোসেন সাহেবের সন্ধান যদি ইতিমধ্যেই শিবসিংহ পেয়ে থাকেন, তাহলে এতক্ষণ তাঁর পবিত্র খুনে দ্বারভাঙ্গার মাটি রঞ্জিত হয়ে গেছে। দ্বারভাঙ্গার অবশিষ্ট আলেমগণ এই পয়গাম সহ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, সারা জাহানের অপরাজেয় মুসলমান শক্তি জিন্দা থাকতে হজরত মখদুম শাহ সুলতান হোসেন সাহেবের মতো ইসলামের এমন একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র যদি অকালে ঝরে যায়, তাহলে এটা যেমন একদিকে এ কওমের সকলের জন্যে এক মস্তবড় গুনাহ, অন্যদিকে তেমনি এক নিদারুণ লজ্জার ও দিগদারীর ব্যাপার। সকলের এ কসুর মার্জনার অতীত। কারণ সব জেনে শুনেও যার যতটুকু সাধ্য তা আমরা করছিনা বা যে এর বিহিত করতে পারে, তকলিফ করে তাঁর তালাশে ছুটছিনা।

বক্তা একটু থামলো। তারপর সে ফের বললো-এ অঞ্চলের সুফী শ্রেষ্ঠ পুন্যাত্মা হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের কাছে আমাদের আরজ এ ব্যাপারে যা সমীচিন মনে করেন তা অবশ্যই তিনি করবেন।

বলেই সে তার দল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো এবং যেদিক থেকে এসেছিল , এই কাসেদের দলটি আবার সেই দিকে ছুটে গেল।



www.pathagar.com

সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের চোখ দিয়ে এবার জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড ঠিকরে পড়তে লাগলো। এই মখদুম শাহ সুলতান হোসেন সাহেব শুধু একজন পুণ্যাত্মা লোক বা তাঁর সহপাঠীই ছিলেন না, নূর কুতুব-ই-আলমের পিতা উত্তর ভারতের বিখ্যাত দরবেশ আলাউল হক সাহেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন তিনি।

হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব এবার অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তাজউদ্দীন আর ভুলু খাঁর দিকে তাকাতেই তারা সিনা উচু করে বললো-তামাম অঘটনের মূল এই রাজা গণেশ। এজাযত দিন হজরত, যেটুকু সামর্থ আছে আমাদের, তাই নিয়ে গণেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি আমরা। এইভাবে হাতপা গুটিয়ে বসে থেকে আর এতটা বরদাস্ত করা যায়না।

উপস্থিত সকলেই তাদের তৎক্ষণাৎ সমর্থন দিলেন। কিন্তু পাথরের মতো শক্ত হয়ে হজরত নূর-কুতুব-ই-আলম সাহেব যেমন ভাবে বসেছিলেন তেমনি ভাবেই বসে রইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথাই তিনি বললেন না। পরে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমাদেরকি ধারণা যে, তোমাদের ঐ শক্তি দিয়ে গণেশের সাথে তোমরা নিশ্চিতভাবে এঁটে উঠতে পারবে?

জবাবে তাজউদ্দীন বললো-সত্যের অপলাপ না করলে বলবো, আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানির ফলে অলৌকিক কোন ঘটনা না ঘটলে, এ শক্তি নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে উৎখাত করতে না পারলেও, সে শক্তিকে আমরা পঙ্গু করে দিয়ে শহীদ হতে পারবো।

সুফী সাহেব এবার ক্লীষ্ট হাসি হাসলেন। অত্যন্ত পেরেশান দিলে বললেন-সমস্যার কি সমাধান হলো তাতে? তার শক্তি পঙ্গু হবে, কিন্তু আমাদের শক্তি বিলকুল নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদের ঐ শক্তিটুকু আছে বলেই রাজা গণেশ তার আকাঙ্খা মাফিক খেয়াল খুশীর ফোয়ারা ছোটাতে পারছেনা। তাকে হোঁচট্ খেতে হচ্ছে। তার জুলুমের ঐ বেপরোয়া প্লাবনের মুখে এই বাঁধটুকু না থাকলে গোটা বাংলা মুলুকে এতদিন আর একটা মুসলমানও অবশিষ্ট থাকতো না। তার শক্তিকে পঙ্গু করতে গিয়ে আমাদের সেই বাঁধটাই যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে গণেশের পরবর্তী আক্রোশ সামাল দেবে কে?

এর জবাব আর কারো মুখেই কথা যোগালোনা। ক্ষণিকের জন্যে সকলেই খামোশ হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর সুফী সাহেবের নাতি শায়খ জাহিদ সাহেব সুফী সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন-এবার তাহলে দাদুকেই বলতে হবে, আমরা কি করবো? তাঁকে আর আমরা নীরব দেখতে চাইনে।

সুফী সাহেব নজর তুলে নাতির দিকে তাকালেন। এরপর শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন-আর বলাবলি নয়। এবার যা করার তা আমাকেই করতে হবে।

নীরব প্রাঙ্গণ এবার ফেটে পড়লো নিনাদে। হাজেরান মজলিস এ কথায় অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অনেকের ধারণা হলো-নিশ্চয়ই সুফী সাহেব এবার তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করবেন। আবেগের আধিক্যে একজন বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন-নারায়ে তকবির-



www.pathagar.com

"আল্লাহ আকবর" শব্দে সঙ্গে সঙ্গে খানকা শরীফ প্রকম্পিত হলো। হাত ইশারায় সবাইকে থামিয়ে দিলেন সুফী সাহেব। বললেন–এর অর্থ অন্য কিছু নয়। কওমের অস্তিত্বের খাতিরে কওমের যে কোন সামর্থবান খাদেমের মদদ নেয়া দোষের নয়। আমি সেই মদদ বা সাহায্য আহবান করবো। যে কেউ একজন তৈয়ার হও। এক্ষুনি আমি খত লিখে আনছি। এই খত নিয়ে তোমাদের কাউকে এক্ষুণি রওনা হতে হবে।

হাজেরান মজলিসের একজন প্রশ্ন করলেন কোথায়? কার কাছে?

সুফী সাহেব বললেন–সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে। তিনি আমাকে চেনেন। এ ছাড়া সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী সাহেবও জৌনপুরে আছেন। তাঁকেও আমি লিখবো। আমার খত পেলে তিনিও সুপারিশ করবেন সুলতানকে। আমাদের দাওয়াত সুলতান ইব্রাহিম কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না।

তাজউদ্দীন প্রশ্ন করলো–ইব্রাহিম শর্কী?

সুফী সাহেব বললেন–হ্যাঁ, ইব্রাহিম শর্কী। এতদঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শক্তি। যার রাজ্য সীমানা জৌনপুরের বাইরেও সুদীর্ঘ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা মুলুকের মুসলমানদের এই মুসিবতের দিনে সেই শক্তিমান সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে তার করণীয় করার জন্যে দাওয়াত পাঠাবো আমি। দাওয়াত নিয়ে কে তোমরা যেতে চাও তৈয়ার হও।

সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। পরিস্থিতির মোকাবেলায় যে সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট তাই তিনি গ্রহণ করবেন–এ সম্বন্ধে সন্দেহের তিল পরিমাণ অবকাশ কারো দিলে ছিলনা। ফলে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে যাওয়া নিয়ে জনতার মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হলো। কওমের খেদমতে কিঞ্চিৎ তকলিফ করতে পারাটাকেও সকলেই খোশ-নসীব আর সওয়াবের কাজ বলে গণ্য করতে লাগলো।

কিন্তু ইব্রাহিম শর্কী সমীপে দাওয়াতটা তড়িৎ গতিতে পৌছানো প্রয়োজন। সে সাধ্য জনতার সবার ছিলনা। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সবার আগ্রহ নাকচ করে সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব জনতার ভিড় সরিয়ে দিলেন। এর পর সীমিত পরিমন্ডলে বসে স্থির করলেন–এই দূতগিরি করার কাজে দ্রুতগতি সম্পন্ন একজন রণবিদকে প্রেরণ করাই বেহ্তর। কাজেই ইব্রাহিম শর্কীর কাছে খত নিয়ে রওনা হবে তৌহিদ বেগ আর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর কাছে খত নিয়ে ছুটবে তৌহিদ বেগের বাহিনীরই একজন দ্রুতগামী সওয়ার।

তৌহিদ বেগ নামের এক বাহাদুর যোদ্ধা তাঁদের দলে আছে এখবর গোপনভাবে সুফী দরবেশ আর উলামায়ে কেরামগণ সকলেই জানতেন। এটা তাঁরা সযতনে গোপন করেও রেখেছেন। কিন্তু আঙ্গুলে গোণা কয়েকজন ব্যক্তিছাড়া এই তৌহিদ বেগের আসল চেহারা আজ পর্যন্ত কেউ তাঁরা দেখেননি। আজ তাঁদের কেউ কেউ সেটা দেখার আগ্রহী হলে সুফী সাহেব তাঁদের থামিয়ে দিয়ে বললেন–সংগত কারণেই সেটা গোপন রাখা হয়েছে এবং এখনও সেটা গোপনই থাকবে।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি তাজউদ্দীনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর নিঃক্ষেপ করে বললেন–তাজউদ্দীন, তৌহিদ বেগকে অতি সত্বর এখানে আমি তৈয়ার দেখতে চাই–

"জি আচ্ছা হজুর" বলেই তাজউদ্দীন উঠে দ্রুত পদে চলে গেল।

এরপর সুফী সাহেবও উঠে তাঁর খাস কামরায় চলে গেলেন এবং সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ও সিমনানীকে খত লিখতে বসলেন। তিনি ইব্রাহিম শর্কীকে লিখলেনঃ

পাক জনাবেষু,

বাদ তসলীম জানাই, বাংলা মুলুকের বর্তমান শাসনকর্তা গণেশ নামক একজন বিধর্মী। তিনি অত্যাচার করিতেছেন এবং রক্তপাত করিতেছেন। তিনি অনেক জ্ঞানী এবং পূণ্যাত্মাকে হত্যা এবং ধ্বংস করিয়াছেন। এখন তিনি অবশিষ্ট মুসলমানকে হত্যা করার এবং ইসলামকে এই দেশ হইতে ধ্বংস করার মনস্থ করিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানদিগকে সাহায্য করা এবং রক্ষা করা মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের অবশ্য কর্তব্য, সেহেতু আমি এই কয়েকছত্র লিখিয়া আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছি। এই দেশের বাসিন্দাদের খাতিরে এবং আমাকে বাধিত করার জন্যে আমি এখানে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে মুসলমানেরা এই অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার হইতে নিস্কৃতি পায়।

আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

–নূরকুতুব–ই–আলম।

অপর একটি পত্র সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমানীকে লিখে খত দুখানা হাতে করে সুফী সাহেব পুনরায় বাইরে এলেন এবং এন্তেজার করতে লাগলেন। একটু পরেই সফেদ শিরস্ত্রাণ ও সফেদ লেবাস পরিহিত মুখোশ আঁটা তৌহিদ বেগ অশ্ব ছুটিয়ে এসে খানকা শরীফে হাজির হলো। অশ্ব নিয়ে তার পেছনে পেছেনে ছুটে এলো এক সওয়ার। সুফী সাহেবের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ শুনার পর তাঁর হাত থেকে খত নিয়ে দুইজনই ফের অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে দিলো এবং পান্ডুয়া থেকে উত্তর পশ্চিম দিক বরাবর ছুটতে লাগলো।

উৎসব শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় উৎসব। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী নিজ আসনে বসে তন্ময় হয়ে আনন্দ উৎসব দেখছেন। হরেক রকম বাজী ও রং তামাসা চলছে। বাংলা মুলুকের সাপুড়েরা ইব্রাহিম শর্কীর উৎসবে এসে সাপ খেলা দেখাচ্ছে। বানরের খেলা দেখাচ্ছে পূর্নিয়ার যাযাবররা। আসামের বন থেকে হরেক রকম পাখী এনেছে পূর্বদেশের বেদেরা। প্রদর্শনীর সাথে তারা নানা রকম পাখীর খেলা দেখাচ্ছে। ময়দানের এক কোণে জোরদার লড়াই চলছে মোরগের। নানাদেশের সওয়ারীরা ঘোড়সওয়ারে নেমে গেছে খোলা মাঠের আর এক পাশে। মুষ্কগিরি বা মুংগেরের বাদ্যকররা সমানে সুর ভাঁজছে শানাইয়ের। নানা রকমের বোল্ তুলে কাড়া নাকাড়া



www.pathagar.com

পিট্‌ছে বিহারী বাউলেরা। জৌনপুরের শায়েরেরা কাওয়ালীর আসর বসিয়ে মত্তকণ্ঠে বাহবা-বাহবা বলতে গিয়ে ওয়া-ওয়া করছে। পুঁথি পাঠের আসর বসেছে কাওয়ালদের পাশেই। একতারা বাজিয়ে বাঙ্গালী বাউলেরা সমানে পাল্লা দিচ্ছে বিহারী বাউলদের কাড়া নাকাড়ার সাথে। পাহাড়ী মেয়েরা এসে দল বেঁধে শুরু করেছে নৃত্যগীত। শরকীগলির লাঠিয়ালরা তেলিয়াগড়ের দলের সাথে লাঠির চাল চালছে। রংবেরং এর লেবাস পরে নানা ঢং এ নেচে বেড়াচ্ছে দেশীবিদেশী সংয়েরা।

শাহী প্রাসাদের বাহির দিকের উন্মুক্ত ময়দানটা হাজার রকম ক্রীড়া কসরত ও লক্ষজন দর্শকের সরব পদচারণায় সরগরম। মহা পরাক্রম ইব্রাহিম শর্কীর মনো- রঞ্জনের ইরাদায় পাশ্ববর্তী তামাম এলাকার লোকজন ও শাসক গোষ্ঠী স্বতফূর্তভাবে তাঁর এই উৎসবের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন।

গণ অভিযোগ শ্রবণ করার নিমিত্তে শাহীপ্রাসাদের এইদিকে দ্বিতল কক্ষের এক প্রশস্ত বারান্দায় গণদরবার নির্মাণ করা হয়েছে। সুলতান এসে বসেন এই সুউচ্চ বারান্দায়। জনগণ এসে দাঁড়ায় নীচের এই উন্মুক্ত ময়দানে। ঐ গণদরবারে বসে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ময়দানের এই অনুষ্ঠানমালা দেখছেন। তাঁর পাশেই একটি রৌপ্য নির্মিত আসন এনে সফেদ বস্ত্রখন্ডে ঢেকে রাখা হয়েছে। কোন রাজা বাদশাহ্ বা আমীর উমরাহের জন্যে নয়। এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত জ্ঞানবৃদ্ধ কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী সাহেবের জন্যে রাখা হয়েছে এ আসন। এই উৎসব উপভোগ করার জন্যে ইব্রাহিম শর্কী তাঁকে দাওয়াত করে পাঠিয়েছেন। মামুলী দাওয়াত নয়। রীতিমতো নিবেদন পেশ করেছেন। সময় করে অন্তত দন্ড কয়েকের জন্যেও এই অনুষ্ঠানে তিনি তসরীফ আনলে বাধিত হবেন ইব্রাহিম শর্কী।

কাজী শাহাবুদ্দীন জৌনপুরী সাহেব সুলতানের এই আহবান উপেক্ষা করলেন না। উৎসব শুরু হওয়ার অনেকখানি পরে হলেও তিনি তশরীফ আনলেন উৎসবে এবং হাজির হলেন দ্বিতল কক্ষের ঐ দরবারে।

কাজী সাহেব দরবারে এসে দাঁড়াতেই তাজিমের সাথে উঠে দাঁড়ালেন ইব্রাহিম শর্কী এবং রৌপ্যনির্মিত ঐ আসনে উপবেসন করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। কাজী সাহেব আসন গ্রহণ করলে তিনিও ফের আসন গ্রহণ করলেন। হিন্দুরাজাদের রাজগুরুর মতোই কতকটা ব্যাপার। কাজী শাহাবুদ্দীন সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর আধ্যাত্মিক গুরু। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী সুফীদরবেশ ও আধ্যাত্মিক সাধকদের অত্যন্ত সম্মান করেন। জৌনপুরের সুফী সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীও ইব্রাহিম শর্কীর অন্যতম পীর। যে কোন জটিল ব্যাপারে এইসব পীর দরবেশের উপদেশ ছাড়া তিনি এক পাও নড়েন না।

পাত্রমিত্রের সাথে কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরীকে নিয়ে ইব্রাহিম শর্কী পুনরায় উৎসব দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নির্বিবাদে কেটে গেল। এরপর এক বান্দা এসে কুর্নিশ করে



www.pathagar.com

বললো–হুজুর, পাণ্ডুয়া থেকে এক দূত এসে বাইরে অপেক্ষা করছেন। তিনি হুজুরের সাথে মোলাকাত করতে চান।

জনৈক সভাসদ সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে ধমক দিলেন বান্দাকে। বললেন–বেয়াকুফ, রাষ্ট্রীয় উৎসবের দিন আজ। জনাব আজ উৎসব দেখায় ব্যস্ত–জানোনা তা? দরবারে যখন বসবেন, তখন এসব পয়গাম পরিবেশন করবে। এখানে হুজুরকে বিরক্ত করতে এসেছো কেন?

থতমত খেয়ে বান্দাটি ফের বললো–না মানে, বহুৎ দূর থেকে একজন মেহমান এসেছেন বলে–

সভাসদটি বললেন–মেহমানকে মেহমান খানায় পাঠিয়ে দাও। আগামীকাল তাকে দরবারে হাজির হতে বলো।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী এই সময় কাজী শাহাবউদ্দীন সাহেবের সাথে কি একটা আলোচনায় রত ছিলেন। বান্দাটির আগমন তাঁর দৃষ্টি গোচর হলেও, বান্দার বক্তব্যে তিনি কান দিতে পারেননি। ধমক খেয়ে বান্দাটি প্রস্থানোদ্যোগ করতেই ইব্রাহিম শর্কী নজর দিলেন তার দিকে। বললেন–কি যেন বললে তুমি? কোথা থেকে দূত এসেছে?

ঘুরে দাঁড়ালো বান্দা। কুর্নিশ করে বললো–বাংলা মুলুকের পাণ্ডুয়া থেকে হুজুর।

পাণ্ডুয়ার কথায় উব্রাহিম শর্কী সচকিত হয়ে উঠলেন। বললেন–পাণ্ডুয়া থেকে! পাণ্ডুয়া থেকে কে পাঠিয়েছেন দূত?

বান্দা বললো–ওখানকার এক দরবেশ। নাম নূর কুতুব–ই–আলম।

সেকি!!

একসাথে চমকে উঠলেন সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ও কাজী শাহাবউদ্দীন সাহেব। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে কাজী শাহাবউদ্দীন সাহেব বান্দাকে ফের প্রশ্ন করলেন–হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেব?

বান্দা বললো–জি, হাঁ।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বললেন–কোথায় সে দূত?

বান্দা বললো–বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেকি! শিগগির তাকে সসম্মানে নিয়ে এসো এখানে।

বান্দাটি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তা লক্ষ্য করে পূর্বোক্ত সভাসদটি উঠে দাঁড়িয়ে বললো–গোস্তাখী মাফ হয় হুজুর। এখানে ঐ দূতকে না ডাকলেও চলতো বোধ হয়। এত সুন্দর অনুষ্ঠানটি উপভোগ করায় হুজুরের ব্যাঘাত ঘটছে দেখে আমার বড় তকলীফ হচ্ছে।

সভাসদটির বক্তব্য অনুধাবন করতে না পেরে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বললেন– মানে?

মানে, কোন রাজা বাদশাহর দূত হলে তবু কথা ছিল। একজন ফকির দরবেশের দূত এসে হুজুরের চিত্তবিনোদনে এইভাবে ব্যাঘাত ঘটাবে–



www.pathagar.com

গর্জে উঠলেন ইব্রাহিম শর্কী। বললেন–খামোশ বেয়াদপ। কোন রাজাবাদশাহর দূত হলে থোড়াই তাকে পরোয়া করতাম আমি। কিন্তু এ দূত কার দূত তা জানো?

থর থর করে কাঁপতে লাগলেন সভাসদটি। ইব্রাহিম শর্কী বলেই চললেন–এতদঞ্চলের সব বাদশাহর বড় বাদশাহ আল্লাহর পথের রাহাগীর হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেবের দূত! তাঁর মতো পবিত্রাত্মা দূত পাঠিয়েছেন আমার মতো হীন একজন ইহ দুনিয়ার তেজারতদারের কাছে। আমার এই এতবড় খোশ–কিস্‌মতিকে তুমি তুচ্ছ ঐ অনুষ্ঠানের আনন্দের সাথে তুলনা করতে চাও? ঐ মহান ব্যক্তির দূতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হলে ঘোরতর অমঙ্গল ঘটতে পারে। এ হুঁশ তোমার আছে?

সুলতানের মুখের কথা শেষ হতেই বান্দার সাথে দরবারে এসে হাজির হলো তৌহিদ বেগ। মুখের মুখোশ সে বাংলা মুলুক পেরিয়ে এসেই খুলে ফেলে দিয়েছিল। নূরানী চেহারার এই নওজোয়ান দূতকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করলেন ইব্রাহিম শর্কী। পাশেরই এক আসনে দূতকে বসতে দিয়ে তিনি বিনয়ী কণ্ঠে বললেন–বহুৎ দূর থেকে তকলীফ করে আপনি আমার এখানে এসেছেন। আপনার বিশ্রামের আনযাম করার আগে কোন কাজের কথা না তোলাই উচিত আমার। কিন্তু আপনার আগমনের কারণটা যতক্ষণ না জানতে পারবো, ততক্ষণ আমি একটা মানসিক পেরেশানীতে থাকবো বলেই আপনাকে আপনার আগমনের কারণটা ব্যক্ত করার অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

ইব্রাহিম শর্কীর আচরণে তৌহিদ বেগ মুগ্ধ হলো। সে উঠে এসে তাজিমের সাথে সুফী সাহেবের খতখানা ইব্রাহিম শর্কীর সম্মুখে বাড়িয়ে ধরে বললো–পান্ডুয়ার সুফী হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেব এই খত আপনাকে লিখেছেন। আমার আগমনের উদ্দেশ্যটা এতেই বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে।

ইব্রাহিম শর্কী অত্যন্ত ভক্তিভরে পত্রখানা গ্রহণ করলেন এবং খুললেন। অতঃপর পত্রপাঠে মনোনিবেশ করলেন। তিনি একিন দিলে পত্রখানা একাধিক বার পাঠ করলেন। পাঠ করা শেষ হলে পত্রখানা তিনি কাজী শাহাবউদ্দীন সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

কাজী সাহেবও পত্রখানা সসম্মানে গ্রহণ করলেন ও পাঠ করলেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে ইব্রাহিম শর্কী জিজ্ঞাসুনেত্রে কাজী সাহেবের মুখের দিকে চাইলেন এবং বললেন–হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেবের আহবানের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা নেই আমার। কিন্তু প্রশ্নটা বড় কঠিন এবং কাজটাও বেশ শক্ত। নতুন কোন অভিযানের আদৌ কোন মানসিক প্রস্তুতি আমার এই মুহূর্তে নেই। গণেশকে পর্যুদস্ত করা মোটেই কোন কঠিন কাজ নয় আমার কাছে। কিন্তু এত দূরত্বের এই অভিযানের ঝক্কিটা আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থারও প্রতিকূল। অথচ আমাকে ডাক দিয়েছেন এক পরম পবিত্র ব্যক্তি। বড় মুসিবতে আছেন তাঁরা। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত, আপনি বলুন।

এর জবাবে কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী সাহেব নির্দ্বিধায় এবং জোর দিয়ে বললেন–আপনার তাড়াতাড়ি যাত্রা করা উচিত। কারণ এই অভিযানে জাগতিক ও পারলৌকিক মস্তবড় সুফল পাওয়া যাবে। এতে বঙ্গদেশ জয় করাও হবে এবং জাগতিক ও পারলৌকিক শুভের



www.pathagar.com

উৎস হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের সাথে আপনার সাক্ষাতও হবে। এ ছাড়া মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে আপনি পবিত্র কাজ সম্পাদন করবেন

কাজী সাহেবের উপদেশ শ্রবণান্তে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী মুহূর্ত খানেক চিন্তা করলেন। তারপর তিনি তৌহিদ বেগকে লক্ষ্য করে বললেন-আপনার আগমনের কারণ আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম। আপনারা এবং আমাদের মুসলমান কওমের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে ওখানে চরম দুর্যোগের মধ্যে অবস্থান করছেন তাও আমার কাছে আর অস্পষ্ট নয়। তবে আমার শক্তি খুবই সীমিত। একমাত্র পরম করুনাময় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ছাড়া এর প্রতিকার করার কিছুমাত্র সাধ্য আমার নেই। আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। এই মুহূর্তেই চরম কোন ওয়াদা আমি করবোনা। আপনি চলুন, আমার মেহমান খানায় আপাতত বিশ্রাম করবেন। আগামী কাল ইনশাআল্লাহ আমার পদক্ষেপের কথা আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানাবো। তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, এ ব্যাপারে আমার কোন নীরব ভূমিকা হবেনা।

কাজী সাহেবের এজাযত নিয়ে তৌহিদ বেগ সহকারে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বেরিয়ে গেলেন। তৌহিদ বেগকে মেহমান খানায় পাঠিয়ে তখনই তিনি একখানা চিঠি লিখতে বসলেন এবং চিঠি লেখা শেষ করে তখনই একটি দ্রুতগামী অশ্ব দিয়ে একজন দূতকে চিঠিসহ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী সাহেবের নিকট প্রেরণ করলেন। পত্রে সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর মতামত চাইলেন তিনি।

পরের দিনই ইব্রাহিম শর্কীর পত্রের জবাব এলো সিমনানী সাহেবের নিকট থেকে। সিমনানী সাহেব বাংলা মুলুকের মুসলমানদের দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে কাজী সাহেবের মতোই জোরদার ভাবে মত প্রকাশ করেছেন। সুলতানকে তিনি অবিলম্বে বাংলায় অভিযান চালনা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সুলতানের সাফল্য কামনা করেছেন। সেই সাথে তিনি অরো বলেছেন "ধার্মিক রাষ্ট্র নায়কদের পক্ষে ইসলাম ধর্মের রক্ষার জন্যে সৈন্য বাহিনী চালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই। বাংলাদেশে বড় শহরের তো কথাই নেই, এমন ছোট শহর বা গ্রামও মিলবে না, যেখানে দরবেশেরা এসে বসবাস করেননি। অনেক দরবেশ পরলোক গমন করেছেন, কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প হবে না। তাদের সন্তান সন্ততিকে, বিশেষত হজরত নূর কুতুব-ই-আলমের ছেলেকে এবং পরিবারকে যদি দুরাত্মা বিধর্মীদের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়, তাহলে খুবই ভাল কাজ হবে।"

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরীর কথাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সিমনানী সাহেবের পত্র পাঠে আরো তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তখনই তিনি তৌহিদ বেগকে কাছে ডেকে বললেন-আমি তৈয়ার। আপনি গিয়ে পান্ডুয়ার সেই মহান সুফী সাহেবকে আমার সালাম জানিয়ে বলুন, বাংলা মুলুকের দিকে নিজেই আমি সসৈন্যে রওনা হচ্ছি।

ইব্রাহিম শর্কীর সৈন্য সাহায্য পেলেই তৌহিদ বেগ বর্তে যেতো। তার যা অভাব তা সৈন্যের। কোন নিয়মিত ও পরিমিত সৈন্যবল না থাকায় তৌহিদ বেগকে নিরুপায় হয়েই রাজা



www.pathagar.com

গণেশের এই জুলুম সহ্য করতে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সৈন্যবল হাতে থাকলে, বাইরে এসে শক্তি ভিক্ষার প্রয়োজনই কিছু হতোনা। পান্ডুয়ার সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর পক্ষে লড়াইয়ের সময় স্বার্থের লোভে শাহী সৈন্যেরা ফিরোজ শাহকে ত্যাগ করে গণেশের দলে যোগ না দিলে, তৌহিদ বেগ আর বাহালুল খাঁ–ই যথেষ্ট ছিল রাজা গণেশের ঐ মসনদের দুর্নিবার মোহটা ছুটিয়ে দিতে এবং সেই সাথে তাকেও এ দুনিয়া থেকে ছুটি দিতে। সেপাইদের ঐ বেঈমানীর জন্যেই না তাদের হাত গুটিয়ে ফিরে আসতে হলো মুয়াজ্জমাবাদের প্রান্তর থেকে।

তাই ইব্রাহিম শর্কী সৈন্য সাহায্যে রাজী হলেই তা যথেষ্ট ছিল তৌহিদ বেগের কাছে। সেখানে সুলতানের স্বয়ং এই অভিযানে শরীক হওয়া তার কাছে অতিরিক্ত পাওনা। সুলতানের এই আশ্বাসে তৌহিদ বেগ অত্যন্ত প্রীত হলো। সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের সিদ্ধান্তকে খোশ–আমদেদ জানিয়ে সে বললো আল হামদুলিল্লাহ। আপনি আসুন। বাংলা মুলুকে সুফী দরবেশদের পক্ষেও ক্ষুদ্র একটা শক্তি আছে। সে শক্তি আমিই পরিচালনা করে থাকি। আমাদের সেই শক্তি নিয়ে আমরাও আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বো এবং আমি ফিরে গিয়ে আপনার এন্তেজারে থাকবো। আল্লাহ পাক আপনার মঙ্গল বিধান করুন।

ঐদিনই তৌহিদ বেগ বাংলার দিকে ছুটলো এবং ইব্রাহিম শর্কীর আগমন বার্তা বাংলা মুলুকে ফিরে এসে একটা সীমিত পরিমন্ডলে পরিবেশন করলো।

## ৯

বাঁশবাড়ির বিশ্বাস বাড়িতে শোকের ছায়া নেমেছে। কারণ খুন হয়েছে তাজউদ্দীন। অন্তত এইটেই সবার ধারণা। কদিন আগে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাকুড়তলার দিকে যায়। এরপর আর ফেরেনি। খোঁজ করেও আর তার হদিস পাওয়া যায়নি। চারদিকে অহরহ খুন হচ্ছে মানুষ। ইসলামী লেবাসের মানুষের পথে ঘাটে আর কোথাও কোন নিরাপত্তা নেই। বাউড়ে ধাতের এই কান্ডজ্ঞানহীন লোকটা এবার মারাই পড়েছে নিশ্চয়ই। 'অন্তত অনেকেরই তাই ধারণা। তটিনী বিশ্বাস কালাচাঁদকে তালাশ করতে পাঠিয়েছিল। কালাচাঁদ পাকুড়তলায় গিয়ে যা শুনে এসেছে, তাতে তাজউদ্দীন আর বেঁচে নেই। পাকুড়তলার দোকানদারেরা বিশেষ করে বিষ্ণুপাল আর রজব আলী এরাই দুই জনই দেখেছে একদল মুসল্লীর সাথে গল্প করতে করতে তাজউদ্দীন পান্ডুয়ার দিকে চলে যায়। পথে মুসল্লীদের সবাই রাজা গণেশের ফৌজের হাতে খুন হয়েছে। যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তাদের আত্মীয় স্বজন এসে পথ থেকে তাদের লাশ নিয়ে গেছে। যাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি, দুর্গন্ধের ভয়ে আশপাশের লোকেরা সে সব লাশ টেনে হেঁচড়ে



www.pathagar.com

নিয়ে গিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। তাজউদ্দীনের লাশও এর মধ্যেই ছিল বলে অনেকের ধারণা। ঘটনা স্থলে লোক পাঠানো হয়। মুহসীন বিশ্বাস নিজেও ঘটনাস্থলে যান। তাজউদ্দীনের চেহারা বর্ণনা করা হলে, ঘটনা স্থলের লোকজনেরা বলেন ঠিক ঐরকম চেহারার এক নওজোয়ানের লাশও ঐ লাশ গুলোর মধ্যে ছিল। অতএব এ ব্যাপারে কারো দিলে সন্দেহের তিল পরিমাণ আর অবকাশ নেই। খুনই হয়েছে তাজউদ্দীন।

মরিয়ম বিশ্বাস একটানা বিলাপ করে এক্ষণে থেমে গেছেন। মুহসীন বিশ্বাস আফসোস্ আর হা-হুতাশ করে দুঃখের ভার লাঘব করেছেন। বিপদ হয়েছে তটিনীর। সে গুমরে গুমরে মরছে। তুষের আগুনের মতো দগ্ধ হচ্ছে অলক্ষ্যে। তাজউদ্দীন তাঁর কেউ নয়। না কোন নিকট আত্মীয়, না ভাই, না স্বামী। তার জন্যে তটিনীর আফসোসে ভেঙ্গে পড়ার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই সে না পারছে চীৎকার করে কাঁদতে, না পারছে কারো কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বুকের ভার হালকা করতে। বাধ্য হয়ে শয্যা নিয়েছে তটিনী। এ নিয়ে যে যা-ই ভাবুক, তটিনীর বক্তব্য হঠাৎ করে বুকের মধ্যে খিল বেধে আসায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, সে একা থাকতে চায়।

তটিনীর চোখের সামনে এ দুনিয়ার তামাম আলো আচানক ভাবে নিভে গেল। তার ব্যর্থ জীবন নতুন করে আর একবার ব্যর্থ হয়ে গেল। তার জিন্দেগীর অবলুপ্ত তামাম আশা-আকাঙ্খা তাজউদ্দীনকে কেন্দ্র করে সে ফিরে পায় আবার। তাজউদ্দীনকে নিয়ে ইদানিং কতই না মধুর খোয়াব সারারাত সে দেখে। সারা বেলা বসে বসে কতই না রঙিন ছবি আঁকে। তাজউদ্দীন তার এ জিন্দেগীর এক দুস্প্রাপ্য সওদা। যাকে নিয়ে গর্ব করা যায়, যার ওপর নির্ভর করা যায় এবং যার অন্তরের মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে অমৃতলোকের অফুরন্ত তৃপ্তির কিঞ্চিৎ আস্বাদন উপভোগ করা যায়-এমনই মানুষ তাজউদ্দীন এবং একান্তই তার মানুষ তাজউদ্দীন। সেই তাজউদ্দীন আর নেই-এ সংবাদ তার বুকে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার চেয়েও এক কঠিন আঘাত হেনেছে।

তাজউদ্দীন সম্বন্ধে তার দিলে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবশিষ্ট ছিল, এই দুর্ঘটনার ক'দিন আগে তাজউদ্দীন নিজেই তা ধূয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেছে। সে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে গেছে তাজউদ্দীন তার স্বপ্নেই বিভোর। তার প্রীতি হারিয়ে সে ফতুর হতে নারাজ। অতএব তাজউদ্দীন তারই এবং একমাত্র তারই। তাজউদ্দীন বীর, তাজউদ্দীন সুন্দর, তাজউদ্দীন নিরহংকার, তাজউদ্দীন শিশুর মতো সরল সৎ নির্মল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই তার সেই অপরূপ তাজউদ্দীন আজ আর নেই। ইহ জনমে আর তার সাক্ষাত পাওয়া যাবেনা। এ ব্যথা তটিনী সহ্য করে কি করে। কাজেই সে অসুস্থ। শুধু অসুস্থই নয়, তার এখন মরণাপন্ন অবস্থা। মরণই সে সাগ্রহে কামনা করে এখন।

এমনই এক পরিস্থিতির মুখে বাহির আঙ্গিনায় এসে হঠাৎ করে খাড়া হলো তাজউদ্দীন। মুখশ্রী প্রফুল্ল। দিলে তার আশা-আকাঙ্খার প্রমত্ত দীপ্তি।



www.pathagar.com

কালাচাঁদই সবার আগে দেখতে পেলো তাজউদ্দীনকে। প্রথমে সে ভূত বলে চীৎকার দিতেই যাচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোক হওয়ায় বিভ্রান্তি তার দীর্ঘস্থায়ী হলোনা। তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল অন্দরে। চীৎকার করে বললো–তাজউদ্দীন মরেনি। সে বেঁচে আছে। সে এসে গেছে।

কালাচাঁদের এ আওয়াজে চমকে উঠলো তাজউদ্দীন নিজেই। বলে কি। চমকে উঠলো তটিনীও। ঠিক চমকে ওঠা নয়। নিশির ডাকের মতো কালাচাঁদের এ আওয়াজ তটিনীর কানে একটা অবিশ্বাস্য আওয়াজের মতো বাজলো। আচমকা এক ধাক্কায় হতবুদ্ধি হয়ে কান দুটি খাড়া করে সে একইভাবে পড়ে রইলো বিছানায়। আদৌ একটা বিশ্বাসযোগ্য কোন কিছু নয় বলে সে বিছানা থেকে উঠলোনা। কি শুনতে কি যেন শুনে ফেলেছে সে। কিন্তু পরে যখন বাহির আঙ্গিনায় অনেক মানুষের হৈ চৈ শুরু হলো, এবং সেই হৈ চৈ এর মাধ্যমে তাজউদ্দীনের উপস্থিতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তটিনী তখন লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়িমরি ছুটে এলো বাইরে। কেশ তার উন্মুক্ত, বেশ তার আলুথালু, চক্ষুদ্বয় কোটরাগত, শাড়ীর আঁচল গোটাটাই লুটিয়ে আছে ধূলায়।

বাহির আঙ্গিনার এক কোণে এসে তাজউদ্দীনের ওপর নজর পড়তেই অসম্ভব একটা কিছু দেখার মতো সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ওখানেই। দৃষ্টি তার তাজউদ্দীনের ওপর নিবদ্ধ। গতি তার স্থির। তার নিষ্পলক নয়ন যুগল বেয়ে তখন অঝরে নেমে এসেছে শ্রাবণের ধারা।

সকলের অলক্ষ্যে তাজউদ্দীন বার বার তটিনীর এ অবস্থা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। সে বুঝতে পারলো, তাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এখানে এক মস্তবড় অঘটন ঘটে গেছে।

তাজউদ্দীন যা করতে পারতো তা হলো–যাবার আগে সবাইকে জানান দিয়ে যাওয়া। কোথায় সে যাচ্ছে, কি কাজে যাচ্ছে, কোথায় সে থাকছে, সব কথা বলে কয়ে যাওয়া। কিন্তু তাজউদ্দীন তা পারেনা। শুধু আচরণগত কারণেই নয়, সে পরিস্থিতি সে এখানে এখনও গড়ে তুলতে পারেনি। আর তা সে পারেনি বলেই এই অঘটন।

তাজউদ্দীনকে দেখেই মুহসীন বিশ্বাস রীতিমতো গোস্বা হলেন। মরিয়ম বিশ্বাস ক্ষোভে দুঃখে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তটিনীর অবস্থাতো অবর্ণনীয়।

বাড়ি ফিরেই তাজউদ্দীন এক অসহায় অবস্থার মধ্যে নিপতিত হলো। নানা জনের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে, সকলের সব অভিমান খন্ডন করতে, বিপুল বেগ আর অনেক সময় লাগলো তাজউদ্দীনের। সেই সাথে সে বিশেষভাবে উপলব্ধি করলো যে, এভাবে আর চলতে পারেনা এখানে। পরিস্থিতির মধ্যে একটা পরিবর্তন প্রয়োজন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর তাজউদ্দীন তার ঘরে মুহসীন বিশ্বাস, মরিয়ম বিশ্বাস ও তটিনী বিশ্বাসকে গোপনে ডেকে আনলো এবং দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসলো। এরপর সে ভূমিকা করে বললো–অনেক দিন থেকে একটা কথা আপনাদের বলবো বলবো করে আজও বলা হয়নি বলে আমি বহুৎ শরমিন্দা আছি। আর সেই সাথে আজ কি করে সেই কথাটা তুলি তা সোচ্ করে পেরেশান বোধ করছি।

মুহসীন বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন–কি কথা?



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন বললো–সে কথাটা এমনি একটা কথা যে, যা বললে আপনাদের স্নেহ বিশ্বাস হয় তো পুরোটাই হারিয়ে ফেলবো আমি। এ ছাড়া কথাটা এতই গোপনীয় যে, যা ফাঁশ হলে আমার ও সেই সাথে আপনাদেরও জান–মাল ভয়ানক ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর সে কারণেই এতদিন বলতে পারিনি কথাটা

সকলেই তাজ্জব হয়ে এক ধেয়ানে তাজউদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মুহসীন বিশ্বাস বললেন–তা, কি সে কথাটা? যদি একান্তই অসুবিধা না থাকে তাহলে–

আমার পরিচয়টা পুরোপুরি বলা হয়নি আপনাদের।

মানে!

আমি আত্মীয় বান্ধবহীন একজন হতভাগ্য মানুষ ঠিকই, কিন্তু একেবারে ভবঘুরে নই। আমি একজন সৈনিক। এ মুলুকে এখন যে কয়জন ভাগ্যাহত সৈনিক গোপনে কওমের খেদমত করে যাচ্ছে, আমি তাদেরই একজন।

তাজউদ্দীন লক্ষ্য করলো, এ কথায় কারো চোখেমুখে ভীতি বা ঘৃণার উদ্রেক হলোনা, বরং আনন্দের রশ্মিতে সকলের মুখমন্ডল রোশনাই হয়ে গেছে। অতঃপর সে বললো–সঠিক পরিচয় গোপন করে আমি আপনাদের এখানে আছি এবং আমার কওমের স্বার্থে রাজা গণেশের ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এই কারণেই মাঝে মাঝেই উধাও হতে হয় আমাকে এবং উধাও হওয়ার সময় কারণও বলে যেতে পারিনা।

তাজউদ্দীনের কথায় মুহসীন বিশ্বাস যারপরনাই খুশী হলেন। চরম উৎসাহের সাথে খোশদিলে বললেন–সেকি! তুমি সৈনিক? তুমি লড়াই করছো মুসলমানদের পক্ষে?

জি হাঁ। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু সম্ভব তা আমি করছি। এবারও গিয়ে আমি আমার কওমের খেদমতে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ি বলেই ফিরে আসতে দেরী হলো এ কয়দিন।

তটিনীর বুকে তখন অফুরন্ত খুশীর ঝড় বইছে। তাজউদ্দীন এমনই একটা কিছু, ইদানিং এ ধারণা দিলে তার জোরদার হয়ে উঠেছিল। সে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করলো তাহলে রাজার ফৌজ যেদিন আমাদের গাঁয়ে এসে মুসল্লীদের ওপর হামলা চালায়, আপনিই সেদিন–

ঃ হ্যাঁ, আমিই গিয়ে লড়েছিলাম রাজার ফৌজের বিরুদ্ধে।

মুহসীন বিশ্বাস ও মরিয়ম বিশ্বাস তাজ্জব কন্ঠে একসাথে বললেন–সেকি!

গর্বে তটিনীর বুকখানা স্ফীত হয়ে উঠলো। আনন্দঘন কন্ঠে সে পুনরায় বললো–তাইতো সেদিন অনেকেই বলছিলেন, লোকটা অনেকটা আপনার মতোই দেখতে।

তারা ঠিকই বলেছিল।

কিন্তু আপনি সেদিন কিছুতেই প্রকাশ করেননি ঘটনাটা।

সেদিন কেন, আজও আমি এটা প্রকাশ করতামনা, যদি আমাকে নিয়ে এই রকম একটা পরিস্থিতি আপনারা আজ ঘটিয়ে না তুলতেন এখানে। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন বলে



www.pathagar.com

আপনাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করতে গিয়ে আজ আমাকে বাধ্য হয়েই আমার কওমের ও সেই সাথে আমার নিজের সাথেও এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে হলো।

তটিনী ক্ষুন্ন হলো। বললো–এটাকে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা বলছেন কেন?

মরিয়ম বিশ্বাসও ধরে বসলেন কথাটা। বললেন– এ কথার মানেটা তো ঠিক মতো বুঝলাম না বাবা?

তাজউদ্দীন বললো–আম্মা, আমার এ পরিচয়ে ভীত হয়ে আপনারা যদি আমাকে স্থান আর না দেন, কিংবা আমার পরিচয় যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে আমার জানটা কতটা বিপন্ন হবে, তা ভেবে দেখুন। সে পরিস্থিতিতে আমি তো আত্মরক্ষার্থেই ব্যস্ত থাকবো সব সময়। কওমের খেদমত করবো কখন? আর কিছু না হলেও এটা কি কওমের কাছে আমার কমজোর ঈমানের পরিচয় দেয়া নয়?

উপস্থিত তিনজনই তাজউদ্দীনের এই মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তুললেন। মুহসীন বিশ্বাস ক্ষোভের সাথে বললেন–আমাদের তুমি এতটা পর ভাবছো কেন? যেদিন তোমাকে এ বাড়িতে তুলে এনেছি আমরা, সেদিন থেকেই তুমি আমাদের সন্তান হয়ে গেছো। যা কিছু ফাঁক ছিল তুমি তোমার মধুর আচরণ ও পাক পবিত্র মনমানসিকতায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছো। তোমার কোন স্বার্থই আর এখন আমাদের স্বার্থ থেকে আলাদা নয়। তোমার হেফাজতির চিন্তা শুধু তোমার একার নয়, অনেক ক্ষেত্রে তোমার চেয়েও অধিক চিন্তা আমাদের।

এ বিশ্বাস তাজউদ্দীনেরও যে ছিলনা, তা নয়। তবে তা দ্বিধামুক্ত ছিলনা। মুহসীন বিশ্বাসের কথা শুনে তার সে দ্বিধাটুকু সাফ হয়ে গেল। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বললো–বড় আব্বা।

মুহসীন বিশ্বাস পুনরায় বললেন–আমাদের সন্তান বা সন্তানতুল্য ছাড়াও তুমি আমাদের কওমের খাদেম। তোমাকে হেফাজত করা তো আমাদের শুধু দায়িত্বই নয়, আমাদের জন্যে ফরয।

মরিয়ম বিশ্বাস বললেন–তুমি কি শুধুই আমাদের সন্তান বাবা! তোমার সাথে আমাদের এই পরিবারটা যে আরো কতটা জড়িয়ে আছে, সেটা তুমি এখন বুঝবেনা। এই পরিবারের আর কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকার নেই। তোমাকে ঘিরে এই পরিবারের এখন অনেক আশা, অনেক ভরসা।

বলেই তিনি তটিনীর দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করলেন এবং পুনরায় বললেন–এই যে এই মেয়েটা এটাতো মুসলমানও নয়, তোমার কেউও নয়। তবু তোমার খারাপ খবর শুনে যে কি অবস্থা হয়েছিল এর, তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখলে। তোমার ওপর সবার কি দরদ, তোমাকে নিয়ে সবার কি ব্যস্ততা তা একবার বুঝো! তুমি তো আর বাইরে নেই বাবা, আমাদের সবার–এমনকি এই মেয়েটারও দিলের মধ্যে স্থান নিয়েছো তুমি।

মরিয়ম বিশ্বাস মনের খেদে বলে গেলেন। কিন্তু এ কথায় তটিনী বিশ্বাসের কর্ণমূল পর্য্যন্ত গরম হয়ে উঠলো। সে তার নত শির আরো অধিক নীচু করে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো–পর চিরকাল পরই থাকে জেঠীমা, তারা আপন হতে জানেনা।



www.pathagar.com

ধমকে উঠলেন মরিয়ম বিশ্বাস। বললেন–ছিঃ! অমন কথা বলো না মা। তাজউদ্দীন আমার তেমন ছেলে নয়।

তাজউদ্দীনের বর্তমান পরিচয়টা গোপন রাখার ব্যাপারে এরপর সর্তকতা মূলক কিছু কথাবার্তা হলো। সবশেষে তাজউদ্দীন বললো–সময়টা এখন বড়ই খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি ইনশাআল্লাহ অধিকদিন থাকবেনা। এ কটা দিন আমাদের সবাইকে বড় সংযত ভাবে চলতে হবে। কোন কিছুতেই উতলা হওয়া চলবেনা।

আলোচনা শেষ হলে মরিয়ম বিশ্বাস উঠে গেলেন। মুহসীন বিশ্বাস উঠি উঠি করতেই তটিনী একটু জড়িত কন্ঠে বললো–জেঠামশাই, আমার একটা কথা আছে।

মুহসীন বিশ্বাস বললেন–কি কথা মা?

কিছুটা ক্ষীণ হলেও অত্যন্ত স্পষ্টকন্ঠে তটিনী এবার সরাসরি বললো–আমি মুসলমান হবো।

মুহসীন বিশ্বাস এ কথায় একটু চমকে উঠলেন। বললেন, কেন মা? এ কথা বলছো কেন?

তোমরা সকলেই মুসলমান। ইনিও মুসলমান। এখানে একমাত্র আমিই বিজাতীয়া। আর সে কারণেই হয়তো ইনি আমাদের বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছেন। এমন একটা পরিস্থিতি জিয়িয়ে রাখা ঠিক নয়।

মুহসীন বিশ্বাস এবার হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন–ও, এই কথা? পাগলী মেয়ে আমার। তাজউদ্দীন যে কখনও তোমাকে সে চোখে দেখেনা, তা তুমি এখনও বুঝতে পারোনি? তা যদি দেখতো, আজকের এই গোপন বৈঠকে সে তোমাকে ডেকে আনতো, না তোমার সামনে বলতো এসব কথা?

তটিনী তবু জিদ ধরে বললো–না, জেঠামশাই, আমার বাপ মায়েরা যে যা ভাবেন ভাবুক, তুমি আমাকে মুসলমান করে তোমাদের সাথে এক করে নাও।

মুহসীন বিশ্বাস এবার সত্যি সত্যিই বিস্মিত হলেন। প্রবল আপত্তি তুলে বললেন–না মা, এমন কথা খবরদার তুমি এখন বলোনা। আল্লাহ পাক যদি উপযুক্ত সময় দেন, আর তখন যদি তোমার এ আগ্রহ থাকে, তোমার এই আগ্রহের পূর্ণ মর্যাদা আমি দেবো। কিন্তু এখন নয়। এখন বড় দুঃসময়। চরম দুর্যোগ যাচ্ছে এখন। তোমার বাবা এখনও রাজার অধীনে চাকুরী করে। এই অসময়ে নতুন করে মুসলমান হওয়ার সাহস একজন উন্মাদেও করবেনা। রাজা গণেশের এই মুসলমান উচ্ছেদ অভিযানের মুখে কারো নতুন করে মুসলমান হওয়ার খবর তপ্ত লৌহশলাকার মতোই রাজার কানে লাগবে। তুমি যদি তা হও। সে খবর রাজার কানে পৌঁছামাত্র চাকুরী পড়ে মরুক, সুরেশ্বরের জানডাই তারা নিয়ে নেবে। খবরদার! ও সব খামখেয়ালী চিন্তাভাবনা এখন করতে যেওনা।

মুহসীন বিশ্বাসও বেরিয়ে গেলেন। রইলো শুধু তটিনী। এখন আর এখানে তার অধিকক্ষণ থাকা সমীচিন নয় মনে করে তটিনীও উঠে দাঁড়াতেই তাজউদ্দীন রসিকতা করে বললো–কি ব্যাপার! মুসলমান হওয়ার হঠাৎ এত আগ্রহ যে?

কপট রোষে তটিনী বিশ্বাস বললো–আমার ইচ্ছে।



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন বললো–ইচ্ছে তো ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ এই ইচ্ছেটা–

তটিনী এবার সত্যি সত্যিই অভিমান ভরে বললো–সেটা যদি বুঝার মতো কিছুটা আগ্রহও থাকতো আপনার, তাহলে তো নিজেকে আমি ধন্য মনে করতাম।

তটিনী এগুলো। তাজউদ্দীন বিহবল কণ্ঠে ডাকলো–তটিনী।

তাজউদ্দীনের মুখে এই প্রথম তার নাম শুনলো তটিনী। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগলো সে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বললো–কেন আপনি কিছুই বুঝতে চাননা?

তাজউদ্দীনও ঐকই রকম আপ্লুত কণ্ঠে বললো–বুঝি তটিনী, সবই বুঝি।

বোঝেন?

শুধু বুঝিই না, আল্লাহ পাকের কাছে এস্তার আরজ করি, আমি যা বুঝি, তা যেন নির্ভুল হয়।

তটিনীর অভিমান পড়ে গেল। হৃদয় প্রসন্ন হলো। সে তৃপ্ত দীলে প্রশ্ন করলো–ভুল হলে?

মারা যাবো, সেরেফ মারা যাবো।

ইশ্!

ইশ নয়। তটিনীহীন তাজউদ্দীন এখন সেরেফ একটা লাশ মাত্র।

খুশীতে তটিনীর দুই চোখ দপ দপ করে জ্বলে উঠলো। বললো সত্যি?

বিশ্বাস না হয় এই তোমাকে ছুয়ে আমি বলছি–

তাজউদ্দীন বেখেয়ালেই তটিনীর দিকে এগুলো। চমকে উঠে তটিনী এদিক ওদিক চাইলো এবং সরতে সরতে বললো–ওম্মা! তলে তলে এতো। এতো আমার জাত ইজ্জত খাবে দেখছি।

হাসতে হাসতে তটিনী বিশ্বাস তাজউদ্দীনের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাজগুরু মহাদেব চক্রবর্তী বাংলা মুলুকের লোক। ত্রিহুতরাজ দেবসিংহের তিনি গুরু ছিলেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের পৈতৃক বাড়ি বাংলা মুলুকের পাকুড়তলায়। বিষ্ণুপাল রজব আলীদের পাকুড়তলায়। বিভিন্ন শাস্ত্র ও দর্শনে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করে তিনি মুঙ্গগিরি বা মুংগেরে চলে যান এবং সেখানেই অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। মুঙ্গ গিরিতে অধ্যাপনা করা কালেই তিনি ত্রিহুত রাজ দেবসিংহের সংস্পর্শে আসেন। মহাদেব চক্রবর্তীর অগাধ জ্ঞান, মার্জিত রুচি ও উদার মনোবৃত্তিতে দেব সিংহ মুগ্ধ হন এবং তাকে গুরুপদে বরণ করে ত্রিহুতে নিয়ে যান। অতপর মহাদেব চক্রবর্তী ত্রিহুতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পুত্রশিব সিংহের হাতে দেবসিংহের ঐ বিপর্যয়ের পর মহাদেব চক্রবর্তী ত্রিহুত রাজ্য ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পুরুষের ভিটা বাংলা মুলুকের পাকুড়তলায় ফিরে আসেন। পাকুড়তলায় তার বিষয় বিত্ত অনেক খানিই ছিল। তাই নিয়েই তিনি তাঁর নতুন জীবন শুরু করেন। প্রথম প্রথম কয়েক দিন চিন্তাভাবনা করার পর নিজ বাড়িতেই তিনি টোল খুলে বসেন।



www.pathagar.com

পাকুড়তলায় তিনি অনেকটা অপরিচিত হলেও এ অবস্থা বেশীদিন রইলোনা। তাঁর পান্ডিত্যের গভীরতায়, চরিত্রের মাধুর্যে আর স্নেহশীল মনমানসিকতায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সকলেরই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অনেকে তাঁর পরমভক্তে পরিণত হয়ে গেল। বিষ্ণুপাল, বধুহালদার, রজব আলী, সোনাবাউল এইভক্তদের প্রথম কাতারের মানুষ। টোলের ছাত্র ছাড়াও ভক্ত আর শুভাকাঙ্খীদের ভিড়ে চক্রবর্তীর পতিত ভিটে পুনরায় সরগরম হয়ে উঠলো।

একজনের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রতিবেশীর গাত্রদাহ বঙ্গবাসীর আদি ও অকৃত্রিম চরিত্র। বামুন পাড়ার অন্যান্য বামুনেরা অত্যন্ত নাখোশ হলেন চক্রবর্তী মহাশয়ের এই অত্যধিক জনপ্রিয়তায়। এর পেছনে কারণও খানিক ছিল। এই বামুনদের প্রকট স্বার্থপরতায় এবং সেই সাথে অহংকার, শুচিবাই ও হিংসুটে চরিত্রের কারণে এদের প্রতি এলাকার অধিবাসীরা আগে থেকেই আদৌ তুষ্ট ছিলনা। মহাদেব চক্রবর্তীর আগমনের পর এদের সাথে কোন সংশ্রবই আর এ এলাকার লোকজনের রইলোনা। পাঁতি-পাঁজি-যা কিছু প্রয়োজন সেজন্যে সবাই মহাদেব চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হতে লাগলো। শাস্ত্রীয় বিধানআদি তাঁর কাছ থেকেই সকলে সংগ্রহ করতে লাগলো। মহাদেব চক্রবর্তী কর্তৃক প্রদত্ত বিধানগুলিও যেমন সহজ সরল ছিল, তেমনই ছিল ব্যয় বাহুল্য বিহীন। কাজেই সব ব্যাপারেই এবং সব ক্ষেত্রেই সবার নজর মহাদেব চক্রবর্তীর ওপরই নিবদ্ধ হয়ে রইলো। অন্যান্য বামুনদের প্রতি নজর তুলে তাকানোর গরজও আর কোন মানুষের রইলোনা।

এতো গেল এ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা। মহাদেব চক্রবর্তীর উদার মানসিকতায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক মুসলমানও তাঁর আঙ্গিনায় ভিড় জমাতে লাগলো এবং বৈষয়িক সমস্যাদির ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান উপদেশাদি গ্রহণ করে উপকৃত হতে লাগলো। বামুন পাড়ার বামুনেরা আর এতটা বরদাস্ত করে কি করে?

সেদিন সকাল বেলা একটা বড় মাছ নিয়ে বুধু হালদার মহাদেব চক্রবর্তীর বাড়িতে এসে হাজির হলো। তাকে দেখে চক্রবর্তী মহাশয় বললেন-আরে বুধু যে। এতবড় মাছটার এখনও গ্রাহক পাওনি? কত দাম নেবে এর?

বুধু হালদার মাছটা চক্রবর্তী মহাশয়ের সামনে এনে রেখে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করে বললো-না গো বাবু, বেচতে আমি আসিনি। আপনার চরণে মাছটা নিবেদন করার লেগে এসেছি।

নিবেদন করার লেগে মানে?

মানে আপনার সেবায় এটা উৎসর্গ করার লেগে এসেছি।

বেশ বেশ। তা দাম দেবো কত?

দাম। না বাবু, সে হবার লয়। এর কোন দাম আমি লেবোনা।

মানে। তুমি গবীর মানুষ দাম নেবেনা মানে? মাছ বেঁচে দাম না নিলে তোমার দিন চলবে কি করে?

বাবু দিন আমাদের কোনদিনই ঠিক মতো চলেনা। ঐ একটা মাছের দাম লিলেও চলবেনা।



www.pathagar.com

কিন্তু তাই বলে-

আমি গরীব মানুষ বাবু। খরচ করে তীর্থ দরশন আমার কপালে জুটবেনা। পেটের ধাঁধাঁয় পুন্যির কোন কামই আমার এ জীবনে করা হয়নি। তাই এই মাছটা আপনাকে দিতে এয়েচি। বাবু দয়া করে মাছটা আপনি ল্যান্।

চক্রবর্তী মহাশয় অবাক হলেন। বললেন-তা আমাকে বিনি পয়সায় মাছ দিলে তোমার পুন্যি হবে এ কথা কে বললে তোমাকে?

বলতে হবি ক্যানে গো বাবু? এডা এখানে কে না জানে? আপনার মতো দেবতা মানুষ আর একটা আছে এ তল্লাটে?

বুধু!

দেবতা দরশন কয়জনের লসীবে জুটে বাবু? হাতের কাছে লা-খরচা এমন সুযোগ থাকতে আমরা কি কেউ লিব্বোদ যে, তা ছেড়ে দেবো?

মহাদেব চক্রবর্তী ফাঁপরে পড়লেন। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন-বুধু তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো। অমাকে বিনা দামে মাছ দিলে এক পয়সার পুন্যিও তোমার হবেনা। এটা সেরেফ তোমার ভুল।

বুধুও নাছোড়বান্দা। বললো-ভুল হলেও ঐ ভুলই আমার কাছে একটা মস্তবড় পুন্যি বাবু। এই রকম ভুল করেই য্যান্ আপনার মতো মানুষের চরণ দরশন বার বার করতে পারি। দয়া করে মাছটা আপনি বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দ্যান।

অনেক সাধাসাধি করেও বুধু হালদারকে চক্রবর্তী একটা পয়সা দাম নেয়াতে পারলোনা। শেষ অবধি বুধুর মানসিক তৃপ্তির কারণেই এবং সেই খাতিরেই মাছটা তিনি গ্রহণ করলেন। এর পর অনেকটা জোর করেই বুধু হালদারকে পেট ভরে গুড় মুড়ি খাইয়ে তবে বিদেয় করলেন।

মহাদেব চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে ফিরে আসার পথে ভোলা ভট্চাজের সামনে পড়লো বুধু হালদার। বুধু হালদারকে দেখেই ভোলা ভট্চাজ বললেন-কিহে, বাজারে গিয়ে মৎস ক্রয় করার কালে শুনলাম, বিরাট এক মৎস নিয়ে তুমি আমাদের এদিকে আগমন করেছো? কার ভবনে গিয়েছিলে?

জবাবে বুধু হালদার বললো-চক্কত্তি মশায়ের ভবনে।

ভোলা ভট্চায বললেন- চক্রবর্তী! কোন চক্রবর্তী? মহাদেব চক্রবর্তী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মৎসটা বুঝি ওখানেই প্রদান করে এলে?

আজ্ঞে, হ্যাঁ ঠাকুর।

তা মূল্য কত পেলে?

মূল্য।

দাম পেলে কত?

না ঠাকুর, ঐ দাম মূল্যের লেগে আমি তাঁর বাড়িতে মাছ লিয়ে যাইনি।



www.pathagar.com

ভোলা ভট্‌চাজ অবাক হয়ে বললেন–তবে বিনামূল্যেই প্রদান করে এলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলো কি হে। শুনলাম বিরাট বড় মৎসটা। একেবারেই বিনা মূল্যে প্রদান করে এলে ওটা?

এলাম বাবু।

ভোলা ভট্‌চাযের মাথায় আগুন ধরে গেল। ধূতির কোঁচাতে একটা ঝাড়ন দিয়ে বললেন–তাতো প্রদান করবিই। তোদের মতো নরকের কীট এর চেয়ে আর উত্তম কর্ম কি সম্পাদন করতে পারে? ঐ চক্রবর্তী একজন বহিরাগত ম্লেচ্ছ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দৈবাৎ রাজগুরু হয়ে থাকলে কি হবে? জাত বিচারের বালাই রাখেনা ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার। হাড়ি ডোম–যবন সবার সাথে সর্বক্ষণ উঠাবসা করে নিজের পবিত্রতা কলুষিত করে যে, তাকে তুই অতবড় মৎসটা বিনা মূল্যে প্রদান করে এলি? আর আমরা তোমার প্রতিবেশী, নৈকষ্য কুলীন বামুন। সাক্ষাত দেবতা। বিনা মূল্যে একমুঠো চূনোপুঁটি মাছও আমাদের তোরা প্রদান করতে আগ্রহী নোস। রৌরব নরক ছাড়া আর কোথায় স্থান হবে তোদের? দুর্গন্ধময় নরকে তোদের পচে মরতে হবে বলে দিলাম।

বুধু হালদারের রাগ হলো। সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো–শাপ মুন্নি দিচ্ছেন ক্যানে গো ঠাকুর? আপনাদের আক্কেল গুণেই তো আর আপনারা সম্মান পাননা আমাদের। জনমভর আপনাদের আমরা বিনি পয়সায় মাছ খাইয়ে এয়েচি। তার লেগে একটা দিনও একটা পয়সা আমাদের হাতে দেননি আপনারা। পেটের দায়ে এক–আধ দিন বিনি পয়সায় দিতি না পারলেই মাথায় আপনাদের আগুন লাগে। নরকের ভয় দেখান। আর ঐ চক্কত্তি মশাই? আপনি যাকে মেলেচ্ছ কইচেন, সেই মেলেচ্ছ বামুন একদিনও একটা মাছ বিনি পয়সায় কিছুতেই নিতে চায় না। দাম এনে বার বার হাতের মধ্যে গুঁজে দেয়। পেটভরে গুড়মুড়ি খাওয়ায়। বিনি পয়সায় মাছ তাকে দেবোনাতো দিবো আর কাকে? আপনাদেরে? ওটি আর হবার নয়গো বাবু।

বুধু হালদার হন হন করে চলে গেল। ক্রোধে ভট্‌চায মশাই পুনঃ পুনঃ কাছা ঝাড়তে লাগলেন।

চক্রবর্তীর বাড়িতে এমনিভাবে কেউ না কেউ আসেই। আসে বিষ্ণুপাল। রজব আলী, সোনাবাউল ও এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান অনেকেই। প্রথম প্রথম কলাটা মুলোটা একটা না একটা কিছু হাতে করে আনতো সবাই। কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয় এতে খুবই নাখোশ হন দেখে, ওসব আর কেউ আনেনা। তবে আসা কারো বন্ধ নেই। চক্রবর্তীও একদিন কেউ না এলে উতলা হয়ে ওঠেন। এদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর নিয়ে বেড়ান। বিপদে মুসিবতে এদের পাশে এসে দাঁড়ান।

যেতে থাকে দিন। দিন যত যেতে থাকে পাকুড়তলার বামুনদের আক্রোশ বাড়তে থাকে ততই। শেষ পর্যন্ত সে আক্রোশ রাজদরবার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। দরবারে এই মর্মে অভিযোগ



www.pathagar.com

করা হয় যে, ত্রিহুত রাজ শিব সিংহ যেহেতু পাণ্ডুয়ারাজ গণেশের সহায়তায় সনদ লাভ করেছে, সেহেতু ত্রিহুতের ভূতপূর্ব রাজগুরু প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে বাংলা মুলুকে এসে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং হিন্দু মুসলমান সবাইকে পাণ্ডুয়া রাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত করছে। নির্বাসিত রাজা দেবসিংহের পরামর্শে এই কর্মে লিপ্ত হয়েছে সে। পাণ্ডুয়া রাজের পতন ঘটাতে পারলেই শিবসিংহ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সে ক্ষেত্রে তারা অনায়াসেই হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারবে। হিন্দু হয়ে হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে হাত মিলিয়েছে পাষন্ড। এর বিহিত হওয়া দরকার।

কয়দিন পরই রাজ দরবার থেকে জনৈক প্রতিনিধি এসে ঘটনাটি তদন্ত করে গেলেন এবং বামুন পাড়ার বামুনদের পরামর্শে ঘটনা সত্য বলে প্রতিবেদন দাখিল করলেন। এরপর থেকেই "চক্রবর্তীকে এবার বাঁচায় কে"–বলে এই বামুনেরা অহরহ তম্বি করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণ হত্যা মহাপাপ। হিন্দু রাজার পক্ষ থেকে ব্রাহ্মণ হত্যার আদেশ হয়তো আসবেনা। কিন্তু অতপর তাঁকে বাংলা মুলুক ছাড়তে হবে, এই আশংকায় মহাদেব চক্রবর্তী অত্যন্ত মন মরা হয়ে পড়লেন।

ঠিক এই মুহূর্তে তাজউদ্দীন এলো চক্রবর্তীর সাথে সাক্ষাত করতে। এসেই সে বললো–আমি এই এলাকারই মানুষ, বাঁশবাড়িতে বাস, জাতিতে আমি মুসলমান। আমার নাম তাজউদ্দীন। কিছুদিন থেকেই আমি আপনার অনেক তারিফ শুনে আসছি। আসবো আসবো করেও এ যাবত মওকা পাইনি। এই পথে যাবার কালে আজ ভাবলাম, একটু সাক্ষাত করে যাই। তা মহাশয়ের তবিয়ত ভালতো?

মহাদেব চক্রবর্তী তাকে সাদরে বসতে দিয়ে বললেন–হ্যাঁ বাবা, শরীর আমার ভালই আছে। তবে মানসিক অবস্থাটা ভাল নয় তেমন।

তাজউদ্দীন আগ্রহী কণ্ঠে প্রশ্ন করলো–কেন–কেন?

সে অনেক কথা। আপনি নতুন মানুষ, ওসব কথা থাক। এখন কথা হলো, আমি এই হালে এখানে এসেছি। আপনার সঠিক পরিচয়ও আমি জানিনে। অথচ আপনি দয়া করে আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন–এজন্যে কি ভাবে যে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো–

না–না। ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য। খুব ভাল মানুষ বলে অনেক নাম শুনেছি আপনার। এ দুনিয়ায় ভাল মানুষের খুব অভাব। আর তাই আমিই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। শুনি, আপনি নাকি একজন রাজগুরু ছিলেন। সেই এতবড় মানুষ এমন নিরহংকার, এটা কি একটা মামুলী ব্যাপার?

অপলক নেত্রে তাজউদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মহাদেব চক্রবর্তী। পরে ধীরে ধীরে বললেন–আগে ছিলাম একটা সীমাবদ্ধ পরিমন্ডলে। সকল জাতির লোকের সাথে খোলাখুলিভাবে মেশার সুযোগ পাইনি। এখানে এই আপনাদের মধ্যে ফিরে আসার পর থেকেই একটা জিনিস আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছি। এর সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজি খুঁজি করেও এখনও খোঁজ করা হয়নি। আপনাকে দেখে সেই প্রশ্নটা আবার নতুন করে মনে জাগছে আমার যদি কিছু মনে না করেন–



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন বললো–আরে না–না। কি আপনি বলতে চান তা না শুনে আগেই আমার মনে করার কি আছে। কি আপনার প্রশ্ন তা বলুন–

চক্রবর্তী মহাশয় একটু ইতস্তত করে বললেন–এযাবত আমি শুনে এসেছি–যারা হিন্দু তারা বিধর্মী এবং প্রত্যেক মুসলমানই তাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে। কিন্তু এখানে এসে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু উল্টা পাল্টা লাগছে। মুসলমানেরা অনেকেই খোলা অন্তরে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করছেন, কথা বলছেন। তাঁরা আমাকে ঠিক ঘৃণা করছেন–এমনটি মনে হচ্ছে না তো?

তাজউদ্দীন একটু হাসলো। তারপর বললো–দেখুন হিন্দু বলেই যে আমাদের কাছে আপনারা বিধর্মী, তা নয়। যে অমুসলমান সেই বিধর্মী। আল্লাহ, রসূল ও আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ যে বিশ্বাসী নয় সে–ই অবিশ্বাসী। বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান–তা সে যা–ই হোন তিনি। তৌহিদের বাণী যার দিলে পৌছায়নি তিনি সঠিক পথে চলছেন, তা আমরা বলিনা। আমরা বলি এবং এখনও বলছি–তাঁরা ভ্রান্ত পথে আছেন, সুন্দর ও সত্য পথের দিশা তাঁরা পাননি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁকে আমরা ঘৃণা করি। সারে জাহানের তামাম কিছুই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। তার সৃষ্টির কোন কিছুকে ঘৃণা করা আল্লাহপাক কে অবমাননা করা। কোন মুসলমান তা করেনা। মানুষকে ঘৃণা করার প্রশ্নই তো আসেনা। তবু যদি কেউ করে, তাহলে সে মুসলমান নামধারী ভন্ড, মুসলমান সে নয়।

কিন্তু–

আচারে অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আপনাদের সাথে আমরা সমাজ জামাত করিনা। বলি–লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন–তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। আপনারা ভ্রান্ত পথে আছেন বলে আপনাদের জন্যে আমাদের করুণা হয়, এটা ঠিক। কিন্তু ঘৃণা করার কোন প্রশ্নই নেই এখানে।

আচ্ছা।

ভালটা চিরদিনই ভাল লাগে মানুষের। আপনার আদব–আচরণ ভাল, তাই আপনাকে ভাল লাগে সকলের। ধর্মমতে আপনি সঠিক পথে আছেন কিনা– সে প্রশ্ন ভিন্ন।

মহাদেব চক্রবর্তী একাগ্রচিত্তে তাজউদ্দীনের কথাগুলো শুনলেন এবং তাজউদ্দীনের সাথে আলাপ করে তিনি খুবই প্রীত হলেন। এরপর কথায় কথায় তিনি তার মানসিক অশান্তির বিষয়টাও সবিস্তারে তুলে ধরলেন। শুনে তাজউদ্দীন গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো–মহাশয়, ধৈর্য একটা মস্তবড় গুণ। ওদের ওসব তম্বিতে কর্ণপাত না করে আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন। এ অবস্থা চিরকাল থাকবেনা।

কিন্তু–

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যদিও আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি এখন, তবু একবার আমাকে যেতেই হবে রাজ প্রাসাদে। আমার নিজেরই একটু প্রয়োজন আছে। রাজকুমার যদু নারায়ণ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনার ওপর যাতে করে কোন অবিচার করা না হয়, তাঁকে দিয়ে সে ব্যবস্থা করবো আমি।



www.pathagar.com

শুনে চক্রবর্তী মহাশয় অত্যন্ত আশান্বিত হলেন। ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন সেকি। রাজকুমারের সাথে সদ্ভাব আছে আপনার? বড় আনন্দের কথা তো।

তাজউদ্দীন হেসে বললো–হ্যাঁ, তা কিছুটা আছে।

আমার তাহলে একান্ত অনুরোধ বাবা, আমার জন্যে একটু কষ্ট করলে বড়ই বাধিত হবো আমি।

চক্রবর্তীর কণ্ঠে মিনতির সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো। তাজউদ্দীন বললো–আপনি আমাকে শরমিন্দা করবেন না। আপনি একজন ভাল মানুষ। আপনার জন্যে কিছু করতে পারাটা আমার কাছে কোন তকলিফের ব্যাপার নয়, আনন্দের ব্যাপার। ইনশাআল্লাহ ওটা আমি আপনার জন্যে অবশ্যই করবো।

প্রশান্তির পরশে মহাদেব চক্রবর্তীর মুখমন্ডল সজীব হয়ে উঠলো।

রাজকুমার যদু নারায়ণ প্রাসাদ উদ্যানে একটি কিতাব খুলে বসেছিলো। সান্যাল তনয়া যমুনা সান্যাল তাঁর খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে উদ্যানে এসে হাজির হলো। যদু নারায়ণ তখন কিতাবের মধ্যে একেবারেই মশগুল হয়ে তলিয়েছিল। যমুনা এসে তার একান্ত কোল ঘেঁষে দাঁড়ালেও যদু নারায়ণ টের পেলোনা সেটা। সে ঐ একইভাবে কিতাবের মধ্যে ডুবে রইলো। কিছুক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকার পর রাগ হলো যমুনার। সে ছোঁ মেরে কিতাব খানা কেড়ে নিয়ে এক পাশে থপ্ করে রেখে দিলো এবং সেই সাথে গাল ফুলিয়ে বললো–তুমি যে কি, তা বুঝতে আর বাকী নেই আমার।

যদু নারায়ণ চমকে গিয়ে থতমত খেয়ে বললো–কি মানে? ক্রোধের আধিক্যে যমুনা সান্যাল বললো–মানে, তুমি একটা একেবারেই স্বার্থপর, অমানুষ।

অমানুষ।

হ্যাঁ, একেবারেই স্বার্থপর, একেবারেই অমানুষ।

গোস্বায় ফুলতে লাগলো যমুনা সান্যাল। যদু নারায়ণ বললো–আহা হলোটা কি, তা বলবে তো?

কি বলবো? একটা কিতাব হাতে পেয়েই তুমি দেখতে পাওনা আমাকে। দুদিন পর যখন মসনদ হাতে পাবে, তখনতো আমাকে তুমি চিনতেই পারবেনা?

যদু নারায়ণ হেসে বললো–ও এই কথা?

অভিমান ভরে যমুনা সান্যাল বললো–হ্যাঁ, এই কথা। এটা ফাল্তু কথা নয়।

আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। তাহলে মসনদ আমি ছোঁবইনা।

মানে।

মসনদের আমি ধারে কাছেও যাবোনা। নেবোইনা মসনদ আমি।

নেবেইনা?

না। মসনদ নিলে যখন তোমাকে ভুলে যাবো, তখন ও মসনদ আমি চাইনে।

চাওনা মানে? কাকে দেবে?



www.pathagar.com

যে ইচ্ছে সে নিক্‌গে।

যে ইচ্ছে মানে?

মহেন। আমার ছোটভাই মহেন্দ্রকে দেবো।

তাহলে এ রাজ্যের রাজা হবে মহেন?

হবে।

রাণী?

মহেনের যে বউ হবে সে।

আর আমি?

ষষ্টে।

মানে?

আমার বউ হলে আর রাণী হতে পারছো কৈ? রাণী হওয়ার ইচ্ছে থাকলে, আগেই কাউকে বিয়ে করা চলবেনা। ওঁৎ পেতে থাকতে হবে। যে রাজা হবে অমনি তাকে বিয়ে করে ফেলতে হবে। তাহলে তোমার রাণী হওয়া আর আটকায় কে?

যমুনা তার চোখ দুটি ফুটিয়ে তুলে বললো–যে রাজা হবে তাকেই বিয়ে করতে হবে?

হ্যাঁ।

মানে, তাকেই বিয়ে করবো আমি?

করবে।

তুমি যদি রাজা না হও, তবু রাজাকেই বিয়ে করতে হবে আমার?

হ্যাঁ। রাণী হওয়ার শখ থাকলে তো তাই করতে হবে।

তবেরে–

ক্রোধে জ্বলে উঠে যমুনা সান্যাল পাশে রাখা কিতাব খানা থাবা মেরে তুলে নিলো এবং দাঁতের ওপর দাঁত পিষে তা সবলে ছিঁড়তে গেল।

চমকে উঠে যদু নারায়ণ ধড় মড় করে উঠে দাঁড়ালো। সে দুই হাতে কিতাবসহ যমুনার দুইহাত চেপে ধরে মিনতির সুরে বার বার বলতে লাগলো–দোহাই তোমার। আমার ঘাট হয়েছে, দোষ হয়েছে, আমি যা বলেছি, ভুল করে বলেছি। এমন ভুল এ জিন্দেগীতে আর আমার হবেনা। আমাকে তুমি মাফ করে দাও। এবারের মতো মাফ করে দাও।

এবার ফিক্ করে হেসে ফেললো যমুনা সান্যাল। বললো–কেন, আর করবে আমার সাথে মস্করা?

যমুনার সাথে হেসে ফেললো যদু নারায়ণও। এরপর যদু নারায়ণ ধীরে ধীরে গম্ভীর হলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আসলে মস্করা নয় যমুনা। তুমি আমি কেউ আর আমরা ছোট নই। এখন আমরা বড় হয়েছি। এখন আমাদের ভূৎ–ভবিষ্যৎ চিন্তা করার দিন এসেছে।

যমুনাও সংযত কণ্ঠে বললো–এ কথা বলছো কেন?

বলছি এই কারণে যে, আমি রাজা আর তুমি রাণী হবে এ রাজ্যের–আমাদের এই দীর্ঘ স্বপ্ন আসলেই যে সত্যি হবে, এ সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে।



www.pathagar.com

যমুনা সান্যাল শংকিত কণ্ঠে বললো–কেন, কেন?

যদু নারায়ণ বললো– আমার বাবার এই প্রচন্ড বাড়াবাড়িই হয়তো শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ ডেকে আনবে আমাদের। মুসলমানদের তিনি যেহারে নিধন করে চলেছেন, তাতে এটা চরম পর্যায় অতিক্রম করে গেছে। যে কোন কিছু চরমে উঠলেই ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সারা বিশ্বে এখন কোটি কোটি মুসলমান আর অত্যন্ত শক্তিশালী অসংখ্য মুসলমান রাষ্ট্র। এদের ওপর এ নির্যাতন দেখে তারা যদি ক্ষেপে যায় তাহলে?

যমুনা সান্যাল চিন্তিত হয়ে বললো– তাইতো! তাও তো হতে পারে!

হতে পারে মানে? এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক এবং যে কোন মুহূর্তে তা হতে পারে। সেনা সৈন্যদের মধ্যে এসব নিয়ে কথাবার্তা শুনেছি। রাজ্যধর কাকাও সেদিন আফসোস্ করে এমনই একটা ইঙ্গিত দিলেন কথায় কথায়।

কি বলছেন তাঁরা?

সঠিক কিছু বা নির্দিষ্ট কিছু না বললেও তাঁরা যা বলতে চান তা হলো, ঐ যা বললাম তাই। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সেরা শক্তি মুসলমান শক্তি। এসব দেখে বাংলাদেশের বাইরের মুসলমান রাজা বাদশাহরা যদি ক্ষেপে যান, আমাদের অবস্থা তাহলে কি হবে, তা কল্পনাও করা যায়না।

বলো কি!

আমাদের পাত্রমিত্র আর মন্ত্রিরা ভাবছেন–এমনটি হবেনা। অন্য মুল্লুকের সুলতানেরা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে বাংলায় কেউ আসবেনা। এত গরজ কারো নেই। কিন্তু সহজ অবস্থা হলে না হয় কেউ আসবেনা তা ঠিক কিন্তু এই রকম চরম অবস্থা হলেও কেউ আসবেনা, এটা জোর দিয়ে বলা যায়?

তাইতো। তাহলে এ কথা তোমরা জেঠামনিকে বুঝিয়ে বলছো না কেন?

শুনে কে? কিছু অতি উৎসাহী পরামর্শ দাতার খপপরে পড়ে আমার বাবা অর্থাৎ তোমার সেই জেঠামনি, আকাশ কুসুম রচনায় মত্ত হয়ে আছেন। আমাদের মতো না–লায়েকের কথা তিনি কানে তুলতে গেলেতো?

তোমার কথাও কানে তুলবেননা তিনি?

আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু এসব প্রশ্নে এখনও নাবালকই ভাবেন তিনি আমাকে। কানে তুলতে যাবেন কেন?

তাহলে উপায়? কি হবে আমাদের?

ওপরে নির্দেশ করে যদু নারায়ণ বললো–ঐ একজনের ওপর ভরসা করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের জন্যে যা কিছু মঙ্গল, তাই তিনি করবেন এই আশাতেই থাকতে হবে। যে তুফান চলছে এখন, এর শেষ কোথায়, কে জানে।

তাজউদ্দীন এই সময় রাজ–প্রাসাদের সদর ফটক পার হলো। ফটকে এসে দাঁড়াতেই তাকে চিনতে পেরে দাররক্ষীরা সালাম দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলো। তাজউদ্দীন ভেতরে প্রবেশ করলো। কিয়ৎদূর এগুতেই পারিষদ বেষ্টিত রাজাধিরাজ গণেশের



www.pathagar.com

সামনে পড়লো তাজউদ্দীন। পারিষদদের নিয়ে রাজা গণেশ এই দিকেই আসছিলেন। তাজউদ্দীনকে দেখে তিনি বললেন এই যে তাজউদ্দীন, অনেক দিন পর এবার এলে তুমি। কেমন আছো?

তাজউদ্দীন তাজিমের সাথে জবাব দিলো জি, আপনার দোয়ায় কুশলেই আছি।

রাজা গণেশ এবার ম্লান হেসে বললেন–দোয়ার উৎস আমার অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে হে! তোমার কাছে ঋনী আমি। তাই তোমার ওপর কোন আক্রোশ আমার নেই। কিন্তু তোমার স্বজাতির ওপর আমার এতটুকু অনুকম্পাও আর অবশিষ্ট নেই। আমার স্বজাতির স্বার্থ যাদের হাতে বিপন্ন, তাদের আর কিছুতেই নিস্তার নেই আমার হাতে।

জি।

পারিষদের একজন ফস্ করে বললেন আগুনের মধ্যে হাত ঢুকিয়েছে ব্যাটারা। গ্রাহ্যই করেনা কিছু। এবার বুঝুক, আগুনের দাহটা কত মর্মান্তিক।

অন্য একজন পারিষদ আপত্তি করে বললেন–এসব কথা একে শুনিয়ে লাভ কি? কোৎকা হাঁকানো হচ্ছে যেখানে, সেখানে এ সব বলে বলে। কোৎকার ঘা মারলেই না রাগটা কিছু কমে।

জবাবে প্রথম পারিষদ বললেন–তা ঠিক–তা ঠিক। এরপর তিনি গণেশকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন–এ লোকটা কে প্রভু?

রাজা গণেশ বললেন –এর নাম তাজউদ্দীন। আমার যদু নারায়ণের বন্ধু। যদু নারায়ণের প্রাণটা এই যুবকই বাঁচিয়েছিল।

প্রশ্নকারী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন –তাই নাকি? তাহলে তো এ লোক মহারাজের পক্ষের লোক। তৌহিদ বেগের সন্ধানে তো মহারাজ একেও নিয়োগ করতে পারেন। স্বজাতির মধ্যে মিশে তৌহিদ বেগের খবর এর পক্ষেই তো বের করা সহজ।

দ্বিতীয় পারিষদটি কথাটা লুফে নিলেন। বললেন–বড় দামী কথা তো। আমাদের হাতে কোন মুসলমান গোয়েন্দা নেই। হিন্দু গোয়েন্দারা মুসলমানদের সাথে এক হয়ে মিশে তাদের মধ্যে পড়ে থাকতে পারছেনা বলেই তৌহিদ বেগের হদিস করা যাচ্ছেনা। নইলে, যা খবর আছে, তাতে ঐ ব্যাটা তৌহিদ বেগ এই বাংলাদেশেই আছে। আর আমাদের বিরুদ্ধে জোরদার ভাবে কাজ করছে।

বলেই তিনি তাজউদ্দীনকে প্রশ্ন করলেন–কি, শুনেছো তৌহিদ বেগের নাম?

তাজউদ্দীন ইষৎ হেসে বললো–জি, শুনেছি।

পারবেনা তার সন্ধান করতে?

তা চেষ্টা করলে মানুষের অসাধ্য কি?

রাজা গণেশ এদের থামিয়ে দিলেন। বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে পারিষদদের দিকে চেয়ে তিনি বললেন–আপনারা সব থামুন তো। এ আমার ছেলের বন্ধু আছে, বন্ধুই থাক। একে কেন ওসবের মধ্যে টানছেন?

থতমত খেয়ে প্রথম বক্তাটি বললেন–না, মানে–



www.pathagar.com

রাজা গণেশ বললেন–এ একজন অত্যন্ত সাধারণ স্তরের মানুষ, একজন খুদে ব্যবসায়ী। এর কি সাধ্য আছে তৌহিদ বেগের সন্ধান করে? সে জন্যে একজন তুখোড় লোক প্রয়োজন। সব কাজ সব লোকই পারে না কি বলো তাজউদ্দীন?

জি, তা–মানে–

যাও, যদু নারায়ণ সামনের ঐ বাগানেই বোধ হয় আছে। ওখানে গিয়ে খোঁজ করো।

এরপর তিনি সভাসদদের বললেন–আসুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের।

ওখান থেকে কয়েক কদম সরে এসে রাজা গণেশ পারিষদদের তিক্তকণ্ঠে বললেন–আপনাদের এই নির্বুদ্ধিতাই একদিন আমাকে ডোবাবে। এত কম বুদ্ধি আপনাদের?

পূর্বোক্ত পারিষদ দুইজন লজ্জিত হয়ে বললেন–প্রভূ!

গণেশ পুনরায় বললেন–আমার ছেলের প্রাণ রক্ষা করেছে বলেই ওকে কিছুটা আস্কারা দেই আমি। কিন্তু তাই বলে ভেতরের সব কিছু বলতে হবে ওর সামনে? আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সেও একজন শত্রু আমাদের? তৌহিদ বেগের সন্ধান যদি পায়ও সে, আমাদের কখনও সে তা জানাবে?

পারিষদগণ সকলেই একসাথে বললেন–ঠিক, ঠিক। মহারাজ ঠিক কথাই বলেছেন।

রাজা গণেশ বললেন–লক্ষ্য করে দেখছেন না, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে একজন হিন্দু রাজার অনুগ্রহ পাওয়া সত্বেও এবং একজন হিন্দু রাজ–কুমারের বন্ধু হওয়া সত্বেও, কেমন কট্টর মুসলমানী লেবাসে সে আছে, আর সে এখানে এসেছে? বেশ বাসের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন আনারও প্রয়োজন বোধ করেনি সে। এ ছাড়া আমাদের পাকও সে আজ পর্যন্ত খায়না। এর পরও একে বিশ্বাস করতে পারি আমি?

সমর্থনে সবাই বললেন–ঠিক, ঠিক।

রাজা বললেন–আগে বাইরের অভিযান শেষ করি। এরপর একে নিয়ে বসবো। তখনও যদি এর আচরণে পরিবর্তন না আসে, আমার ঋণ শেষ।

রাজা গণেশ এর বেশী আর বললেন না।

তাজউদ্দীনকে বাগানের দিকে আসতে দেখেই যদু নারায়ণ উল্লাসের সাথে বললেন–আরে বন্ধু যে! আসুন–আসুন–

যমুনাও তার আগমনে আনন্দিত হয়ে বললো–বন্ধুর শরীর মন ভালোতো?

তাজউদ্দীন নিকটে এসে হাসি মুখে জবাব দিলো–ভাল। আজ আমার বড়ই খোশনসীব যে, বন্ধু–বান্ধবী–দুইজনেরই একসাথে সাক্ষাত পেলাম।

যদু নারায়ণ বললো, আমার একটু ভয় ছিল যে, আপনি বোধ হয় আর আসবেনইনা।

জিজ্ঞাসুনেত্রে তাজউদ্দীন বললো– কেন, কেন?

যদু নারায়ণ ঢোকগিলে বললো– আপনার স্বজাতির ওপর রাজ আক্রোশ ইদানিং আরো বেড়ে যাওয়ায় এই ধারণাই ছিল আমার।

সেটা আলাদা দিক। কিন্তু তাই বলে বন্ধু হয়ে বন্ধুর কথা ভুলে যাবো?

আচ্ছা।



www.pathagar.com

বন্ধুর তো আদৌ কোন হাত নেই এখানে। এটা নিবৃত্ত করার সাধ্যও তাঁর নেই।

এক বিন্দুও না। তা থাকলে কি আর এই অশান্তি রাখতাম আমি এদেশে? তা যাক সে কথা। আসুন, অনেক দূর থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই অনেক তকলিফ হয়েছে আসতে। আগে বিশ্রাম, পরে কথা। আসুন–

তাজউদ্দীন আপত্তি তুলে বললো–না বন্ধু। এবার এ ব্যাপারে মেহেরবানি করে মাফ করতে হবে আমাকে। বিশ্রাম করার মতো কোন সময়ই হাতে নিয়ে আসিনি। আমাকে আবার এখনই ওয়াপস্ যেতে হবে। খুব জরুরী কিছু আলাপ আছে বলেই আমি এই ব্যস্ততার মধ্যেও এসেছি।

অগত্যা ঐ বাগানেই বসার আসন দিয়ে তাজউদ্দীনকে যদু নারায়ণ আলাপ শুরু করতে বললো। তাজউদ্দীন বললো–এই পাণ্ডুয়া থেকে সরাসরি দক্ষিণে পাকুড়তলা নামের একটা জায়গা আছে। ঐ যে ঐ সেই পাকুড়তলা যেখানকার রজব আলীর কথা আপনি একবার বলেছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। পাকুড়তলা নামটা আমার খুব পরিচিত। যদিও ওখানে আমি যাইনি কোনদিন, তবু শুনেছি, ওখানে নৈকষ্য কুলীন জাতের এদেশের কিছু সেরা ব্রাহ্মণ পন্ডিত বাস করেন। তাইনা?

তাজউদ্দীন উদাসিন কণ্ঠে জবাব দিলো–পন্ডিত কিনা জানি না। তবে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ওখানে বাস করেন।

সেকি! আমার বাবার তো ধারণা, এদেশে যতগুলো সেরা ব্রাহ্মণ আছেন, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন ওখানেই বাস করেন। ওরা যেমনই পন্ডিত, তেমনই শাস্ত্রজ্ঞ। ওদের তুলনা হয়না।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে তাজউদ্দীন বললো–আপনার বাবার কিছু কিছু এমন ধারণা আছে, যা আদৌ সত্যি নয়।

বলেনকি।

আমি নিশ্চিত ভাবে জানি বলেই বলছি। ওদের তুলনা হয়না ঠিকই, তবে কোন সত্য বা সুন্দরের দিক দিয়ে নয়। হীনমন্যতা আর কদর্যের দিক দিয়ে।

তাজ্জব ব্যাপারতো!

আমার বদনসীব! আমার দরবারটা আবার এদের নিয়েই।

কি রকম?

ওখানে একজন সত্যিকারের পন্ডিত ব্রাহ্মণ এসে ইদানিং বসবাস শুরু করেছেন। তাঁর আদব–আখলাক আর আচার ব্যবহার এত উন্নত মানের যে, ও এলাকার শুধু হিন্দুরাই নয়, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাঁকে সকলেই মনে প্রাণে ভাল বেসে ফেলেছে। এটা ঐ তুলনাহীন ব্রাহ্মণেরা সহ্য করতে না পেরে রাজ–দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ পেশ করেছে।

যদু নারায়ণ উৎসাহিত হয়ে বললেন–আপনি কি ত্রিহুতের রাজগুরু মহাদেব চক্রবর্তীর কথা বলছেন?

তাজউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিলো–হ্যাঁ–হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?



www.pathagar.com

সেটা পরে বলছি। আপনি যা বলতে চান, তা আগে শেষ করুন।

ত্রিহুতের তিনি রাজগুরু ছিলেন এটা ঠিক। তার সাথে এটাও ঠিক যে, তিনি সত্যিকারেরই একজন গুরু স্থানীয় ব্যক্তি। এমন একজন সদাশয় মানুষ চোখে পড়ে কদাচিত। কিন্তু বেচারার কি বদনসীব, তদন্তকারী ব্যক্তিটিও ঐ ব্রাহ্মণদের কুপরামর্শে ঘটনা সত্য বলে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। অন্তত তাই করেছেন বলে জানা গেছে।

যদু নারায়ণ অত্যাগ্রহে প্রশ্ন করলো–তাহলে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আসলেই মিথ্যা?

বিলকুল।

কি আশ্চর্য।

লোকজন তাঁকে ভালবাসে বলেই তাঁর কাছে সবাই যায়। এর অর্থ রাজার বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপানো নয়।

বটে।

যদি আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, তাহলে ঐ নিরীহ বেচারার ওপর কোন অবিচার যাতে না হয়, সেটা আপনাকে দেখতে হবে।

একথায় যদু নারায়ণ ক্ষুণ্ন হলো। সে আহত নয়নে তাজউদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সঙ্গে সঙ্গে সে কোন কথা খুঁজে পেলোনা।

কথা বললো যমুনা। সে ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো–এটা আপনি কি বললেন বন্ধু? এমন একটা ধারণা আপনার মনে এলো কি করে?

তাজউদ্দীন ঘাবড়ে গিয়ে বললো–এ্যাঁ!

এবার যদু নারায়ণ বললো–আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি মানে? এ আপনি কি বলছেন? আপনাকে চিনতে যদি এতটুকু ফাঁক থাকতো আমার, তাহলে এমন ভাবে দিল দিয়ে দোস্তী করতাম আপনার সাথে?

না মানে–

খবরদার দোস্ত, এ ধরনের বেদনাদায়ক উক্তি আপনার মুখ থেকে দ্বিতীয়বার যেন উচ্চারিত না হয়?

রাজকুমার কতকটা হুকুম করেই বসলো। তাজউদ্দীন হো হো করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো আচ্ছা বাবা। আমার মস্তবড় দোষ হয়েছে। এমনটি আর হবেনা। এবার বলুন, এ ব্যাপারে কিছু করার কোন এক্তিয়ার আপনার আছে কি না, বা মহারাজকে এ ব্যাপারে কিছু বলা আপনার পক্ষে সম্ভব কিনা?

তাজউদ্দীনের হাসিতে যদুনারায়ণের মনের আঁধার কেটে গেল। সে প্রসন্ন দিলে বললো–আরে এটা মহারাজকে বলতে হবে কেন? ব্যাপারটাতো আমার হাতে।

আপনার হাতে।

হ্যাঁ। রাজ কার্যের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে কিছু ছোট ছোট দায়িত্ব ইতিমধ্যেই বাবা আমার হাতে দিয়েছেন। এটা তারই একটা।

খুশীতে বিহবল হয়ে তাজউদ্দীন বললো–বলেনকি বন্ধু! নসীব আমার এত প্রসন্ন।



www.pathagar.com

যদু নারায়ণ বললো–তা যা–ই হোক, অভিযোগটা আমার কাছেই। কয়দিন আগে প্রতিবেদনও পেয়েছি। ওটা পেয়ে অবধি ভাবছি কি সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তা সিদ্ধান্ত তো পেয়েই গেলাম।

আচ্ছা।

শুধু সিদ্ধান্তই নয়, ঐ মিথ্যাবাদী তদন্তকারীকেও আমি দেখবো। ব্যাটাদের রাজকোষ থেকে মাইনে দেয়া হয় এইসব জালিয়াতি করার জন্যে?

তাজউদ্দীন ম্লান হাসি হেসে বললো–এইতো হলো প্রজার রাজাদের যোগাযোগ।

অদৃষ্টে কি আছে তা জানিনে। আমি যদি রাজা হই কোনদিন, এসবের মূল–উৎপাটন করে তবেই ছাড়বো। তা যাক, এবার বলুন– আর কিছু বক্তব্য আপনার আছে কিনা।

তাজউদ্দীন গম্ভীর হলো। একটু চিন্তা করে বললো–হ্যাঁ। আছে। ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। তবে বান্ধবী এর মধ্যে থাকলে কোন অসুবিধে নেই। কারণ ব্যাপারটা তারও জানা দরকার।

যদু নারায়ণ উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলো–কি, ব্যাপার কি বন্ধু?

তাজউদ্দীন বললো–আপনাদের জন্যে এটা একটা নাখোশ পয়গামই বটে। আপনার পিতার এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অচিরেই একটা ঝড় উঠতে পারে। এটা কাউকে বলার কথা নয় আমার। কিন্তু আপনি আমার বন্ধু। আপনাকে সাবধান করে না দিলে আপনার সাথে আমার বেঈমানী করা হবে–তাই বলছি। আমার একান্ত অনুরোধ, ঐ ঝড়ের সময় আপনি একটু সাবধানে থাকবেন এবং ঝড়ের সামনে দাঁড়াতে আপনি যাবেন না। আর সেই সাথে আমার এই বান্ধবীটিকেও আপনি পাশছাড়া করবেন না। বাদবাকীটা আমি দেখবো।

বন্ধু!

আর কিছু বলতে আমি পারছিনে বলে ক্ষমা চাচ্ছি। এই ঝড়ের আভাস সবাইকে আপনি দিলেও দিতে পারেন। শুধু একটা আমার অনুরোধ, এ আভাস আমিই আপনাকে দিয়েছি, এটা যেন তৃতীয় কারো কর্ণগোচর না হয়। তাতে লাভ কিছু হবেনা। হওয়ার মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতি পয়দা হবে, যা আমাদের এই বন্ধুত্ব খতম করে দেবে।

বন্ধু।

আমি এটা জানি জানলে, আপনার বাবা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব তিনি খতম করে দেবেন। অতএব আমাদের এই বন্ধুত্ব অটুট রাখা–নারাখা এখন আপনাদের ওপর নির্ভরশীল। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর করণীয় না করে গুনাহগার হওয়ার ভয়েই আমি যা জেনেছি, তা প্রকাশ করে গেলাম। এতে আপনার বন্ধুত্বটা হারানো ছাড়া আপাতত আর কোন লোকসান আমার দেখছিনে। আমি আশা করবো, আমার এই লোকসানটা আপনাদের দু'জনের কারো পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবেনা।

অপলক দৃষ্টিতে তাজউদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে যদু নারায়ণ বললো–বন্ধু, আপনাকে এ নিয়ে উতলা হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নেই। কারণ আপনি যা চাইবেন না, প্রাণান্তেও আমরা তা করতে কখনও পারিনে। তবে যাবার আগে আপনি অন্তত এটুকু জেনে আশ্বস্ত হয়ে যেতে পারেন যে, যে আভাস আপনি আমাকে দিলেন, এ ধারণা এবং বিশ্বাস অনেক আগে থেকেই



www.pathagar.com

আমার অন্তরে ছিল, আর একটু আগেও আপনার এই বান্ধবীর সাথে এ নিয়েই কথা বলেছি আমি। এমন একটা কিছু যে অবশ্যই ঘটবে এটা আমি আগে থেকেই মনে প্রাণে জানতাম। ঘটনার কিছু আগে আপনি তার আভাসটুকু দিয়ে গেলেন–এই যা। এটা নতুন বা বিস্ময়কর কিছু ব্যাপার নয় আমার কাছে। আর আপনার কাছ থেকেই আমি জেনেছি সেটা বলে বেড়াবার ব্যাপারও কিছু নয়।

বন্ধু!

আমার বাবা এখন এমনই এক মত্ত অবস্থায় আছেন যে, মাথায় তাঁর মুগুর মেরে বললেও এটা তিনি গণ্যের মধ্যেই আনবেন না, সতর্ক হয়য়াতো দূরের কথা। সেরেফ আমাদের দুর্ভাগ্য বই অন্য কিছু নয় এটা!

তাজউদ্দীন সব শেষে বললো–উনি আপনার পিতা। বন্ধুর উনি পিতা বলেই আমি কায়মনো প্রাণে চাইবো–আল্লাহ পাক তাঁকে যথাসত্বর সুমতি দান করুন।

## ১০

ছুটছে। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে অপরিসীম ধূলি উড়িয়ে প্রমত্তবেগে ছুটে চলেছে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর বাহিনী। গতি তার বাংলার দিকে। অসংখ্য সেনা–সৈন্য, হাতি–ঘোড়া আর যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী খোদ চলেছেন বাংলা মুলুকের দিকে। সঙ্গে আছেন জ্ঞানবৃদ্ধ কাজী শাহাবুদ্দীন জৌনপুরী। বাংলা মুলুকের মুসলমানদের বিধর্মীর জুলুম থেকে নাজাত দিতে যাচ্ছেন তাঁরা।

ত্রিহুতের মধ্যে দিয়ে পথ ধরেছেন ইব্রাহিম শর্কী। মুঙ্গগিরি বা মুংগের পেরিয়ে তেলিয়াগড় হয়ে শরকীগলির মধ্যে দিয়ে বাংলা মুলুকে প্রবেশ করবেন–এই তাঁর ইরাদা। নিশ্চিন্তে আর বিনা বাধায় এগিয়ে যাচ্ছে ইব্রাহিমের সুবিশাল বাহিনী। এমন সময় সামনে থেকে হাঁক এলো–সিপাহী! রোখ্ যাও। হুশিয়ার–

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বিশাল এই বাহিনীর প্রমত্ত গতি। হাঁক দিলেন সুলতান ইব্রাহিম শর্কীরই এক সালার। বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন তিনি। পথ নির্দেশনার ভার ছিল তাঁরই ওপর।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বাহিনীর সামনের দিকেই ছিলেন। তিনি সচকিত হয়ে কারণ তালাশ করতেই সেই আগ্রগামী সেনাপতিটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি কুর্ণিশ করে বললেন জাঁহাপনা, পথরুদ্ধ।

গর্জে উঠলেন ইব্রাহিম শর্কী–রুদ্ধ।



www.pathagar.com

সেনাপতি উত্তর দিলেন–জি হ্যাঁ, জনাব। এ দিক দিয়ে বাংলা মুলুকে যাবার তামাম পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কে সে দুর্বৃত্ত? কার এমন দুঃসাহস যে, ইব্রাহিম শর্কীর গতিপথ রুদ্ধ করতে আসে?

আমাদের অগ্রগামী গোয়েন্দা বাহিনী এই মাত্র খবর নিয়ে এসেছে, বাংলার রাজা গণেশের মনোরঞ্জনার্থে ত্রিহুত রাজ শিব–সিংহ তামাম রাস্তা রুদ্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সে তার বাহিনী নিয়ে আমাদের গতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে অদূরেই তৈয়ার হয়ে আছে।

মুক্ত হলো ইব্রাহিম শর্কীর কোষবদ্ধ অসি। হস্তি পৃষ্ঠ ত্যাগ করে তিনি লাফ দিয়ে তাঁর পার্শ্বস্থিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। বিপুল বেগে অশ্ব ছুটিয়ে অশ্ব বাহিনীর সামনে এসে হাঁক দিলেন এগিয়ে চলো–

ছুটতে লাগলো ইব্রাহিম শর্কীর অশ্বারোহী বাহিনী। খোদ ইব্রাহিম তার পুরোভাগে। পদাতিক ও হস্তি বাহিনী সরঞ্জামাদি সহ পড়ে রইলো পেছনে। উল্কার বেগে ছুটতে লাগলো বেশুমার অশ্ব। প্রতিটি অশ্বপৃষ্ঠে দুর্বার সৈনিক। প্রত্যেকের হাতে হাতে উত্থিত কৃপাণ। অসংখ্য অশ্বের দূরন্ত পদক্ষেপে ত্রিহুতের ধূলিকণা মেঘ হয়ে উড়ে উঠলো আকাশে। গ্রাস করলো দশদিক। নেমে এলো আঁধার।

সামনেই ছিল শিব সিংহের ফৌজ। শত্রুপক্ষের আগমন শব্দ পেয়েই "ব্যোম –ব্যোম শংকর" রবে আওয়াজ দিয়ে কোমরের অসি কোষমুক্ত করলো তারা। এর পরেই আওয়াজ "আল্লাহু আকবর"। বজ্রের গর্জ্জনের সামনে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্নাবৎ অতলে তলিয়ে গেল 'ব্যোম্–ব্যোম্ শংকর।

শৃগালের পালের ওপর সিংহের দলের মতো শিব সিংহের সীমিত ফৌজের ওপর হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইব্রাহিম শর্কীর অসংখ্য অশ্বারোহী ফৌজ। তাদের হাতের উত্থিত কৃপাণ এবার মহাক্রোশে নেমে এলো নীচে শিব সিংহের সেপাইদের গর্দান লক্ষ্য করে। একটু পরেই চলে এলো অবশিষ্ট বাহিনী। শুরু হল হলুস্থুল কান্ড। আর্তনাদে ভেংগে পড়লো শিব সিংহের সেপাইরা। ইব্রাহিম শর্কীর অসংখ্য ও দুর্জেয় জোয়ানদের সামনে এক দন্ডও টিকে থাকতে না পেরে আতংকগ্রস্ত অবস্থায় পেছন দিকে দৌড় দিলো শিব সিংহের ফৌজ। রণস্থল ত্যাগ করে আত্মরক্ষার নিমিত্তে তারা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে লাগলো প্রাণপণে।

শিব সিংহের ধারণা আগাগোড়াই ভুল। ইব্রাহিম শর্কীর ফৌজ যাচ্ছে বাংলা মুলুকে সুফী দরবেশদের পক্ষ নিয়ে লড়তে। তাঁর ধারণা, সুলতান ইব্রাহিম শর্কী তাঁর বিশাল বাহিনীর কিয়দংশ পাঠাচ্ছেন বাংলা মুলুকের মুসলমানদের সহায়তায়। গোটা ফৌজের কিয়দংশ। শিব সিংহের সঙ্গে আছে ত্রিহুতের সমুদয় শক্তি। একটা রাজ্যের গোটা বাহিনী নিয়ে একটা ফৌজের কিয়দংশের গতিরোধ করা বা একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া শিব সিংহের পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ হওয়ার কোন কথা নয়।

কিন্তু একি! মহাপরাক্রম ইব্রাহিম শর্কীর তামাম ফৌজের সামনে পড়লেন শিব সিংহ। সম্মুখে তলোয়ার হাতে ইব্রাহিম শর্কী স্বয়ং। ইব্রাহিম শর্কীর বাহিনীর এক দশমাংশেরও সমান নয় শিব সিংহের বাহিনী।



www.pathagar.com

বাঁচাও–বাঁচাও! রক্ষে করো শংকর! ইত্যাদি আর্তনাদে মুক্ত প্রান্তর মুর্ছা যেতে লাগলো। আতংকিত ত্রিহুতরাজ সেনাসৈন্য নিয়ে পড়িমরি ছুটতে লাগলো নিরাপদ আশ্রয়ে।

আত্মরক্ষার একটাই মাত্র আশ্রয় আছে ত্রিহুতে। লেহ্‌রা দূর্গ। একমাত্র এই লেহ্‌রা দূর্গ ছাড়া ইব্রাহিম শর্কীর আক্রোশ থেকে ত্রিহুত রাজকে হেফাজত করার আর দুস্‌রা ঠাঁই নেই।

দুর্ভেদ্য লেহরা দূর্গ। পাথর দিয়ে তৈরী তার আবেষ্টনী দেয়াল। অনেক বালা মুসিবত থেকে ত্রিহুত রাজকে রক্ষে করেছে লেহ্‌রা দুর্গ। অপরাজেয় লেহ্‌রা। সসৈন্যে পালিয়ে এসে এই দূর্গে আশ্রয় নিলেন শিব সিংহ। দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে ইব্রহিম শর্কী যা খুশী তা করুক। শিব সিংহ এবার তাঁর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। দুর্গম, দুর্ভেদ্য অজ্ঞাত আর পথ নিশানাহীন এই লেহরার কোন সন্ধানই পাবেনা ইব্রাহিম শর্কী। সন্ধান করে বেড়ানোর মতো এত অঢেল সময়ও তাঁর হাতে নেই এই মুহূর্তে।

কিন্তু আবারও শিব সিংহের ভুল হলো হিসাবে। সরাসরি বাংলা মুলুকের দিকে বাহিনী চালনা না করে ভেগে পড়া ত্রিহুত রাজের তালাশ করে বেরিয়ে কালক্ষয় করতে যাবেন ইব্রাহিম শর্কী। এটা কারো ভাবার কথা নয়। ভাবেওনি শিব সিংহ। অথচ সেই তালাশ করেই বেড়াতে লাগলেন ইব্রাহিম শর্কী। বাংলা মুলুকের অভিযান স্থগিত রেখে ত্রিহুত রাজের সাথেই দেনা পাওনা ফয়সালা করার কাজে লেগে রইলেন তিনি। এতবড় দুঃসাহস এই নরাধমের। বিনা উস্কানীতেই ইব্রাহিম শর্কীর পথ আগলানোর দুমর্তি যার হয়, তাকে উপেক্ষা করা নির্বুদ্ধিতা। মওকা পেলেই পুনরায় ছোবল মারবে দুরাচার। অতএব পাকড়াও করো বেতমিজকে।

কিন্তু একি! কোন দিকে ছুটতে ছুটতে কোথায় গেল শিবসিংহ? কোথায় তার ফৌজ! ভেলকিবাজীর মতো এক পলকে কেমন করে মিলিয়ে গেল দুর্বৃত্ত? খুঁজতে লাগলেন ইব্রাহিম শর্কী।

নসীব তাঁর প্রসন্ন। অধিক খুঁজতে হলোনা। অকস্মাতই পেয়ে গেলেন সন্ধান। ছিন্নভিন্ন লেবাসের অস্থি চর্মসার এক ভিখারী বৃদ্ধ আচনক ভাবে ইব্রাহিম শর্কীর সামনে এসে দাঁড়ালো। ইব্রাহিম শর্কীর দর্শন প্রার্থী এই নাছোড়বান্দা ভিখারীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে ইব্রাহিম শর্কীর সেনাপতি। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ছাড়া তার বক্তব্য সে অন্য আর কারো কাছেই প্রকাশ করতে রাজী নয়। অথচ বক্তব্য তার নাকি ইব্রাহিম শর্কীর বর্তমান স্বার্থেরই পরিপূরক।

ইব্রাহিম শর্কী তাজ্জব হয়ে দেখলেন–জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধটি অকুতোভয় দৃষ্টিতে একভাবে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা জড়তার লেশমাত্র ছাপ নেই তার চাহনীতে। যেমনই প্রখর তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার। ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর তার চোখে মুখে সুস্পষ্ট।

সুলতান ইব্রাহিমই মুখ খুললেন আগে। প্রশ্ন করলেন কি চাই?

জড়তাহীন জবাব এলো–সাহায্য।

বিরক্ত হলেন সুলতান। বললেন–সাহায্য। মানে ভিক্ষে?

বৃদ্ধের নজর তীক্ষ্ণ হলো। বলিষ্ঠ কণ্ঠে জবাব দিলেন, না। অর্থও নয়, বিত্তও নয়। আমি চাই মজবুত বাহুর সুনিশ্চিত মদদ।



www.pathagar.com

মদদ!

অনেক খোঁজের পর আজ দৈবাতই পেয়ে গেছি সেই মজবুত বাহুর সাক্ষাত। আমি বিশ্বাস করি, আমার এই দুর্ভাগ্য জনিত কারণে উদ্ভূত অগ্নুৎপাত পারলে এক আপনিই পারবেন নির্বাপিত করতে।

ইব্রাহিম শর্কী হতবাক। প্রশ্ন করলেন–কে আপনি?

উত্তর এলো–রাজা।

রাজা! কোন রাজ্যের?

ত্রিহুতের।

নাম?

দেবসিংহ।

সেকি!

ইব্রাহিম শর্কী চমকে উঠলেন। শানিত নজর হেনে বৃদ্ধটিকে দেখতে লাগলেন। চোখমুখ তাঁর আস্তে আস্তে খুশীর আভায় রোশনাই হয়ে উঠলো। ত্রস্তপদে বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে কর মর্দন করে বললেন–আপনিই সেই মহৎ প্রাণ রাজাধিরাজ দেবসিংহ?

একদিন হয়তো ছিলাম তাই। রাজা ছিলাম ত্রিহুতেরই। কিন্তু আজ আমি পথের রাজা।

কি আশ্চর্য! লোকমুখে শুনেছিলাম, পুত্রের হাতে নিহতই হয়েছেন আপনি!

আফসোসের আধিক্যে ক্ষণকাল বিরাম নিলেন দেবসিংহ। তার পর বললেন–হত্যা করারই হুকুম দেয় দুরাচার। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আর আমারই অন্নভুক ঘাতকের করুণায় প্রাণ রক্ষা হয় আমার। আমি নির্বাসনে চলে আসি। কিন্তু আফসোস্, আমাকে হত্যা না করে নির্বাসনে দেয়ার অপরাধে প্রাণ দিতে হয় আমার প্রাণকর্তা ঐ ঘাতককেই।

তারপর?

প্রতিকারের আশায় কত জায়গায় ঘুরলাম, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকারে মদদ দেয়ার সৎসাহস কোথাও খুঁজে পেলামনা।

আপনি সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন?

না, আগে হইনি। আজ হয়েছি।

আগে হননি কেন?

দেবসিংহ ক্লীষ্ট হাসি হাসলেন। বললেন–আমার স্বজাতিরাই কেউ আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন না, আপনার কাছে যাই আর কোন আশায়?

মানে!

মানে, আপনি বিজাতীয় হয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাইবেন–এ বিশ্বাস আমার তখন হয়নি।

আজ হলো কি করে? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ইব্রাহিম শর্কী। এটা লক্ষ্য করলেন দেবসিংহ। বললেন, কয়েকটি কারণে।

যথা?



www.pathagar.com

সবচাইতে বড় কারণ–আমি নাচাইতেই এবং আপনার অজ্ঞাতেই আমাকে সাহায্য করার কাজে একাগ্রভাবে লেগে আছেন আপনি। দুই, সাহায্য করতে আপনি যে অভ্যস্ত বাংলা মুলুকে আপনার এই অভিযানই তার প্রমাণ। তিন, যে কারণে আপনার এই বাংলা মুলুকে অভিযান, সে কারণ এই ত্রিহুতেও সমপরিমানে বিদ্যমান।

ইব্রাহিম শর্কী আগ্রহী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন–সমপরিমানে বিদ্যমান মানে? আর একটু খোলাসা করে বলুন।

দেবসিংহ ক্ষোভের সাথে বললেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন না যে, রাজা গণেশ বাংলা মুলুকে আপনার স্বজাতির যত রক্ত ঝরিয়েছে, আপনার স্বজাতির তার চেয়ে কম রক্ত দুরাচার শিবসিংহ এই ত্রিহুত রাজ্যে ঝরায়নি। সুফী শ্রেষ্ঠ মখদুম শাহ সুলতান হোসেনের প্রাণটাও এখন অনিশ্চিত। আবাস স্থল ছেড়ে তিনি এখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর আবাসস্থলের পাশেই এখন বধ্যভূমি তৈরী করা হয়েছে এবং মুসলমানদের ধরে এনে সেখানে বলি দেয়া হচ্ছে।

ইব্রাহিম শর্কীর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো। তিনি আহত কণ্ঠে বললেন দেবসিং হ!

দেবসিংহ বলেই চললেন–নাজাতের আশায় তারা তারস্বরে আর্তনাদ করে ফিরছে। আমি অস্থির হয়ে সে আর্তনাদ শুনছি। কিন্তু কিছুই করতে পারছিনে।

নিজেকে সংযত করতে গিয়ে ইহিমধ্যেই ইব্রাহিম শর্কী জড় পদার্থের মতো অসাড় হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। পরে দেবসিংহের নজরের ওপর তিনি স্থির করলেন নজর। ধীরে ধীরে বললেন আমার মদদ নিয়ে আপনার লাভ কি? আমার হাতে নিস্তার নেই শিব সিংহের। শিবসিংহের পতন ঘটলে ত্রিহুতের মসনদ তো আমার হাতেই আসবে। আপনার কি লাভ হবে এতে?

আবারও দেবসিংহ ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন–অনেক লাভ হবে। শুধু মুসলমানেরাই নয়। নিম্ন বর্ণের হিন্দু প্রজারাও নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে শিবসিংহের অধীনে। আমার এই একান্ত প্রিয় হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাদের সুখ শান্তি নিশ্চিত হতে দেখাটাই আমার কাছে মস্তবড় লাভ। এই বৃদ্ধ বয়সে মসনদের কোন মোহ আর আমার নেই। আমার প্রজাদের আপনি জালেমের জুলুম থেকে উদ্ধার করুন। এই আমার কামনা। আর এই জন্যেই আপনার মদদ চাই আমি, মসনদ পাওয়ার লোভ লালসায় নয়।

দেবসিংহের মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিলেন ইব্রাহিম শর্কী। চেয়ে থেকে বললেন দেব সিংহ।

শিবসিংহের পেছনে যে অভিযান শুরু করেছেন, অনুগ্রহ পূর্বক এটা অসম্পন্ন রেখে আপনি যাবেন না– এইটেই আমার সর্বশেষ ও সনির্বন্ধ আরজ।

এর জবাবে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন উত্তম। যদিও আমি নিজ গরজেই ধাওয়া করছি শিবসিংহকে তবু আপনাকে মদদ দান হিসাবেই এটা গ্রহণ করলাম আমি। ঐ দুর্বৃত্তের ফয়সালা না করে এখান থেকে আমি এক পাও নড়বোনা এবার আমাকেও খানিকটা মদদ দান করতে হবে আপনাকে।



www.pathagar.com

বলুন–

আপনি এই ত্রিহুত রাজ্যেরই রাজা। এখানে আত্মগোপনের কোথায় কোন স্থান আছে, তা আপনার জানা আছে নিশ্চয়ই। শিব সিংহ তার বাহিনী নিয়ে অকস্মাত কোথায় উধাও হয়ে গেল খোঁজ করে আর পাচ্ছিনে। রাজধানীতে যায়নি সে নিশ্চয়ই?

দেবসিংহের দুই চোখ চিকচিক করে জ্বলে উঠলো। তিনি প্রত্যয়ের সাথে বললেন–নিশ্চয়ই না। রাজধানী বা কোন নগর বন্দরে খোঁজ করলে তার সন্ধান মিলবেনা।

তাহলে?

লেহ্‌রা। সামনেই ঐ টিলাগুলোর ওপারে পাহাড় ঘেরা দূর্গ আছে একটা। নাম তার লেহ্‌রা দূর্গ। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই ওখানে ঠাঁই নিয়েছে দুর্বৃত্ত।

বটে।

বড় মজবুত এই লেহ্‌রা দূর্গ। একমাত্র ফটকটাই দীর্ঘদিনের অবহেলায় দুর্বল হয়ে গেছে। করি করি করেও আমার আমলেই মেরামত করা হয়নি। ওটা।

আচ্ছা।

একমাত্র ঐ ফটক ভাঙ্গা ছাড়া এর ভেতরে প্রবেশ অসাধ্য কাজ।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন– সিপাহী, হাতী হাঁকাও–

দেবসিংহের পথ নিদের্শনায় হস্তি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন ইব্রাহিম শর্কী। লক্ষ্য তাঁর লেহ্‌রা। কিছুক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পরই নজরে এলো লেহরা। দেব সিংহের ধারণাই ঠিক। এখানেই এসে আশ্রয় নিয়েছে শিব সিংহ। ভেতর থেকে দূর্গের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

দেবসিংহের উপদেশ উপেক্ষা করে প্রথমদিকে সেনাবাহিনী নিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করলেন ইব্রাহিম শর্কী। বাইরে থেকে অস্ত্র ছুড়ে শিব সিংহকে কাবু করার কসরত করলেন। কিন্তু প্রাচীরের ওপর ওঠার পথ না থাকায় সে অস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কাউকে আঘাত হানতে পারলোনা। প্রাচীরের পাশে হাতী ভিড়িয়ে হাতীর ওপর দাঁড়িয়েও ইব্রাহিম শর্কীর সেপাইরা সুবিধে করতে পারলোনা। প্রাচীরের ওপর মাথা তুলতেই ভেতর থেকে সমানে তীর বল্লম নেজা ছুটে আসতে লাগলো। দীর্ঘদিন দূর্গটাকে ঘিরে রেখে রসদ ফুরিয়ে দেয়ার মতো সময়ও ইব্রাহিম শর্কীর হাতে নেই। শেষ পর্যন্ত দেব সিংহের নির্দেশই মানতে হলো ইব্রাহিমকে। তাঁর নজর গিয়ে স্থির হলো সদর ফটকের ওপর। তিনি বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন সদর ফটক। হাঁকাও হাতী–।

সঙ্গে সঙ্গে তামাম হাতী হাজির হলো ফটকে। হস্তি বাহিনী হাঁকিয়ে ফটকের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হলো। মাথা বাধিয়ে হাতীর দল ঠেলতে লাগলো দুয়ার। অসংখ্য হাতীর প্রচণ্ড চাপ ফটকের মেরামতহীন দুর্বল দুয়ার সহ্য করতে পারলোনা। এক সময় সশব্দে ভেঙ্গে পড়লো লেহ্‌রা দূর্গের ফটক।

আল্লাহ আকবর রবে দশদিক মুখরিত করে সঙ্গে সঙ্গে প্লাবনের মতো দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো ইব্রাহিম শর্কীর অসংখ্য ফৌজ। ফটকের কাছে প্রতিরোধ গড়ে তুলেও শিবসিংহ এই



www.pathagar.com

প্লাবনের গতি রোধ করতে পারলো না। পতন ঘটলো দুর্গের। বন্দী হলো শিবসিংহ। সেনা বাহিনীর সাথে শিব সিংহের রক্তে সিক্ত হলো লেহ্‌রা দুর্গের ধূলিধূসর প্রান্তর।

অতপর ত্রিহুত রাজ্য রাজা দেবসিংহের হাতেই অর্পণ করলেন ইব্রাহিম শর্কী। মখদুম শাহ সুলতান হোসেনের আবাস স্থলের পাশে, অচিরেই এক সুবৃহৎ মসজিদ তৈরী করে দেয়ার আদেশ দিলেন দেবসিংহকে।

দেবসিংহ ভক্তিভরে পালন করলেন সে আদেশ। মখদুম শাহ–এর আবাস স্থলের পাশে এক সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য মসজিদ নির্মিত হলো। নয়া জিন্দেগী লাভ করলো দ্বারভাঙ্গার হিন্দু মুসলিম প্রজাকুল।

শিবসিংহের এই পরিণতির খবর সংগে সংগে বাংলা মুলুকে চলে এলো। প্রথমে মুখে মুখে। পরে আনলো শিব সিংহেরই এক অনুচর। খবর শুনে আঁতকে উঠলেন রাজা গণেশ।

ইব্রাহিম শর্কীর আগমন বার্তা কয়দিন আগেই রাজা গণেশ পেয়েছিলেন। ইব্রাহিম শর্কীর বাহিনী অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথেই রাজা গণেশের আজ্ঞাবাহী ত্রিহুত রাজ শিবসিংহ এ খবর তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন–সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর একদল ফৌজ যাচ্ছে বাংলা মুলুকে। ত্রিহুত রাজ্যের মধ্যে দিয়েই পথ ধরেছে ইব্রাহিম শর্কীর ফৌজ। বাংলা মুলুকের সুফী দরবেশদের পক্ষ নিয়ে পাণ্ডুয়া রাজের সাথে লড়তে যাচ্ছে তারা। সেই সাথে শিবসিংহ রাজা গণেশকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। কারণ ইব্রাহিম শর্কীর ফৌজের সামনে বাংলায় যাবার তামাম রাহা রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্বদেশেও ফিরে যাবার কিস্‌মত এদের হচ্ছেনা। শিব সিংহ স্বয়ং তাঁর ফৌজ নিয়ে তৈয়ার। ত্রিহুতের পথে ঘাটেই শেয়াল শকুনের আহার হচ্ছে ইব্রাহিম শর্কীর সেপাইরা।

বার্তা পেয়ে রাজা গণেশ চকিতেই একটু আনমনা হয়ে উঠে তখনই আবার মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন এ প্রসঙ্গ। বাংলার বাহিনী দুর্বল নয়। পথে তো শিব সিংহ আছেনই। ইব্রাহিম শর্কীর প্রেরিত একদল আনসার কি আর এমন বিপর্যয় আনবে তাঁর?

শিবসিংহের এই করুণ পরিণতির খবর যখন পাণ্ডুয়ায় এসে পৌঁছলো, রাজা গণেশ তখন দুই চোখে আঁধার দেখতে লাগেলন। প্রথম প্রথম এ খবরের সত্যতা তিনি মেনে নিতেই চাইলেননা। কিন্তু শিব সিংহের অনুচর এসে পূর্বাপর সব ঘটনা রাজা গণেশকে যখন জানালো–তখন রাজা গণেশের তামাম রক্ত বরফের মতো হিম হয়ে জমাট বেঁধে গেল।

অনুচরটি জানালো–প্রথমেই ভুল করেছেন শিবসিংহ। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ইব্রাহিম শর্কীর ফৌজের এক ক্ষুদ্র অংশ বাংলা মুলুকে আসছে। তাঁর এই ধারণার কারণেই প্রাণ দিতে হলো তাঁকে। ইব্রাহিম শর্কীর ফৌজের কোন ক্ষুদ্র অংশ নয়, ইব্রাহিম শর্কীর সর্ব বিদিত সেই বিশাল বাহিনীর প্রায় তামামটাই রওনা হয়ে আসছে। সাথে আছেন ইব্রাহিম শর্কী স্বয়ং। এ তথ্য আগেই যদি জানা থাকতো শিব সিংহের, তাহলে তঁকে এই ভাবে প্রাণ দিতে হতোনা। যখন তিনি জানলেন, তখন খেয়াতরী ওপারে।

ঝড়ের বেগে বাংলাময় ছড়িয়ে গেল এখবর। রাজধানীতে নেমে এলো আতংকের কালো ছায়া। সংবাদ গেল রাজা গণেশের পাত্রমিত্র শুভাকাঙ্খীদের কাছে। গণেশের মতো চমকে



www.pathagar.com

উঠলেন তাঁরাও। রাজকুমার যদু নারায়ণ ইদানিং পাণ্ডুয়ার রাজশক্তিকে হুঁশে আনার নিমিত্ত এবং মুসলমানদের ব্যাপারে একটা উদার নৈতিক নীতি গ্রহণের সুপারিশে, অনেকের কাছেই এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলো। রাজকুমার প্রদত্ত সেই ইঙ্গিতটাই চরম সত্যে পরিণত হলো দেখে সকলেই তাজ্জব হয়ে গেল। শিব সিংহের বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্রই তারা সবাই ছুটে এসে জড় হলেন দরবারে। শুরু হলো মন্ত্রনা।

মন্ত্রী নরসিংহ, সেনাপতি পূর্নেন্দু, সান্যাল প্রধান অবনীনাথ, নগর রক্ষী পীতাম্বর এবং আরো কয়েকজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ইব্রাহিম শর্কীর আগমন বার্তা প্রথম থেকেই উপেক্ষার সাথে নেয়ার জন্যে রাজা গণেশকে দোষারোপ করতে লাগলেন। তাঁদের বক্তব্য–ত্রিহুত রাজ শিব সিংহের আশ্বাসের ওপরই ভরসা করে না থেকে তখনই যদি বাংলা মুলুকের ফৌজ গিয়ে শিবসিংহের পাশে দাঁড়াতো, এই মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আর না হোক, ইব্রাহিম শর্কী এতটা সুবিধে করতে পারতোনা। এতে পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হতে পারতো। চাই কি, বাংলাদেশে তার এই অভিযানের আগ্রহেও ভাটা নেমে আসতে পারতো। কিন্তু এখন? এখন তার উৎসাহ বেড়ে গেছে দুইগুণে। আর একদিকে পাণ্ডুয়া রাজ একেবারেই একা। তার পাশে এসে দাঁড়াবার আর দ্বিতীয় শক্তি নেই। যে শক্তি দাঁড়াতে পারতো সেই শক্তিই এখন রাজা গণেশের চরমতম শত্রু। অর্থাৎ ত্রিহুত রাজ দেব সিংহ এখন রাজা গণেশকে বাগের মধ্যে পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব।

এরপর ইব্রাহিম শর্কীর বর্তমান লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। ইব্রাহিম শর্কী সত্যি সত্যিই বাংলাদেশে আসছেন, না এবারের মতো ত্রিহুত থেকেই ফিরে যাচ্ছেন স্বরাজ্যে–এসব তথ্য সংগ্রহ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গরম গরম কথাবার্তা হলো। সব শেষে বিতণ্ডা শুরু হলো–ইব্রাহিমকে ঠেকানোর প্রশ্ন নিয়ে। সত্যি সত্যিই যদি বাংলা মুলুকে আগমন ঘটে তার, তাহলে তার মোকাবেলায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে–এ ব্যাপারে একজনও অন্যজনের সাথে একমত হতে পারলেন না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করতে লাগলেন। কিন্তু যে পন্থাই যেদিক থেকে উপস্থাপিত হলো, সে পন্থার পরিণতি কারো দীলেই আশার উদ্রেক করলোনা।

ইবাহিম শর্কীর বাহিনী সুবিশাল না হলেও সান্ত্বনার কিছু ছিলনা। কারণ বাংলা মুলুকের তামাম মুসলমান একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সাথে শামিল হওয়ার এন্তেজারে। ওদিকে আবার ওঁৎ পেতে বসে আছে তৌহিদ বেগ। বহিরাক্রমণ শুরু হলেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেও। তাহলে উপায়।

উপায় উদ্ভাবনের আগেই বাংলা মুলুকে ঢুকে পড়লেন সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। সঙ্গে সেই সুবিশাল বাহিনী। বাহিনী দরবারে বসে উপায় উদ্ভাবনে মগ্ন ছিলেন দরবারীসহ পাণ্ডুয়া রাজ। পাণ্ডুয়ার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ছুটে এলো দরবারে। দরবারে ঢুকে জানালো–বিপর্যয় বর্ণণাতীত। মুক্ষগিরি হয়ে শরকীগলির পথ দিয়ে বাংলা মুলুকে ঢুকে পড়েছে ইব্রাহিম শর্কী। তার সৈন্য সংখ্যা এত যে, বাংলা মুলুকটা গোটাই মাথায় করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হিম্মত রাখে তারা।



www.pathagar.com

তার কথা শেষ না হতেই বাংলার পশ্চিম সীমান্তে নিয়োজিত গোয়েন্দাদলও ছুটে এলো পড়িমরি করে। এদের দলপতিও ঐ একই পয়গাম পেশ করে জানালো–প্রতিরোধের চিন্তাই ঘোর বাতুলতা। প্রাণ রক্ষার প্রচেষ্টাই এখন একমাত্র করণীয়।

দরবারীদের আখেরী সালাম জানিয়ে আতংক গ্রস্ত আগন্তুকেরা আতংকগ্রস্ত ভাবেই বেরিয়ে গেল দরবার থেকে।

সর্বশেষ খবর নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এলেন সেনাপতি শ্রী মাধব। ত্রিহুতের খবর শুনেই তিনি সীমান্তের দিকে ছুটেছিলেন। তিনি এসেই জানালেন–আর তিল পরিমাণ আশা নেই। পশ্চিম সীমান্ত গোটাই এখন ইব্রাহিম শর্কীর দখলে। সে এখন ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করেছে। ওটা এখন হিন্দুমুক্ত এলাকা। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ও এলাকার অধিকাংশ হিন্দুরাই অন্যত্র পালিয়েছে। কেউ কেউ আবার ঝোকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইব্রাহিম শর্কীর বাহনীর সামনে পড়েও নিহত হয়েছে বেশ কিছুটা।

একটু দম নিয়েই শ্রী মাধব ফের বললেন–সব চেয়ে যা আতংকের তাহলো–ইব্রাহিম শর্কীর মূল লক্ষ্য বাংলা মুলুকের মসনদ নয়। যে শক্তি তার সাথে আছে, তাতে মসনদ দখল করা তো তার এক পলকের ব্যাপার। তার মূল লক্ষ্য, পান্ডুয়ার রাজা ও রাজকার্যের সাথে জড়িত সমুদয় রাজন্যবর্গ। কারণ তাঁদের হাতেই এবং তাঁদের মন্ত্রণাতেই নিহত হয়েছে এদেশের অগণিত মুসলমান। তিনি সৈন্যদের মাঝে প্রচার করে দিয়েছেন–এঁদের মুন্ডুগুলো একসাথে স্তূপীকৃত অবস্থায় দেখতে চান তিনি।

দরবারের অবস্থা তখন অবর্ণণীয়। রাজ্য নয়, ধর্ম নয়, সেরেফ প্রাণটাই এখন বাঁচানো যায় কিভাবে, এই চিন্তায় অধীর হয়ে উন্মাদের মতো সকলেই হুলুস্থুল কান্ড ঘটিয়ে তুললেন। কেউ কেউ বসে বুক চাপড়াতে লাগলেন, নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন কেউ, কেউ কেউ উঠে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলেন। অধিকতর দূর্বল চিত্তের যাঁরা, তাঁরা আউরাতের মতো বিলাপ জুড়ে দিলেন এবং কেউ কেউ আবার আচমকাই দরবার কক্ষ ত্যাগ করে উর্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন বউ বাচ্চার সন্ধানে। অসহায় রাজার অবস্থা চিন্তা করার অবকাশ তখন আর একজনেরও রইলোনা। সবারই তখন "ইয়ানফ্সী–ইয়ানফ্সী" অবস্থা। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'–এই মর্মান্তিক হিতোপদেশ সবাই তখন কাজে লাগাতে ব্যস্ত।

এই সর্বশেষ খবর তৎক্ষনাৎ বেরিয়ে এলো দরবার কক্ষের বাইরে। এই বার্তা রাজ প্রাসাদে পৌঁছামাত্র গভীর শোকে আচ্ছন্ন হলো রাজ প্রাসাদ। অন্দর মহলে প্রচন্ড কান্নার রোল উঠলো। রাজ মহিষী পুনঃ পুনঃ মুর্ছা যেতে লাগলেন। আতংক, আর্তনাদ আর কোলাহলে ডুবে গেল রাজপ্রাসাদ।

বাইরের অবস্থাও হলো তদ্রুপ। হাহাকার নেমে এলো রাজধানীতে। ধর্ম যায়–প্রাণ যায়। হিন্দুকুল দিশেহারা। বিভ্রান্তির আধিক্যে অনেকেই ক্ষিপ্র হস্তে পোটলা পুঁটলী বাঁধতে লাগলো। ইব্রাহিম শর্কী সীমান্ত থেকে ভেতরে ঢোকার আগেই পালাতে হবে দেশ থেকে। কিন্তু যেতে হবে কোথায়, কেউ তা জানেনা। রাজধানী ছেড়ে ক্রমেই এ আতংক সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।



www.pathagar.com

শেষ হলো দরবার। পন্ড হলো বৈঠক। দিশেহারা পাত্রমিত্র নিজের চিন্তায় অধীর হয়ে একে একে সকলেই দরবার থেকে বেরিয়ে এসে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগলো। সমস্যা কি একটা। ইব্রাহিম শর্কীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছুটে কোন দিক থেকে কোন দিক যেতে আবার তৌহিদ বেগের হাতে পড়তে না হয়। তার সেপাইরা তো এখন সর্বত্র ওঁৎ পেতে আছে। বাল বাচ্চা নিয়ে এখন কি ভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, এই ধাঁধাঁয় পাত্রমিত্রেরা এক একজন এক একজনের সাথে মত বিনিময় করতে লাগলো। রাজা আর মসনদের হেফাজতির প্রশ্ন এখন তাদের কাছে একেবারেই গৌণ হয়ে গেল।

এ অবস্থায় পড়ে দিশেহারা রাজা আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কি তার করণীয় স্থির করতে পারলেন না। সুস্থির মস্তিস্কে এসে রাজার পাশে বসে সঠিক মন্ত্রণা দেয়ার একটা লোকও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুস্থির মস্তিষ্কও কোন লোকের ছিলনা তখন। না পাত্র, না মিত্র, না মন্ত্রী, না সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি–কারুরই। রাজাও দিশেহারা, তাঁরাও সবাই দিশেহারা। দোষই বা কাকে দেবেন তিনি। প্রতিরোধ শক্তি একান্তই যেখানে হীনবল, সেখানে কারই বা করার থাকে কি?

অন্দর মহলে ঢুকতেই ডুকরে উঠলেন মহিষী। আত্মীয় স্বজন ও রমণীকুল সবাই এসে ঘিরে ধরলো রাজাকে। সবার মুখে একই প্রশ্ন–তাদের এখন কি হবে? কি এখন তাদের করণীয়, এই প্রশ্ন তুলেই রাজা গণেশকে সবাই উম্মাদ করে তুললো। গণেশের কি করা উচিত এ শলা কেউ দিতে এলোনা। যা কিছু শক্তি আছে তাই নিয়ে গিয়ে তিনি রণক্ষেত্রেই মরবেন, না বাংলা মুলুক ছেড়ে অন্য মুলুকে দৌড় দেবেন, না ইব্রাহিম শর্কীর ফৌজের হাতে রমণীকুলের ইজ্জত লুট হওয়ার আগে সবাই মিলে উৎসব করে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেবেন–কিছুই তিনি স্থির করতে পারলেন না বা এব্যাপারে কেউ কিছু বাত্লে দিতেও এলোনা।

এলো রাজকুমার যদু নারায়ণ। সে এসে বাপের পাশে শান্ত হয়ে বসে বললো–বাবা, আমি আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। শুধু রাজপরিবারের কয়েকটা প্রাণের সাথেই বর্তমান সমস্যাটা সম্পর্কিত নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে অসংখ্য লোকের মরা বাঁচা আর তাদের রমণীকুলের মান–ইজ্জত। বৈদেশিক আক্রমণে ভিন জাতির হাতে একটা জাতি উৎখাত হয়ে গেলে সে জাতির আর অস্তিত্ব বলে কোন কিছু থাকেনা। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে বাধা দিতে গিয়ে শুধু নিজে মরে লাভ কিছু হবেনা। তাতে গোটা জাতির ভাগ্য একেবারেই অনিশ্চিত করে রেখে যাওয়াই হবে। তাই আমার বিবেচনায় এ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই পথ আছে। এপথ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা আমি দেখছিনে। অবশ্য তা করা যদি আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়।

অকুল পাথারে রাজা গণেশ কুলের সন্ধান পেলেন। অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন–বলো, কি সে পথ শিগ্গির বলো। রাজ্য ঐশর্য পড়ে মরুক, এ অবস্থায় অন্তত প্রাণটা বাঁচানোর পথও যদি থাকে কিছু, শিগ্গির তা বাতলাও।

যদু নারায়ণ বললো–এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে একমাত্র কাজ দরবেশ নূর কুতুব–ই–আলমের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁকে শক্তভাবে ধরা। পারলে একমাত্র উনিই পারবেন। – এই অবস্থা থেকে আপনাদের বাঁচাতে।



www.pathagar.com

রাজা গণেশ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন–মানে?

জবাবে যদু নারায়ণ বললো–আমি যতদূর জেনেছি, একমাত্র তাঁর কথাতেই ইব্রাহিম শর্কী বাংলা মুলুকে এসেছেন। এখন তাঁকে ফেরাতে হলে একমাত্র ঐ দরবেশই পারবেন ফেরাতে।

কথাটা যুক্তিযুক্ত হলেও রাজা গণেশ এতে উৎসাহিত হতে পারলেন না। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন–উনি কি তা করতে চাইবেন?

ধরার মতো ধরতে পারলে অবশ্যই উনি করবেন তা। ফকির দরবেশ মানুষ, তার ওপর এদেশেরই লোক। দেশবাসীর ওপর এদের দরদ অন্যের থেকে অনেক খানি আলাদা বলেই মনে করি।

কিন্তু–

ইতস্তত করে কালক্ষয় করলে এ চেষ্টা করার ফুরসুতটাও থাকবেনা বাবা। হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে বিলাপ করার চেয়ে, ফল কিছু হোক না হোক, চেষ্টাটা একবার করে দেখা উচিত।

এ কথাটা মনে ধরলো গণেশের। বয়সটা কম হলেও পুত্রতো। এই দুঃসময়ে তার চেয়ে অধিক কিছু কল্যাণকর অন্যে ভাবতে যাবেনা। পঙ্গুর মতো ঘরে বসে হা হুতাশ করার চেয়ে দৌড় ঝাঁপ করে চেষ্টা –চরিত্র করাটা সত্যিই অনেক শ্রেয়।

তখনই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে–রওনা হলেন সুফী হজরত নূর কুতুব –ই–আলম সাহেবের খানকা শরীফের দিকে।

সুফী হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেব খানকা শরীফেই ছিলেন। বাইরের দিকে দাওয়ায় বসে লোকজন নিয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করছিলেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর আগমনে সবার দীলে একটা আলাদা কিসিমের জোশ পয়দা হয়েছে। মুসিবত মুক্তির সম্ভাবনায় সবার মুখে রক্ত ফিরে এসেছে। সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর বাহিনীর সাথে সামিল হওয়ার ইরাদায় ইতিমধ্যেই অনেক আলেম মুসল্লী রওনা হয়ে গেছেন। বাদ বাকীরাও ঐ ইরাদায় তৎপর হয়ে উঠেছেন।

এই সময়ে খানকায় এলেন রাজা গণেশ। অত্যন্ত সাদা সিধে লেবাসে রাজা গণেশ নগ্নপদে এসে সুফী সাহেবের সামনে করজোড়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে সুফী সাহেবের মুখের দিকে চাইলেন এবং বললেন হুজুর, আমার অপরাধের সীমা নেই। আপনার কাছে আমি যে অপরাধ করেছি, তা ক্ষমার বিলকুল অযোগ্য। কিন্তু আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি বলেই মহাবিপদে পড়ে আমি আপনার কাছেই এসেছি। মেহেরবানি করে আপনি আমাকে বাঁচান। আমাকে উদ্ধার করুন।

সুফী সাহেব রাজা গণেশকে এভাবে অনুনয় করতে দেখে চিন্তা করলেন মনে মনে। বেচারা। কিন্তু এ মুলুকের তামাম মুসলমানদের জীবন বিপন্ন করে তুললে এতগুলো লোকের যে কি অবস্থা হয়। সে কথা একবারও ইনি ভাবেন নি।

রাজা গণেশের অনুরোধে ক্রুদ্ধ বা বিচলিত কোন কিছুই না হয়ে সুফী সাহেব শান্ত কণ্ঠে বললেন–আমি আপনাকে উদ্ধার করার কে? কাউকে উদ্ধার করার মালিক একমাত্র আল্লাহ



www.pathagar.com

পাক। তাঁর কাছেই আপনি মুক্তির আবেদন পেশ করুন। আপনার কৃতকর্মের খবর নিজেই আপনি জানেন। তবু আল্লাহ্ পাকের আর এক পরিচয় তিনি রহমানুর রহিম। আপনি যদি মা'ফি পাওয়ার হকদার হোন বা তিনি যদি সে মেহেরবানি আপনার প্রতি করেন, তাহলে অবশ্যই উদ্ধার আপনি পাবেন।

সুফী সাহেবের কথার মধ্যে রাজা গণেশ কোন আশার আলো দেখলেন না। এই অনুরোধ পেশ করার জন্যে সুফী সাহেব যে তাঁর প্রতি চরম নাখোশ হয়েছেন, তাও কিছু বুঝলেননা। তাঁর প্রতি নিরাসক্ত হয়ে সুফী সাহেব অন্যদিকে মনোনিবেশ করায় রাজা গণেশ হতাশ হয়ে পড়লেন। কে জানে, ইতিমধ্যে হয়তো সুলতান ইব্রাহিম শর্কী পাণ্ডুয়ার দিকে রওনা হয়েছেন। আর একটু পরেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে সব কিছু। রাজা গণেশ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি হু হু করে কেঁদে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন–দোহাই হুজুর, আপনার কাছে আমার সবিনয় প্রার্থনা–মেহেরবানি করে আপনি এই পাপীর পাপের খাতায় ক্ষমার কলম চালিয়ে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে এই দেশ বিজয় থেকে নিবৃত্ত করুন।

রাজা গণেশের আকুতিতে সুফী সাহেব গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–অসম্ভব। একজন অত্যাচারী বিধর্মীর পক্ষে সুপারিশ করে আমি একজন মুসলমান রাষ্ট্র নায়কের পথে দাঁড়াতে পারিনে। বিশেষ করে তিনি যেখানে আমার ইচ্ছা ও অনুরোধেই এসেছেন।

রাজা গণেশ উদ্ভ্রান্তের মতো আওয়াজ দিলেন–হুজুর।

সুফী সাহেব বললেন–আমি তাঁকে ডেকে এনে আমি তাঁকে ফিরে যেতে বলবো–এ কি করে সম্ভব? আমারই অনুরোধে তামাম কাজ ফেলে অত্যন্ত তকলিফ করে দীর্ঘপথ পেরিয়ে তিনি বাংলা মুলুকে এসেছেন। তাঁকে আমি নিরস্ত করতে যাবো কেন, আর তা করার আমার যুক্তিই বা কি? আপনি বাঁচার জন্যে আর্তনাদ করছেন আজ, অমনিভাবে বাঁচার জন্যে বাংলা মুলুকের তামাম মুসলমান আর্তনাদ করেছে সুদীর্ঘ দিন ধরে। যে আওয়াজ এত দিনেও কানে তুলেননি আপনি, সে আওয়াজ আজ একদিনেই আমি কানে তুলতে যাবো, এটা আপনি আশা করেন কি করে?

উপায়ান্তর না দেখে রাজা গণেশ সুফী সাহেবের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পায়ে তাঁর অবিরাম মাথা কুটতে লাগলনে।

চমকে উঠে সুফী সাহেব তাঁর পা'দুটি সরিয়ে নিয়ে শশব্যস্তে বললেন–আরে, করেন কি–করেন কি।

এইভাবে পড়ে থেকে রাজা গণেশ বললেন–আমি প্রতিজ্ঞা করছি, অতঃপর যা আপনি বলবেন, তাই আমি করবো। আপনার হুকুমের বাইরে আমি যাবোনা। তবু সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে আপনি ঠেকান। তাঁকে ফেরত যেতে বলুন।

বলেই পুনরায় উঠে। গিয়ে সুফী সাহেবের পায়ের ওপর পড়লেন। সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে গেলেন। এ অবস্থায় তিনি কি করতে পারেন ভাবতে লাগলেন।



www.pathagar.com

উপস্থিত মুসল্লীদের অনেকের মনও এতে নরম হয়ে এলো। রাজা গণেশের উপস্থিতি ও আরজ পেশের সময় থেকেই হাজেরান মজলিস প্রতিবাদের ঝড় তুলে অস্থিরতার সাথে নাখোশের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করছিলো। হেথা হোথা জটলা করে নানা জন নানারকম তিক্ত উক্তি করছিলেন। সে সব উক্তি ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো।

রাজা গণেশকে একবারেই নাছোড় বান্দা দেখে সুফী সাহেব বললেন–আপনাকে বাঁচিয়ে আমি মুসলমানদের মৃত্যুর কারণ হতে পারিনে। তাছাড়া উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারলে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে ফেরত যাওয়ার অনুরোধ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজা গণেশ পুনরায় মাথা কুটে বললেন আমি আপনার হুকুমের গোলাম। যা হয় পথ একটা মেহেরবানি করে বের করুন।

সুফী সাহেব থামলেন। একটু চিন্তা করার পর তিনি বললেন এখানে যুক্তি সঙ্গত ভাবে একটা মাত্রই পথ আমি দেখতে পাচ্ছি আর তা হলো–আপনার ইসলাম কবুল করা। তাতে বাংলা মুলুকে মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় আর সেই সুবাদে সুলতানের কাছে সুপারিশ করার উপযুক্ত কারণও একটা পয়দা হয়। কাজেই যতদিন পর্যন্ত আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করবেন, ততদিন আমার পক্ষে সুপারিশ করতে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

সুফী সাহেব অন্যত্র সরে দাঁড়ালেন।

প্রাণের মায়া বড় মায়া। মসনদের আকর্ষণ বড় আকর্ষণ। এর ওপর আবার রমণীকুলের ইজ্জত আর তাঁর স্বজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত আতংক তো আছেই। কিঞ্চিৎ চিন্তা করেই রাজা গণেশ এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে বললেন–তাই সই। হুজুরের আদেশ আমার শিরোধার্য। আমি ইসলাম গ্রহণ করতেই প্রস্তুত। আপনি আমাকে এক্ষুণি ইসলাম কবুল করান।

সুফী সাহেব বললেন–না, এইভাবে একটা ঝোঁকের মাথায় আপনি ইসলাম কবুল করতে চাইলেও আমি তা হতে দিতে পারিনে। আপনি এখন ফিরে যান। বাড়িতে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় বুঝে সুঝে আসুন। আপনি যখন শান্ত মস্তিষ্কে বুঝে এসে ইসলাম কবুল করতে চাইবেন, তখনই আমি আপনাকে ইসলাম কবুল করাবো। বাংলা মুলুকের তক্তে মুসলমান রাজা অধিষ্ঠিত দেখলে মুসলমানদের ওপর আর নির্যাতনের ভয় নেই। চিন্তা করে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীও অল্প কথায় ফিরে যাবেন, আমার বিশ্বাস।

নিতান্তই যুক্তি সঙ্গত কথা। দ্বিরুক্তি না করে রাজা গণেশ রাজ প্রাসাদে ফিরে এলেন। তিনি যখন অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তি পূজা শেষ করে ফুলের ঝুড়ি হাতে রাজ মহিষী দেবমন্দির থেকে বেরুলেন। রাজাকে দেখে রাজমহিষী ঐ অবস্থাতেই খবর জানতে চাইলেন। রাজা গণেশও ঐ অবস্থাতে মহিষীকে তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ইরাদার কথা জানালেন। শুনেই রাণী আর্তনাদ করে উঠে পুষ্প পাত্র হাতেই মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। জান–মান সব কিছুই দিতে তিনি রাজি, তবু স্বামীকে মুসলমান হতে দিতে তিনি কিছুতেই রাজী নন। স্বামীকে তাঁর বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে রাজ মহিষী রৌরব নরকে যেতে পারেন না।



www.pathagar.com

রাজরাণী তাঁর আচরণেই রাজপ্রসাদে পুনরায় হলুস্থুল কান্ড ঘটিয়ে তুললেন। তাঁর চীৎকারে আর আর্তনাদে আত্মীয় স্বজন ও নিকটবর্তী পাত্র মিত্র ছুটে এলেন। রাজা গণেশ সবাইকে পরিস্থিতি ব্যাখা করে শুনালেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজার সিদ্ধান্তই সকলে মেনে নিলেন। কিন্তু রাণীকে কেউ কিছুতেই রাজী করাতে পরলেন না। তার একই জিদ, আর যে মুসলমান হয় হোক, তিনি নিজের স্বামীকে কিছুতেই মুসলমান হতে দেবেন না। তার কথা অগ্রাহ্য করে তাঁর স্বামী যে মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করবেন, সেই মুহূর্তেই তিনি রাজ প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।

রাজা গণেশের সামনে পুনরায় নয়া সমস্যার সৃষ্টি হলো। কি এখন করবেন তিনি। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আর কিছুই স্থির করতে পারলেন না। সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলা থেকে ফেরত পাঠানোর একমাত্র বিনিময় বাংলার মসনদে মুসলমান রাজার অধিষ্ঠান। নিজে তিনি সুলতান হতে না পারলে, নিজের জান-মান আর ইজ্জত সহ তামাম বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও প্রাণের খাতিরে অন্য কোন মুসলমানকে বাংলার মসনদে বসিয়ে তাঁকে সপরিবারে প্রাসাদ ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। আর তাতেও যে এসব স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তার তরসা কি? নিজে মসনদে না থাকলে, তা হিন্দু হয়েই হোক আর মুসলমান হয়েই হোক, তাঁর পরিবার ও সম্প্রদায়ের জাতি ধর্ম মান ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান হবে-এনিশ্চয়তাই বা তাঁকে দিচ্ছে কে?

রাজা গিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ওদিকে ইব্রাহিম শর্কীর চূড়ান্ত খবর বয়ে আনলেন রাজ কুমার যদু নারায়ন। এই মুহূর্তে পান্ডুয়া রাজের পক্ষে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে সুস্থির মস্তিষ্ক অথচ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে সব কিছু অবলোকন করছে আর চারদিকের খবর নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে এসে জানালো-ফিরোজপুর থেকে আগামী কালই ইব্রাহিম শর্কী ছাউনি তুলে ফেলছেন এবং সরাসরি পান্ডুয়ার দিকে রওনা হচ্ছেন। অর্থাৎ পরশু দিনই পান্ডুয়া ইব্রাহিম শর্কীর করতলগত হচ্ছে। তার বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর অতিকষ্টে এ খবর সংগ্রহ করে এনেছে এবং নিজেও সে এগিয়ে গিয়ে যাচাই করে দেখেছে-এ সংবাদ সত্য।

শুনে বিকারগ্রস্ত অবস্থায় রাজা গণেশ মাথা কুটতে লাগলেন। একবার তার ইচ্ছে হলো-রাণীকে নিজ হাতে হত্যা করে তিনি গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইচ্ছে হলেই সব কিছু করা যায় না সব সময়। রাণীই যদি না থাকলো তো থাকলো কি? রাণী আর দুই পুত্র ছাড়া এ বিশাল রাজ প্রাসাদে সবাইতো তাঁর পর। কাজেই শয্যায় পড়ে রাজা গণেশ ছটফট করতে লাগলেন।

মন্ত্রী নরসিংহ অত্যন্ত চতুর লোক। রাজা গণেশ মুসলমান হলেই সব সমস্যার সমাধান হয় এ খবর পেয়ে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং এই কাজে রাজাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে পলায়মান অন্যান্য সভাসদের ডেকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ছুটে এলেন। মন্ত্রী ও সভাসদদের পুনরায় পাশে পেয়ে রাজা গণেশও আশান্বিত হয়ে উঠলেন এবং ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে এই অবস্থার প্রেক্ষিতে পরামর্শ দেয়ার জন্যে সবাইকে অনুরোধ জানাতে লাগলেন।



www.pathagar.com

সব কিছু শুনে মন্ত্রী নরসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর বললেন–রাণীমা যখন কিছুতেই মহারাজকে ধর্মত্যাগ করতে দেবেন না বা ইব্রাহিম শর্কীও যখন মসনদে মুসলমান সুলতান না দেখলে যাবেন না, তখন আর কারো আপত্তি না থাকলে, রাজপুত্র যদু নারায়ণকে ইসলাম কবুল করিয়ে নিয়ে মসনদে বসানো যায়। মহারাজের বয়সও এখন অনেক। আর কয়দিনই বা পারবেন তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে। বড় কুমার যদুনারায়ণকে অচিরে বসাতেই হবে মসনদে। কাজেই আমি মনে করি, বড় কুমারকে দরবেশের কাছে নিয়ে গিয়ে মুসলমান করে আনা হোক এবং মসনদে বসানো হোক।

উপস্থিত সকলেই এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন এবং এ প্রস্তাব অতি উত্তম প্রস্তাব বলে সমস্বরে আওয়াজ দিলেন। কিন্তু এখানেও আবার বেঁকে বসলেন সান্যাল গোষ্ঠীর প্রধান অবনীনাথ সান্যাল। তাঁর ভাবী জামাতা মুসলমান হয়ে গেলে তাঁর কন্যা যমুনার কি হবে। যদুর সাথে যমুনার বিয়ের ব্যাপারটা পাকাপোক্ত হয়ে আছে। সবারই এটা জানা। যদু নারায়ণ মুসলমান হলে তার কন্যার গতি হবে কি? মহারাজ মুসলমান হলে সমস্যা কিছু হচ্ছে না। মুসলমানের আওতা থেকে সরিয়ে জামাইকে তিনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখবেন। কিন্তু যদুই যদি মুসলমান হয় তাহলে? নৈকষ্য কুলীন বামুন হয়ে বাগদত্তা কন্যাকে তো অন্য কোথাও বিয়ে দিতে পারবেন না বা অন্য কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজীও হবেনা। ওদিকে আবার, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজী তিনি, কিন্তু নিজে বা তাঁর পরিবারের অন্য কেউ মুসলমান হবে এ কথা তিনি কল্পনা করতেও পারেননা। কাজেই অবনীনাথ সান্যাল প্রবল ভাবে না–না করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ টিকলোনা। অল্প কয়জন সমর্থক তাঁর সাথে থাকলেও, অন্দরের এবং বাইরের উপস্থিত তামাম মানুষের সমর্থন নরসিংহের পক্ষে গিয়ে পড়লো। সবাই মিলে এই উৎসাহই রাজা গণেশকে দিতে লাগলেন। এ পরামর্শে রাজা গণেশ সঞ্জীব হয়ে উঠলেন। নিঃসীম অন্ধকারে তিনি আলোকবর্তিকা দেখতে পেলেন। সকলের অনুরোধে এবং পরিস্থিতি আঁচ করে রাজরাণীও এর প্রতিবাদ করলেন না।

এখন সব কিছু নির্ভর করছে যদু নারায়ণের স্বীকৃতির ওপর। সকলেরই লক্ষ্য এখন এইদিকে নিবদ্ধ হলো। পিতার আহবানে যদু নারায়ণ এসে পিতার সামনে দাঁড়ালো। যদু নারায়ণ যমুনাকে সব সময় পাশে পাশেই রেখেছিল। যদুর সাথে সেও এসে সবার সামনে দাঁড়ালো। যমুনাকে সাথে দেখে অনেকেই হতাশ হলে পড়লেন। পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলেন। মন্ত্রী নরসিংহ সকলের অভিপ্রায় যদু নারায়ণকে ব্যাখ্যা করে শুনালেন। সব কথা শুনার পর যদু নারায়ণ নীরব হয়ে চিন্তা করতে লাগলো। সে ভেবে দেখলো, দেশ–জাতি ও স্বাধীনতার স্বার্থে এতে অসম্মতি জানানো সেরেফ একটা আহাম্মকী ছাড়া আর কিছুই নয়। এতো একটা অত্যন্ত মামুলী ব্যাপার। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এর চেয়ে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করা উচিত তার এবং মানুষ হিসাবে এটা তার কর্তব্য।

যদু নারায়ণের নিজের কিছু অসম্মতিই ছিলনা। শুধু একটা মাত্র অন্তর্দ্বন্দ্বই ভাবিয়ে তুললো তাকে–যমুনার কি হবে?



www.pathagar.com

এতটার পর এইভাবে তার পাশ থেকে সরে পড়লে, তাকে সে মুখ দেখাবে কি করে?

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর যদু নারায়ণ জিজ্ঞাসু নেত্রে যমুনার দিকে তাকালো। যমুনাও তার মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো। যদু কিছু বলার আগেই যমুনা তাকে উৎসাহ দিয়ে বললো–তোমার ইতস্তত করার কিছু মাত্র কারণ নেই। তুমি রাজী হয়ে যাও।

নিজের কানকে যুদ নারায়ণ বিশ্বাস করতে পারলোনা। বললো–রাজী হবো?

হ্যাঁ, হবে। ইতিমধ্যেই তা হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু–

এরপরও কিন্তু!

যমুনা সান্যাল আহত হলো। আহত কণ্ঠে বললো–তোমাকে আমি এর চেয়ে অনেক বড় মনে করি।

যদু নারায়ণ অস্ফুট কণ্ঠে বললো–যমুনা!

যমুনা সান্যাল ইষৎ হেসে বললো–ভাবছো কেন? যমুনা তোমার শুধু সুদিনেরই সাথী নয়, দুর্দিনেরও।

গর্জে উঠলেন অবনীনাথ সান্যাল। ধমক দিয়ে বললেন যমুনা।

জবাবে যমুনা সান্যাল বললো–নিজের স্বার্থ আর জিদটুকুকেই সব সময় বড় করে দেখা ঠিক নয় বাবা। এতগুলো মানুষের এহেন বিপর্যয়ে নিজের সামান্য স্বার্থটা ত্যাগ করাতে বা পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়াতে এমন কোন মারাত্মক ক্ষতি নেই বরং মহত্বই আছে।

সামান্য এক বালিকার বুকের এই জোশ্ আর দীলের এই জ্যোতি দেখে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ধন্য ধন্য রবে সঙ্গে সঙ্গে চারদিক মুখরিত হলো।

এবার জড়তাহীন কণ্ঠে যদু নারায়ণ বললো–আমি রাজী।

সবার দিলে আশার সঞ্চার হলো। আর তিলমাত্র কালক্ষয় না করে রাজা গণেশ তৎক্ষনাৎ যদু নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং অতি সত্বর এসে সুফী সাহেবের খানকা শরীফে হাজির হলেন। রাজাকে দেখে সুফী হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেব প্রশ্ন করলেন–আপনি কি আপনার সিদ্ধান্তে এখনও অটুট আছেন?

রাজা গণেশ করজোড়ে বললেন–সামান্য একটু পরিবর্তন এসেছে হুজুর। মূল সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। বাংলা মুলুকের মসনদে মুসলমান সুলতানই বসবেন। সামান্য যা পরিবর্তন এসেছে তা ব্যক্তি নিয়ে। আপনি আপনার মেহেরবানি ধারায় এটুকু পরিবর্তন ধুয়ে মুছে পবিত্র করে নেবেন, এই আরজই পেশ করতে চাই।

সুফী সাহেবের কপালে কুঞ্চন দেখা দিলো। তিনি প্রশ্ন করলেন–অর্থাৎ?

কম্পিত কণ্ঠে রাজা গণেশ বললেন–হুজুর, আমি এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছি। একেবারেই যইফ্ আদমী। তাই আমি এখন সংসারধর্ম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনুগ্রহ করে আপনি আমার এই পুত্র যদু নারায়নকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিন।



www.pathagar.com

ইসলাম কবুল করে যদু নারায়ণ দীর্ঘকাল ইসলামের খেদমত করতে পারবে এবং বাংলা মুলুকে মুসলমান শাসন কায়েম রাখতে পারবে।

সুফী সাহেব গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–হুঁ।

রাজা গণেশ কাতর কণ্ঠে বললেন–আমার এ নিবেদনটুকু রাখতেই হবে হুজুর। বহুৎ চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত সবাই মিলে নিয়েছি। আমার যা বয়স এখন, তাতে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে আমার। অধিক কাল বাঁচার কোন সম্ভাবনাই আমার নেই। অল্পদিনের মধ্যেই আমার যদি মৃত্যু ঘটে, আবার এই একই প্রশ্ন উঠবে। সব সমস্যার সমাধান একবারেই করে ফেলুন হুজুর। আমি মুসলমান না হয়ে আমার পুত্রকে মুসলমান করছি। এর মধ্যে ফাঁকও কিছু নেই।

সুফী সাহেব তবু কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। রাজা গণেশ তারস্বরে অনুনয় করেই চললেন। চোখ বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর, চোখ খুলে সুফী সাহেব গণেশ পুত্র যদুনারায়ণের মুখের দিকে এক ধেয়ানে তাকিয়ে থেকে যেন তার মুখমন্ডল পাঠ করলেন। এরপর তিনি যদু নারায়ণকে প্রশ্ন করলেন। তোমার পিতা যে ইরাদায় তোমাকে এখানে এনেছে তা তুমি জানো?

যদু নারায়ণ তাজিমের সাথে জবাব দিলো জি, জানি।

তোমার পিতার বাচনিক তুমি শুনেছো?

জি, শুনেছি।

তোমার কি অভিমত? তুমি কি ইসলাম কবুল করতে চাও?

জি, সর্বান্তকরণে চাই।

আবার একধেয়ানে যদু নারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন সুফী সাহেব। অনেকক্ষণ পর বললেন–আলহাম্‌দুলিল্লাহ্। তবে তাই হোক।

অতপর সুফী হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেব নিজের মুখ থেকে কিছু চর্বিতপান যদু নারায়ণের মুখের মধ্যে পুরে দিলেন এবং কলেমা পাঠ করিয়ে যথা নিয়মে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তিনি যদু নারায়ণের নাম দিলেন–জালাল–উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্।

পুত্রসহ রাজা গণেশ তড়িৎবেগে রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং ফিরে এসেই পুত্রকে রাজ্যভার ছেড়ে দিলেন। রাজপুত্র যদু নারায়ণ জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পান্ডুয়ার মসনদে আরোহণ করলেন। এ বার্তা সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যময় ঘোষণা করা হলো। রাজ্যময় তার নামে খোৎবা পাঠ করা হলো এবং মুসলিম আইনের পবিত্র বিধানগুলি পুনরায় চালু করা হলো। অনেকদিন পর আবার বাংলা মুলুকের মুসলমানদের অন্তরে শান্তির হিল্লোল বইতে লাগলো। হিন্দুরাও বিপদ মুক্তির আশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।



www.pathagar.com

## ১১

এবার সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের ওয়াদা রক্ষার পালা। খানকা শরীফ ত্যাগ করে তিনি সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সঙ্গে সাক্ষাত করার ইরাদায় ফিরোজপুরে রওনা হলেন। পরিকল্পনা মাফিক সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ছাউনি তুলে ফিরোজপুর ত্যাগ করে পান্ডুয়ার দিকে রওনা দিয়েছিলেন। কিয়ৎদূর এগিয়েই বৃদ্ধ দরবেশের এই পয়গাম পেলেন। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে রাহা বদল করতে হলো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই তিনজন আলেম ও পথ প্রদর্শক হিসাবে অগ্রভাগে ছিলেন সুফী সাহেবের পৌত্র শায়খ জাহিদ সাহেব।

ফিরোজপুর থেকে বেরিয়ে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর ফৌজ চুতুর্দিক প্রকম্পিত করে সামনের দিকে এগুতে লাগলো। কোন দিক থেকেই কোন প্রকার প্রতিরোধ না আসায় তারা অনায়াসে পান্ডুয়ার প্রায় কাছাকাছি এক স্থানে এসে উপনীত হলো। সামনেই এক নদী। ইব্রাহিম শর্কী পান্ডুয়া ফৌজের অবস্থান ও গতিবধির সন্ধান নেয়ার ইরাদায় ওখানেই ক্ষণ কালের জন্যে ছাউনি স্থাপন করলেন এবং গুপ্তচর বাহিনীকে সামনে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বাহিনী নিয়ে ইব্রাহিম শর্কী আসছিলেন পশ্চিম থেকে পূব দিকে। দরবেশ নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব যাচ্ছিলেন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। কিয়দ্দূর এগুতেই সুফী সাহেব সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর ছাউনির সামনা সামনি হলেন। আল্লাহ্ পাকের রহমে বৃদ্ধ দরবেশকে তকলিফ করে অধিক পথ অতিক্রম করতে হলো না। তিনি সরাসরি গিয়ে সুলতানের সারি সারি তাঁবুর সামনে দাঁড়ালেন।

দরবেশের আগমন বার্তা পেয়েই সুলতান ইব্রাহিম শর্কী তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। দুইহাত প্রসারিত করে সুফী সাহেবের কাছে এসে মোসাফেহা করতে করতে ভক্তিভরে বললেন-জনাব, আপনি কেন তকলিফ করে আমার সাথে মোলাকাত করতে এসে আমাকে গোনাহের ভাগী করলেন। আমার ইরাদা ছিল পান্ডুয়া জয় করার পরই নিজে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবো এবং এই খোশ পয়গাম আপনাকে আমি নিজ মুখে পেশ করে আপনার তৃপ্তির কারণ ও আপনার দোওয়ার হকদার হবো।

সুলতানের এ প্রশ্নের কোন জবাব দেবার আগেই, সুফী সাহেবের সঙ্গীদের অন্যত্র বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে সুলতান সুফী সাহেবকে সমাদরে টেনে নিজের খাশ তাঁবুতে নিয়ে গেলেন এবং তাজিমের সাথে বসার আসন পেতে দিলেন। পাশের তাঁবুতেই কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী সাহেব অবস্থান করছিলেন। সুফী সাহেবের আগমন সংবাদ শুনে উনিও ব্যস্ত ভাবে সুলতানের তাঁবুতে এসে হাজির হলেন। সুফী সাহেবের সাথে মোসাফেহা করতে



www.pathagar.com

করতে তাঁর তবিয়তের হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী তাঁকেও সমাদরে বসার আসন দিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করার পর এবং ব্যক্তিগত কুশলাদির বাৎচিৎ অন্তে সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব আসল কথায় এলেন। প্রথম দিকে একটু জড়িত কণ্ঠেই তিনি তাঁর প্রস্তাবটি উপস্থাপন করতে গিয়ে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে বললেন-সুলতানে আলা, আপনার কাছে আমার এই আগমন সেরেফ মোলাকাত করার উদ্দেশ্যেই নয়, মোলাকাত করার সাথে দুসরা একটা ইরাদাও আছে আমার। সে ইরাদার কথা ব্যক্ত করলে সুলতানে আলা সেটা কিভাবে গ্রহণ করবেন, এ নিয়েই আমি এখন পেরেশানীতে আছি।

শরমিন্দা কণ্ঠে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বললেন এ আপনি কি বলছেন জনাব? আপনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় জন। আপনার এমন কি বক্তব্য থাকতে পারে যা নাপছন্দ হবে আমার?

সুফী সাহেব তবুও ইতস্তত করে বললেন-আসলেই এটা একটা নাজুক প্রশ্ন। তবে সুলতানে আলাকে অত্যন্ত দরাজদীল জানি বলেই কিছুটা যা ভরসা।

ইব্রাহিম শর্কী অধীর হয়ে বললেন-বলুন-বলুন। এতে শরমিন্দা হবার কি আছে?

সুফী সাহেব এবার সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন-আর অগ্রসর না হয়ে সুলতানে আলাকে আমি এখান থেকেই স্বরাজ্যে ওয়াপস্ যাবার আরজ পেশ করছি।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ও কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী দুইজনের একজনও এ কথার মর্ম সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারলেন না, বা সুফী সাহেবের কথা শুনেও তিনি কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিস্ফারিত নয়নে সুফী সাহেবের মুখের দিকে উভয়েই চেয়ে রইলেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী দ্বিধার সাথে বললেন-তার অর্থ? আপনি কি বলতে চান, মেহেরবানি করে আর একটু খোলাসা ভাবে বলুন।

ধীর অথচ অবিচলিত কণ্ঠে সুফী সাহেব বললেন আমার কথা ঐ একটাই। আমারই অনুরোধে এতদূর পর্য্যন্ত আসতে আপনি যে তকলিফ ভোগ করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আল্লাহ পাকের কাছে এর জন্যে আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করছি। এক্ষণে আমার সবিনয় আরজ, বাংলা মুলুকের এই অভিযান এখানেই স্থগিত করুন এবং এখান থেকেই আপনি আপনার দৌলত খানায় ফিরে যান।

সুফী সাহেবের একথায় সুলতান ইব্রাহিম শর্কী এবং কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী উভয়েই আকাশ থেকে পড়লেন। উভয়ে উভয়ের মুখ চাওয়াচায়ী করলেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন -ফিরে যাবো মানে? রাজা গণেশকে উপযুক্ত শিক্ষাদান না করেই?

জি, এই আরজই আমার।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী এবার খানিকটা বিরক্তি বোধ করলেন এবং কাজী শাহাবুদ্দীনের দিকে অসহায় ভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরীও ক্ষুণ্ন হলেন। সুফী সাহেবের সততার মধ্যে সন্দেহের বীজ খুঁজতে লাগলেন। তিনি সুফী সাহেবকে প্রশ্ন করলেন-আপনি পান্ডুয়ার বর্তমান হুকুমাতের পক্ষ হয়ে এই সুপারিশ করছেন?

জি।



www.pathagar.com

এই হুকুমাতের পতন আপনি চান না?

জি-না।

তাজ্জব।

তাজ্জব হবার কিছু নেই। কারণ-

কারণটা থাক। আমি সোচ্ করে হয়রাণ হচ্ছি, আপনার তবিয়ত এখন আদৌ ঠিক আছে কিনা?

বিলকুল ঠিক আছে। আমি কোন অন্যায্য বা অসঙ্গত প্রস্তাব পেশ করিনি।

কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী এবার অনেকটা তিক্ত কণ্ঠেই বললেন-দরবেশ সাহেব, আপনি তো নিজেই স্বীকার করেছেন-সুলতানে আলা অত্যন্ত তকলিফ করে আপনার অনুরোধেই এতদূরে এসেছেন। অথচ সেই আপনিই এখন রাজা গণেশের প্রতিনিধি হয়ে তার পক্ষে সুপারিশ করতে এসেছেন। আপনার মতলব কি?

সুফী সাহেব ধীর অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন-আমি যখন অনুরোধ করেছিলাম তখন একজন অত্যাচারী বিধর্মী শাসক পাণ্ডুয়ার মসনদে বসে মুসলমানদের ওপর চরমভাবে নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন সুলতানের শুভাগমনের ফলে তার পুত্র ইসলাম কবুল করে মসনদে বসেছে। পাণ্ডুয়ার মসনদে এখন কোন হিন্দু রাজা নেই। মুসলমান সুলতান উপবিষ্ট। বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ করা আবশ্যক। কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়।

এ পর্যায়ে ইব্রাহিম শর্কী চরম ভাবে নাখোশ হলেন। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন-আপনার অনেক সুখ্যাতি আমরা দূর থেকে শুনেছি। কিন্তু আপনি যে আসলে এই-তা আমরা জানতাম না।

কাজী সাহেবের চোখে মুখে ঘৃণার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তা লক্ষ্য করে সুফী সাহেব ব্যথিত হলেও সংযত কণ্ঠে বললেন-'এই' মানে? 'এই' বলতে আপনি কি সমঝাতে চাইছেন?

কাজী সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন-আপনি কোন আল্লাহ ওয়ালা লোক নন। একজন নিতান্তই সওদাবাজ মানুষ আপনি। স্বার্থপর এবং লোভী।

সুফী সাহেবের দুইকান গরম হয়ে উঠলো। ফের তিনি নিজেকে সংযত করে বললেন-আল্লাহর দোহাই, যা বলেছেন, তা আর দুস্‌রাবার উচ্চারণ করবেন না।

কেন, করলে আমার কি হবে?

আর কিছু না হোক, আপনি অশেষ গুনাহ্‌র অধিকারী হবেন।

সে ভয় আর আমার দীলে জাররা পরিমাণও নেই। আপনাকে সঠিক ভাবেই চিনে ফেলেছি আমি। স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটার জন্যেই সুলতানে আলাকে আপনি ডেকেছিলেন। ইসলামের খেদমতের জন্যে নয়। এদেশের মুসলমানদের জন্যে কিছুমাত্র রহম আপনার দীলে নেই। আজ রাজা গণেশের তরফ থেকে সদ্‌কা কিছু পেয়েছেন বলেই দুইজনে পরামর্শ করে একটা



www.pathagar.com

সাজানো দৃশ্য তুলে ধরেছেন এবং গণেশের পক্ষ নিয়ে তদবির করতে এসেছেন। ছিঃ! বাংলা মুলুকের বিখ্যাত সুফী এমন একটা লোক! এই তার মন মানসিকতা!

দুই কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব ছটফট করতে লাগলেন। অসহায় কণ্ঠে বললেন-আমার একান্ত আরজ, মেহেরবানি করে থামুন, থামুন আপনি।

থামবো কেন? দরবেশ হিসাবে কি বিশেষত্ব আছে আপনার? সাধারণ লোভী মানুষের চেয়ে আপনি যে উন্নত মানের কিছু তার কি প্রমাণ দিতে পারেন? এমন কি অলৌকিক শক্তির অধিকারী আপনি যে, আপনাকে নিয়ে সংযতভাবে কথা বলতে হবে আমাদের?

আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর হাত নেই কারো। আর তাই জ্ঞানবৃদ্ধ কাজী শাহাবুউদ্দীন জৌনপুরী মুহূর্তের উত্তেজনায় বুজুর্গ দরবেশ সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের প্রতি এই ভাবে একেবারেই অজ্ঞানের মতো আচরণ করতে লাগলেন।

সুফী সাহেব আর্তনাদ করে বললেন-কাজী সাহেব।

কাজী জৌনপুরী ততোধিক উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন-এতই যদি সৎ আর আধ্যাত্মিক পুরুষ হন আপনি, তাহলে এক্ষুণি আপনাকে অলৌকিক কোন শক্তি প্রদর্শন করে তার প্রমাণ দিতে হবে। অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে এক্ষুণি আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি একজন কামেল পুরুষ, উদ্দেশ্য আপনার সৎ, মতলব আপনার মহৎ, কোন ধোকাবাজ বা সওদাবাজ লোক নন আপনি।

সুফী সাহেব এর কোন জবাব দিতে না গিয়ে শুধু কায়মনো-প্রাণে আল্লাহর কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন-হে পরোয়ারদিগার, সহ্য করার শক্তি দাও!

কাজী শাহাবুদ্দীন জৌনপুরী থামলে, সুলতান ইব্রাহিম শর্কী নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সাথে নাখোশ কণ্ঠে বললেন-বাংলা মুলুকের দরবেশ এখন তার নিজ রাস্তায় ওয়াপস্ যেতে পারেন। পান্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার আমার সময় বয়ে যাচ্ছে। আর কালক্ষয়ের অবকাশ আমার নেই।

সুফী সাহেব বললেন-না, আবার আমি সুলতানে আলার কাছে আরজ পেশ করছি-ইরাদা তাঁকে পরিহার করতে হবে।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কী শ্লেষের সাথে বললেন-পরিহার করতে হবে?

জি-হাঁ।

কেন?

আমি ওয়াদাবদ্ধ।

ওয়াদাবদ্ধ! কার কাছে? রাজা গণেশের কাছে?

জি হাঁ। আমি কথা দিয়েছি-পান্ডুয়ারাজ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং মুসলমান সুলতান হয়ে পান্ডুয়ার মসনদে বসলে, জৌনপুরের মহামান্য সুলতানকে অনুনয় বিনয় করে যেভাবেই হোক, ফিরিয়ে দেবো আমি।



www.pathagar.com

বটে?

রাজা গণেশ মসনদ ত্যাগ করেছেন এবং তৎপুত্র যদু নারায়ণ মুসলমান হয়ে পাণ্ডুয়ার মসনদে বসেছে।

জয় আমার করায়ত্বে! গোটা বাংলা মুলুকের সম্পদ আর সামান্য সময় পরই আমার। বাংলার মসনদের মালিক হবো আমি। আমার এতবড় লাভকে উপেক্ষা করে কেন আমি ওয়াপস যাবো?

কেন ওয়াপাস্ যাবেন, সেটা সুলতানে আলাই সোচ্ করে দেখবেন। শুধু আমি তাঁকে ইয়াদ করিয়ে দিতে চাই যে, যখন তিনি বাংলা মুলুকের মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে বিচলিত হয়ে ওঠেন, তখন বাংলার সম্পদ বা বাংলার মসনদের কোন গন্ধ তার মধ্যে ছিলনা। যখন তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তখন তাঁর লক্ষ্যের মধ্যে ইসলামের খেদমত ছাড়া, বাংলা মুলুকের মুসলমানদের জানমাল হেফাজত করা ছাড়া, অন্য কিছুই ছিলনা। তাঁর শুভাগমনের ফলে বাংলা মুলুকের স্বার্থের হেফাজত হয়েছে বলেই, বাংলার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে ওয়াপস্ যাবার অনুরোধ জানাচ্ছি। জেহাদ করে যে হেফাজতি নিশ্চিত করার কথা, বিনা জেহাদেই সেই হেফাজতি নিশ্চিত হলে ফিরে যেতে দোষ কি?

আবারও গর্জে উঠলেন কাজী শাহাবউদ্দীন। বললেন–আপনার সে অনুরোধ তিনি যদি না রাখেন, আপনার কথা শুনে পাণ্ডুয়ার মসনদ দখল না করে তিনি যদি না যান–তাতেই বা দোষ কি?

সুফী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–না, দোষের কিছু নেই। নিজের ভাবমূর্তি কেউ অক্ষুণ্ন রেখে না গেলে, অন্যের আর দোষ কি থাকে সেখানে? তবে আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডুয়া দখল করতে তিনি পারবেন না।

তার অর্থ?

তার অর্থ আমি ওয়াদাবদ্ধ। পাণ্ডুয়ায় যেতে হলে আমার লাশের ওপর দিয়েই যেতে হবে তাঁকে।

সুলতান এবং কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরী দুইজনই এক সাথে ব্যাঙ্গোক্তি করলেন–সওদাবাজী করতে যে অভ্যস্ত তার আবার ওয়াদা!

সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। কতকটা তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর মুখ থেকে বদদোয়া বেরিয়ে গেল। তিনি বললেন–দরবেশকে যারা এইভাবে তস্করের অধিক হেনস্থা করে, তাদের পতন অনিবার্য।

–বলেই তিনি ইব্রাহিম শর্কীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। অতপর সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর বাহিনীর সামনে এসে বাহিনীর গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এতে করে এবং ঠিক মুহূর্তে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর দীলের মধ্যে একটা ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি উম্মত্ত ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন।



www.pathagar.com

এরপর অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী তখনই ছাউনি তুললেন এবং পাণ্ডুয়ার দিকে না এগিয়ে দরবেশের প্রতি কটূক্তি করে ঘুরে দাঁড়ালেন, এবং জৌন পুরের পথ ধরলেন।

একটা মস্তবড় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আছে সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের পেছনে। বংশ তাঁর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ভাস্বর। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের লোক বলে বিবেচিত। সুফী সহেবের পিতামহ উমর বিন আসাদ খালেদী কোরায়েশ বংশের লোক। সুফী সাহেবের পিতা বিখ্যাত দরবেশ শায়খ আলাউল হক সাহেব ছিলেন গৌড়ের বিখ্যাত শাধক আখি সিরাজউদ্দীন দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার।

পারলৌকিক সম্পদের সাধনায় ইহলোকিক ঐশর্যের প্রতি এই পিতা পুত্রের তিল পরিমান আকর্ষণ ছিলনা। সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের পিতা শায়খ আলাউল হক সাহেব অত্যন্ত সম্পন্ন পরিবারের লোক হওয়া সত্বেও ঐশর্যের বাঁধন তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি আধ্যাত্মিক গুরু আখি সিরাজের সাথে দেশ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক গুরু আখি সিরাজের খেদমতে এহেন কাজ নেই যা করতে তিনি লজ্জাবোধ করেছেন। আখি সিরাজ যখন দেশ ভ্রমণে বেরুতেন, তখন তাঁর সাথে রান্না করা খাবার দেয়া হতো। খাবার গুলো সবসময় গরম রাখার জন্যে তাঁর অনুচরেরা শায়খ আলাউল হকের মাথায় চুলা বসিয়ে দিতো এবং সেই চুলার ওপর খাবার গুলো রাখতো। এইভাবে মাথায় করে গরম চুলা বয়ে বয়ে তিনি গুরুর সাথে ঘুরেছেন। আগুনের তাপে তাপে তাঁর মাথার চুলগুলো তামামই পুড়ে যায়। মাথার ওপর চুল্লী নিয়ে তাঁকে হামেশাই তাঁর আত্মীয় স্বজনের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে হয়-যাঁরা ছিলেন পাণ্ডুয়ার দরবারের মহামান্য উজির বা জবরদস্ত উমরাহ্। শায়খ আলাউল হককে কেউ এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখেনি।

তাঁর এই অপরিসীম আধ্যাত্মিক খ্যাতির কারণেই শায়খ আলাউল হকের খানকা শরীফ এতই মশ্হুর হয়ে ওঠে, যা দেখে পাণ্ডুয়ার তৎকালীন সুলতান সিকান্দার শাহ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। অসংখ্য ভক্তদের অপরিসীম শ্রদ্ধার নিবেদন স্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করেন তিনি এবং এই অর্থ তামামই তিনি অকাতরে সৎকাজে ব্যয় করেন। শায়খ আলাউল হক তাঁর খানকায় ছাত্র, পথিক ও ভিক্ষুকদের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং দুঃস্থ দরিদ্র লোকদের মধ্যে মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করেন। এইভাবে মানুষের সেবায় তিনি এত অর্থ ব্যয় করতেন যে সুলতানের পক্ষেও এত অর্থ ব্যয় করা সম্ভবপর ছিলনা। এতে সুলতান সিকান্দার শাহ ঈর্ষান্বিত হয়ে শায়খ আলাউল হককে পাণ্ডুয়া থেকে সোনার গাঁয়ে তাড়িয়ে



www.pathagar.com

দেন। যদিও নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুলতান তাঁকে আবার পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়ে আনেন, তবু সোনার গাঁয়ে গিয়েও দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করার সামর্থ ঘটে দরবেশ আলাউল হকের।

এই আলাউল হকেরই শিষ্য বা ছাত্র ছিলেন পাণ্ডুয়ার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ, দ্বার ভাঙ্গার দরবেশ মখদুমশাহ সুলতান হোসেন, এবং শিষ্য বা সহকর্মী ছিলেন জৌনপুরের বিখ্যাত দরবেশ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী।

বিখ্যাত দরবেশের সুবিখ্যাত পুত্র সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব কম যাননা নিজেও। আপনা ভাই আজম খাঁ সাহেব উজির ছিলেন পাণ্ডুয়ার। তাঁকেও উজিরের পদ গ্রহণ করার জন্যে সবিশেষ অনুরোধ রাখেন পাণ্ডুয়ার সুলতান ও তাঁর সহপাঠী গিয়াস উদ্দীন আজমশাহ। অনুরোধ রাখেন আপন ভাই আজম খাঁ সাহেব। সবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ফকিরের জীবন গ্রহণ করে পড়ে থাকেন খানকায়। অসহায় ও নিঃস্বদের খেদমতে বিলিয়ে দেন নিজেকে। যে দরবারে তাঁর আপন ভাই উজির, সেই দরবারের সামনে দিয়ে লাকড়ীর বোঝা মাথায় নিয়ে যাতায়াত করতে, চুল্লী মাথায় বাপের মতো, তিনিও কুণ্ঠিত হননি জাররা মাত্র। দরবারীদের সাথে বসে ভাইকে লাকড়ী টানতে দেখে উজির আজম খাঁ সাহেব যেমন ব্যথা পেয়েছেন অন্তরে, তেমনি সাধনা ও আদর্শের এই নজীরহীন দৃষ্টান্ত দেখে গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছে।

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গৌরবময় উত্তরাধিকার এই সুফী হজরত নূর কাতুব-ই-আলম সাহেব কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন কিনা, আল্লাহ মালুম, কিন্তু তাঁর মুখের কথা ফেলা যায়নি একটাও। ফেলা গেলোনা সুলতান ইবাহিম শর্কী ও কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরীর ব্যাপারেও।

কাঁকর ঢাকা পথ। টিলা পাহাড়ের চরাই-উৎরাই রাস্তা। তরুলতা বিহীন বন্ধ্যা মাটির ধূলিধূসর দিগন্ত। দ্বিপ্রহরের তীব্র দহনে দগ্ধ হয়ে রাত্রিকালের শীতে কাঁপে এ পথের চার পাশের মখলুকাত। গুল্মলতা ও ফসলাদি বিবর্জিত প্রান্তরে কদাচিত দু'একটি বিশীর্ণ বৃক্ষছাড়া শুধু পাহাড় টিলার ছড়াছড়ি। সমভূমির বুকভর্তি লাল মাটির আবির। বাংলা মুলুকের ছায়াশীতল শ্যামলিমার বিপরীত প্রকৃতির এই রুক্ষ পরিবেশ ডিঙ্গিয়ে, সামনে পিছে ধুলোর মাতম তুলে; নিজ মুলুকে ফিরে চলেছে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সুবিশাল বাহিনী।

ত্রিহুত রাজ্য বাঁয়ে ফেলে সরাসরি স্বরাজ্যের সোজা পথে এগিয়ে যাচ্ছেন ইব্রাহিম শর্কী। সুলতান ও কাজী সাহেব একই হাতীর পিঠের ওপর পাশাপাশি উপবিষ্ট। কারো মুখে কথা নেই। প্রফুল্লাতার লেশ নেই একজনেরও মুখ মন্ডলে। অনুশোচনায় ভুগছেন তাঁরা।

তাঁরা ভুল করেছেন -এখন এই একটাই মাত্র আফসোস্ তাঁদের দীলে। অপরিমিত সামর্থ থাকা সত্বেও এক উন্মাদের আচরণকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা মস্তবড় ভুল করেছেন। বাংলা মুলুকের অঢেল ঐশ্বর্য দুইহাতে না লুটে, তাঁরা তুলনাহীন আহম্মকীর নজীর স্থাপন করেছেন। লাঠি তার মাটি তার। নীতিরবাণী আউরাতের। দুর্বলের অবলম্বন। তাঁর কি? সেরেফ বেয়াকুফী ছাড়া আর কিছুই নয়।



www.pathagar.com

শক্তির গর্বে গর্বিত ইব্রাহিম শর্কী ঝোঁকের মাথায় ফিরে আসার এই গ্লানি হজম করতে পারছেননা। বাংলার মসনদ দখল করে বাংলার সম্পদ লুটে এনে তাঁর মরামাটির হাড্ডিসার নিরন্ন দেশকে ধন সম্পদে পূর্ণ করতে পারতেন তিনি। সেপাইদের একবার দেশমুখী করার পর তাদর ফের ফিরিয়ে নিলে বাহিনীর আর পূর্বজোশ থাকেনা। তাই এ কারণেই দুস্‌রা দফার চিন্তাভাবনা সামনে নিয়ে এ দফার ব্যর্থতা মেনে নিতে হচ্ছে তাঁকে। এই আহম্মকীর সংশোধন যতক্ষণ না করতে পারছেন তিনি, ততক্ষণ তার দীলে কোন শান্তি নেই।

কিছু আগে নিজ মুলুকে প্রবেশ করেছেন ইব্রাহিম শর্কী। আরো কিছুক্ষণ চলার পর ধাবমান বাহিনীর অগ্রভাগ থেকে আবার এক আচানক আওয়াজ এলো–সিপাহী, রোখ যাও, হুশিয়ার–

আওয়াজ দিলো বাহিনীর পথ প্রদর্শক অগ্রগামী সালার। আওয়াজ শুনেই দাঁড়িয়ে গেল হাতীঘোড়া–লোকলস্কর।

ভাঁজ পড়লো সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সুপ্রশস্ত ললাটে। এই বিরক্তিকর পথ পরিক্রমা অসহ্য ছিল তাঁর কাছে। এতে না আছে জয় করবার দুর্বার উন্মাদনা, না আছে বিজয়ের প্রশান্তি। পরাজিত সৈনিকের পিছু হটার শামিল এই তৃপ্তিহীন পথ চলার আশু সমাপ্তির এন্তেজারে ছিলেন তিনি। হঠাৎ এই আওয়াজে তিনি নিরতিশয় বিরক্তিবোধ করলেন। নিজের রাজ্যের অভ্যন্তরে এখন তাঁদের অবস্থান। এখানে কোন দুশমন এসে পথ আগ্‌লাবে তাঁদের? ঘটলো কি হঠাৎ–যার জন্যে এই কালক্ষয়?

ইব্রাহিম শর্কী অস্থির হয়ে উঠতেই সেই অগ্রগামী সালারটি সামনে এসে কুর্নিশ করে বললো–জাঁহাপনা, পথ বন্ধ।

ইব্রাহিম শর্কী গরম হয়ে উঠলেন। বললেন–বন্ধ!

সালারটি ব্যাখ্যা দিয়ে বললো–জাঁহাপনা, আমাদের অগ্রভাগে দুইটিলার মাঝখানের সমতল ভূমিতে এক মাজারকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের বাউল দরবেশের দল এসে আস্তানা গেড়ে বসেছে। অনেক যাযাবর আর কাঙাল মিস্‌কীন এসেও এখানে বসতি স্থাপন করেছে। এটা এখন যাযাবরদের এক জনবহুল বসতি, কোন খোলা ময়দান নয়। জাহাপনার হুকুম হলে, আমরা রাহা বদল করতে পারি।

ইব্রাহিম শর্কী নাখোশ কণ্ঠে বললেন–অর্থাৎ?

সালারটি বললেন–ডানদিকে ঘুরে সামান্য একটু এগুলেই আর একটা রাস্তা আছে। যদিও সেদিক দিয়ে রাজধানীতে পৌঁছতে খানিকটা বেশী সময় লাগবে, তবু ওটা ছাড়া দুস্‌রা কোন পথ আর সামনে আমাদের নেই।

প্রবল আপত্তি তুলে ইব্রাহিম শর্কী বললেন–অসম্ভব! এত ধৈর্য আমার নেই। সিধা চলো।

সালার এবার করজোড়ে বললো–হুজুর, মাযারটা একবারেই সামনে কোন এক অলি আউলিয়ার মাযার নাকি ওটা। আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর সংবাদ–ঐ মাযারকে কেন্দ্র করে দরবেশ–বাউল–যাযাবরেরা কি এক অনুষ্ঠানে মেতে আছে। সরাসরি এগুলে সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে। পদদলিত হয়ে মাযারটিরও অবমাননা হবে।



www.pathagar.com

ইব্রাহিমশর্কী হংকার দিয়ে উঠলেন। কোন মাযার দরবেশের প্রতি তাঁর আর শ্রদ্ধাবোধ নেই। তিনি সগর্জনে বললেন–খামোশ! সিধা চলো। অতিসত্বর ঘরে ফিরতে চাই আমি।

সালারটি এবার কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরীর দিকে তাকালো। সুলতানকে তিনি সুপারিশ করবেন–এই ছিল তার ধারণা। কিন্তু কাজী সাহেবও কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

অতএব সিধা চললো ইব্রাহিম শর্কীর বাহিনী। সালারটির আশংকাই সত্য হলো। অসংখ্য লোক লস্কার আর হাতী ঘোড়ার পদচারণায় নিশ্চিহ্ন হলো যাযাবর আর কাঙাল বাউলদের বসতি। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল মাযারে সজ্জিত আবেষ্টনী। অর্তনাদ আর চীৎকারে আতংকিত হলো দুই পার্শ্বের পাহাড় প্রতিম সুউচ্চ টিলাগুলি।

অতি সত্বর ঘরে ফিরবেন সুলতান আর কাজী সাহেব। কিন্তু সিধা পথ ধরেও ঘর তাঁরা পেলেন না। ঐ তেপান্তরের পথই হলো ঘর তাঁদের।

বাউলদের বস্তি ভেঙ্গে সামনে এসে একেবারেই ধুলার সাগরে পতিত হলো ইব্রাহিম শর্কীর বাহিনী। দুই একটি পাহাড় দূরে দূরে হেথা হোথা থাকলেও সামনে এক প্রশস্ত ধূলাকীর্ণ সমতল। সমতলটির উপরিভাগ অপরিমিত ধূলার অতি পুরু গালিচায় আবৃত। সালারটি কর্তৃক নির্দেশিত ডানদিকের রাস্তা ছিলো টিলা ঘেরা ধূলিমুক্ত কংকরময় পথ। এদিকটা তার বিপরীত। টিলা–কংকরহীন, ধূলা আর ধূলা।

এই প্রশস্ত সমতলের মাঝামাঝি একটি পাহাড়ের খানিক কাছে ইব্রাহিম শর্কীর কাফেলা যখন পৌঁছালো, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। দ্বিপ্রহরের প্রখর তাপে বাউড়ি বাতাস উঠতে উঠতে অকস্মাত শুরু হলো ধূলী ঝড়। মরুপ্রায় প্রান্তরে ধূলী–ঝড় মরুপ্রলয়ের চেয়ে খুব একটা কম মারাত্মক নয়। দেখতে দেখতে এই ধূলীঝড় এমন প্রমত্ত আকার ধারণ করলো যে, উর্ধ অধঃ–দশদিক আবৃত হলো ধূলায় এবং নিঃসীম অন্ধকার গ্রাস করলো প্রান্তরটি। ধূলী বালির দূরন্ত প্রবাহে লোকজন ও হাতীঘোড়ার নাক মুখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে করতে হাতী ঘোড়া লোকজন অন্ধকারের মধ্যে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলো।

বিচ্ছিন্ন হলো সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর হাতীও। ছুটতে লাগলো এদিক ওদিক। এগিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

ইতিমধ্যেই আর এক প্রমাদ ঘটে গেল। প্রবল ঝড়ে ধূলীর সাথে ধারালো এক বস্তু এসে ক্ষিপ্র বেগে ঢুকে গেলো ইব্রাহিম শর্কীর হাতীর এক চোখের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেল ইব্রাহিম শর্কীর হাতী।

উন্মত্ত অবস্থায় অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে করতে সমতল ভূমি ছেড়ে দিশেহারা হাতীটি ক্রমেই পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলো। অনেক ওপরে ওঠার পর হাতি এলো পাহাড়ের এক কিনারে। পা ফেলার ঠাঁই না পেয়ে আরোহী সমেত সুউচ্চ পাহাড়গাত্র থেকে গভীর এক খাদের মধ্যে সশব্দে পতিত হলো হাতীটি।

ঝড় যখন থামলো, তখন সবাই এসে দেখলো হাতীটির প্রাণ আছে তখনও। কিন্তু প্রাণ নেই সুলতান ইব্রাহিম শর্কী ও কাজী শাহাবউদ্দীন জৌনপুরীর বিধ্বস্ত দেহে।



www.pathagar.com

# ১২

ইসলামের অনুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাসি ফুটেছে তামাম বাংলার মুসলমানদের মুখে। খুশী হয়েছে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও। আর কিছু না হোক, বর্ণ হিন্দুদের উৎপীড়ন খর্ব হবে খানিকটা। হয়েছেও ইতিমধ্যেই। পাকুড়তলায় খামুশ হয়েছে উগ্রপন্থী বামুনেরা। বাকীর জন্যে বিষ্ণুপালকে তাকিদ দিতে হয়না বেশী। স্বস্তি পেয়েছে ধোপা নাপিত জেলেরাও। রজব আলীরা রাতে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কলু পাড়ায় পুনরায় ঘানি ঘুরছে সারারাত। কিষ্ণুপালের মুখে আবার ফিরে এসেছে গানের কলি– ও ভোলা মনরে–

বাঁশবাড়িতে তটিনীকে রুখে কে? উল্লাসের ঝড় বইছে দীলে তার। অত্যন্ত চাপাধরনের মেয়ে বলেই সে উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু ভেতরে তার এমন তুফান উঠেছে যে, নিজেকে আর ধরে রাখা নিজের পক্ষেই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিনের চাপাপড়া আকাঙ্খাগুলি আগ্নেয়গিরির লাভার মতো এক সাথে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। আজ আর তার ধর্মান্তরে বিপত্তি নেই। বাধা নেই তাজউদ্দীনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। শংকা নেই নয়া–জিন্দেগীর দীপ্ত পথে যাত্রা শুরু করতে।

কিন্তু সেই যে বেরিয়ে গেছে তাজউদ্দীন, আজতক আর ফেরেনি। তটিনীর পিতা সুরেশ্বর বিশ্বাস এর মধ্যে বাড়ি এসেছেন একবার। ইব্রাহিম শর্কীর আতংকেই তিনি পালিয়ে আসেন পাভুয়া থেকে। পরিস্থিতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসার আভাস পেয়েই আবার তিনি পাভুয়াতে ফিরে গেছেন। পিতার কাছেই তটিনী বিশ্বাস সব কাহিনী শুনেছে। ইব্রাহিম শর্কীর হামলার ফলে রাজপ্রাসাদের আতংকের কথা, সুফী হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেবের খানকা শরীফে মুসলমানদের তৎপরতার কথা এবং তৌহিদ বেগ নামক এক দুর্ধর্ষ রণবিদের অধীনে ছদ্মবেশী সেপাইদের জমায়েত হওয়ার কথা–সব কিছুই শুনিয়ে গেছেন সুরেশ্বর বিশ্বাস। রাজ কুমার যদুনারায়ণের ইসলাম গ্রহণ, তার মসনদ লাভ ও ইসলামী অনুশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণাও প্রচার হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে। তবু তাজউদ্দীন ফেরেনি।

ইব্রাহিম শর্কী ফিরে গেছেন। তৌহিদ বেগও অবশ্যই এত দিনে ছুটি দিয়েছেন ছদ্মবেশী সেপাইদের। তাহলে আর তাজউদ্দীন আটকে আছে কোন কাজে? এখনও তার না ফেরার কারণ কি? তবে কি অমঙ্গল ঘটেছে তার? ক্রমে ক্রমে এমনই একটা দুঃচিন্তার ধোঁয়া বিশ্বাস বাড়িতে ঘনীভূত হচ্ছে। এই চিন্তায় অধীর হয়ে একবার ঘর, একবার বাহির করে তটিনী বিশ্বাসের দিন গুজরান হচ্ছে। হর্ষ আর বিষাদের সম্মিলিত দোলায় তটিনীর দীল এখন দোল খাচ্ছে অবিরাম।



www.pathagar.com

সকলের সকল চিন্তার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ফিরে এলো তাজউদ্দীন। সে বাড়িতে এসে উঠতেই খোশদীলে ছুটে এলেন বিশ্বাসবাড়ির সকলেই। সুফী সাহেব সহ তাজউদ্দীন ও তার সহকর্মীদের এই কামিয়াবীর জন্যে সবাই তাঁরা অভিনন্দন জানালেন। মুহসীন বিশ্বাস এক রকম জড়িয়েই ধরলেন তাজউদ্দীনকে। যেন এক দুর্বার জেহাদে গাজী হয়ে ফিরে এসেছে তাজউদ্দীন। ইসলামের খেদমতে তাদের সকলের এই নিষ্ঠায় মুহসীন বিশ্বাস ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

পরিবারের সকলেই তাজউদ্দীনকে ঘিরে বাহির আঙ্গিনায় সমবেত হয়েছিল। খানিক পরে সকলেই লক্ষ করে দেখলেন সবাই আছেন সেখানে, নেই শুধু তটিনী। ব্যাপার কি, অনুসন্ধান করতে গিয়ে সকলেই তাজ্জব হয়ে দেখলেন–পরণের শাড়ি খাটো করে পরে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে তটিনী তখন তাজউদ্দীনের ঘরের ধুলো ঝাড়ায় মগ্ন। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকায় ময়লা জমেছে ঘরে। ঝি–চাকর লাগিয়ে পয়পরিস্কার না করলে ঘরে ঢোকা যাবে না। কিন্তু তাই বলে তটিনী কেন?

এটা লক্ষ্য করে মুহসীন বিশ্বাস অত্যন্ত খুশী হলেন। এমন একটা সত্যের সেবক আর জেহাদী মানুষের খেদমত করতে পারাটাও একটা পূণ্যের ব্যাপার। কিন্তু এটা দেখে লজ্জা পেলেন তটিনী বিশ্বাসের মা। মুখটিপে হাসতে লাগলেন তটিনীর মেঝো জেঠীমা মরিয়ম বিশ্বাস।

ধূলো বালি সাফ করে, বিছানা বালিশ পেতে দিয়ে, তটিনী বিশ্বাস বেরুতেই তাজউদ্দীন দুয়ারে এসে দাঁড়ালো। তটিনীকে একাজে আগেই সে দেখেছিলো। তবু না দেখার ভান করে বললো–একি! আপনি!

কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তটিনী বিশ্বাস বললো–ঘরের যা হাল হয়েছে, সাফ না করলে এখানে থাকতে পারে মানুষ?

তাতো বুঝলাম, কিন্তু আপনি কেন?

নইলে করবে কে? বি–গাঁ বি–ভূঁয়ে পড়ে আছেন, দেখার কাউকে এনেছেন আপনি সাথে করে?

মানে!

আমি না করলে, জেঠীমাকে করতে হতো। আমি জোয়ান মানুষ হাত গুটিয়ে বসে থেকে ঐ বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট করতে কেমন করে দেই?

কেন, কোন ঝি–চাকর–

থাকলে তো?

নেই?

নেই। আমাদের কালাচাঁদটা বাড়িতে নেই। মেঝো জেঠীমার ঝি'টা খুবই অসুস্থ। জেঠা মশায়ের লোকজন সব বাজারে। কাজটা করবে কে? জ্বীন–পরীতে?

তাজউদ্দীনের হাসি পেলো। সে হাসতে হাসতে বললো–তা জ্বীনে না করুক, পরীতেই তো করলো।



www.pathagar.com

পরী!

ডানাকাটা পরী।

এই আঁটশাঁট লেবাসে আজ আপনাকে সত্যি সত্যিই ডানকাটা পরীর মতোই লাগছে।

তটিনী এবার গর্জন করে উঠলো। বললো–এই, খবরদার!

ইতিমধ্যেই সেখানে এসে দাঁড়ালেন মরিয়ম বিশ্বাস। তটিনীকে এভাবে কথা বলতে শুনে প্রশ্ন করলেন–কি হয়েছে মা?

তটিনী বিশ্বাস হকচকিয়ে গেল। থতমত খেয়ে বললো–আপনার ছেলে! আপনার এই ছেলেটাকে আদব কায়দা একটু ভাল করে শিক্ষা দেবেন জেঠিমা। মানুষের একটা কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত। কষ্ট করে তার এত কাজ করে দিলাম, আর সে কি না আমাকে জীন, পরী, ভূত, পেত্নী–এ সব বলে গালি গালাজ করে বসলো?

মরিয়ম বিশ্বাস হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন আচ্ছা আচ্ছা, আমার যতটা সাধ্য, সে শিক্ষা আমি দেবো মা। বাদ বাকিটা তুমি দিয়ে নিও।

বিদুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালো তটিনী। নাখোশ কণ্ঠে বললো–এর অর্থটা কি দাঁড়ালো জেঠীমা? বাদবাকীটা আমি দিয়ে দেবো মানে? আমার এত ঠেকা?

ঐ একই ভাবে হাসতে হাসতে মরিয়ম বিশ্বাস বললেন–না, না। ও কিচু নয় মা। এমনি একটা কথার কথা বললাম। তা এসোতো মা, সারা গা তো ধুলোয় মেখে গেছে। গোছলটা দিয়ে নিয়ে আমাকে একটু রান্নাবান্নায় সাহায্য করবে এসোতো? ঝিটা আবার আরো বেশী কাতর হয়ে পড়ছে। উঠতেই পারেনি আজ।

যে পথে এসেছিলেন সেইপথেই চলে গেলেন মরিয়ম বিশ্বাস। সে দিকে চেয়ে দেখে তাজউদ্দীন টিপপনী কেটে বললো কি হলো, নালিশটা করে কি সুখ পেলেন?

হাসি হাসি মুখ করে তটিনী বিশ্বাস বাঁকা চোখে বললো–অনেক সুখ পেয়েছি। এরপর বাদ বাকিটা যখন শিক্ষা দেয়া শুরু করবো, তখন সুখ কাকে বলে সেটা আরো বেশী করে টের পাইয়ে দেবো।

কীল দেখিয়ে কথাটা শেষ করলো তটিনী। না বুঝার ভাণ করে তাজউদ্দীন বললো–বাদবাকী শিক্ষা মানে? ঠোঁট বাঁকিয়ে তটিনী বিশ্বাস জবাব দিলো–আহারে। একেবারে নাবালক! হাঁটি–হাঁটি পা–পা অবস্থা! জেঠীমা কি ইঙ্গিত করলেন–উনি কিছুই বুঝলেন না।

কি ইঙ্গিত করলেন উনি?

তটিনীর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগলো তাজউদ্দীন। তটিনী বিশ্বাস চোখ পাকিয়ে বললো–বটে। মনে মনে বজ্জাতি।

দুপুর বেলা আহার গোছল অন্তে তাজউদ্দীন তার বিছানায় বিশ্রামের আনযাম করছিলো, এই সময় পুনরায় তার ঘরে এলো তটিনী। বললো–মৌলভী সাহেব, জাত ইজ্জত সবই যে বরবাদ হয়ে গেছে আপনার, সে খবর কি রাখেন?

বিছানার ওপর বসে থেকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাজউদ্দীন বললো বরবাদ হয়ে গেছে মানে?



www.pathagar.com

মানে একদম খতম হয়ে গেছে। আমি তো একজন বিধর্মী। বিধর্মী হয়ে আমি আপনার মাছ তরকারী কুটে দিয়েছি, রান্নার পানি তুলে দিয়েছি, খড়ি-লাকড়ী বয়ে দিয়েছি। সেই পাকের সেই খানাই ভক্ষণ করেছেন আপনি। এর পরও আর জাত-ইজ্জত আছে?

তাজউদ্দীন হেসে বললো- না জেনে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খেলে ইজ্জত যায়না। এ ছাড়া পাকতো আপনি করেননি। পাক করেছেন আম্মা।

তবু আমার ছোঁয়া তো আপনি খেলেন?

বাজার থেকে মাছ-তরকারী কেনার সময় অনেক মানুষে ছোঁয়, মাছটাও ফের জেলেরাই ধরে।

তা না হয় হলো, এরপর আমাকেই যখন পাক করতে হবে তখন?

কেন? আপনি করবেন কেন?

না করলে করবে কে? অসুখ আরো বেশী হওয়ায় ঝি'টা বাড়ি গেছে। জেঠীমাও অসুস্থ বোধ করছেন। এবার? এবার করবেন কি?

তেমন হলে বড় আব্বার ওখানে গিয়ে খাবো।

কয়দিন? বড় আব্বা গঞ্জে গেলে ওরা একবেলা রেঁধে দুইবেলা খায়। ভগবান না করুন, মেঝো জেঠীমা সত্যি সত্যিই যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন?

রোজা রাখবো।

রোজা খুলতেও তো খাওয়ার প্রয়োজন হবে?

চিন্তা নেই। নিজেই গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকবো।

তবু আমার হাতের খাবেন না?

পাগল! বিজাতীয়া বিধর্মীর হাতে খেয়ে জাত খোয়াবো আমি?

এয়, গাল দেবেন না। খবরদার। জেঠীমাকে বলে দেবো কিন্তু।

দিন গে বলে। আমি ভয় করিনে।

বটে! জেঠীমা-ও জেঠীমা-

তাজউদ্দীনকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তটিনী বিশ্বাস মিছে মিছেই তার জেঠীমাকে ডাক দিলো। জেঠীমা তার অন্দরে এক ঘরের মধ্যে ব্যস্ত আছেন, এ ডাক তাঁর কান পর্যন্ত পৌঁছবেনা-তটিনীর এই ধারণা। কিন্তু তার বদনসীব। কি এক কাজে ঠিক এই সময়ই মরিয়ম বিশ্বাস এইদিকে এসেছিলেন। ডাক শুনে তাজউদ্দীনের দুয়ারের কাছে এগিয়ে এসে বললেন- কেন, কি হলো?

মুসিবত আর বলে কাকে! আবার ফাঁপরে পড়লো তটিনী। তাজউদ্দীন নতমস্তকে চুপচাপ বসে রইলো। জবাব দিতে দেরী হলেও বিপদ। তাই ঢোকগিলে তটিনী বিশ্বাস তাড়াতাড়ি বললো,এই আপনার ছেলে। আপনার ছেলে আবার আমাকে বিধর্মী বলে গাল দিচ্ছে।

কপট গাম্ভীর্যে মরিয়ম বিশ্বাস বললেন-এ্যাঁ! তাই?

হ্যাঁ। এখনই আমাকে বিধর্মী বলে চুপটি মেরে গেলো।



www.pathagar.com

ওহ্‌হো! তা হলেতো শিগিগরই এর একটা ব্যবস্থা নিতে হয় আমাকে। আর তো চুপ্ করে থাকলে আমার চলছেনা।

কথা খুঁজে না পেয়ে তটিনী বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ বললো–হ্যাঁ জেঠীমা, একটা কিছু করো।

অবশ্যই করবো মা। আর বলতে হবেনা আমাকে।

মুখের হাসি চেপে ওখান থেকে সরে গেলেন মরিয়ম বিশ্বাস। তাজউদ্দীন মাথা তুলে বললো–হয়েছে? মিটেছে সখ?

কটমট করে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেললো তটিনী।

পরের দিনই মরিয়ম বিশ্বাস তটিনীর মায়ের কাছে বসলেন। কথায় কথায় আসল কথা তুলে তিনি বললেন–ছোটবউ, আমি না বললেও তুমি জানো, ওদের দুইয়ের মধ্যে খুব ভাব। ওদের মেলা–মেশাটা ইদানিং ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এর একটা ব্যবস্থা না করলে তো নয়?

তটিনীর মা ভড়কে গেলেন। ভাবলেন, এদের এই মেলা মেশা পছন্দ করেন না মরিয়ম বিশ্বাস। বললেন–দিদি!

মরিয়ম বিশ্বাস বললেন–এতদিনে মেয়েটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তার এই আনন্দ তো আর নষ্ট করা যায় না। এ ছাড়া, ছেলে হিসেবেও তাজউদ্দীন এ মুলুকের সেরা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তটিনীর মা বললেন–সবই তো বুঝি দিদি। তাজউদ্দীন সোনার ছেলে। এ জুটির তুলনা নেই। কিন্তু আমাকে এখানে কি করতে বলছেন?

আগের সেই ভয়টা তো আর নেই। মসনদে এখন মুসলমান সুলতান বসেছেন। এবার তুমি তোমার মতটা দিলেই যা করার আমরাই করে নেবো।

তটিনীর মা ভাবতে লাগলেন। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন–তা কি করে হয় দিদি? মেয়ের বাপ থাকতে এতবড় একটা ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালা আমি কি করে করি?

মরিয়ম বিশ্বাস প্রতিবাদ করে বললেন–ওর বাপের আশায় থাকলে ফয়সালা এর কোন দিনই হবেনা। ওর বাপের যদি সেই চিন্তাই থাকতো, তাহলে আমার রুক্মিনীর ফায়সালাটা স্বচোক্ষে দেখার পর তটিনীর ব্যাপারে আর চুপ্ করে থাকতোনা। আর না হোক, অন্তত তটিনীকে আমাদের গোত্রে পার করে দিতে পারতো।

কিন্তু দিদি–

না বোন। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই ওর ওপর আমরা এইভাবে অবিচার করতে পারিনে। ওর জন্মটা নিছকই মিথ্যা করে দেয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। তাছাড়া ব্যাপারটা এখন সেরেফ একটা জীবন নিয়ে নয়, এক সাথে দুটো জীবন বরবাদ হওয়ার প্রশ্ন এখন জড়িয়ে গেছে।

তটিনীর মা অসহায় কণ্ঠে বললেন–তা কি আর বুঝিনে দিদি? কিন্তু ওর বাপ থাকতে–

মরিয়ম বিশ্বাস রুষ্ট কণ্ঠে বললেন–বাপ থাকতে বাপ থাকতে করছো কেন? তটিনীতো নাবালিকা নয়, সে এখন সাবালিকা। তোমাদের কোন তোয়াক্কায় না থেকে নিজের সিদ্ধান্ত ও নিজেই যদি নিয়ে বসে?



www.pathagar.com

তটিনীর মা দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে বললেন–তাহলে সেটা খুবই ভাল হবে দিদি। আমার অপেক্ষায় না থেকে তটিনীর সাথে কথা বলে যা হয় আপনারা করুন। আমি ওদের প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবো।

ছোট বউ।

জানেনই তো দিদি, সতীনের সংসার আমার। আমার মতেই সব কিছু হয়েছে শুনলে, একখানকে সাতখান করে লাগিয়ে কর্তার মেজাজ বিগ্‌ড়ে দেবে। তটিনীর নিজের ইচ্ছেতেই সব কিছু হয়েছে জানলে, কেউ কাউকে দোষ দিতে পারবেনা। আপনাদের ইচ্ছের বিপক্ষে আমি নই দিদি। আমাকে শুধু নিমিত্তের ভাগী করবেন না।

ব্যাপারটা নিয়ে মেঝো বউ মুহসীন বিশ্বাসের কাছে গেলেন। শুনেই মুহসীন বিশ্বাস আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন বলো কি বউমা। ওরা দুইজনেই আগ্রহী? তাইতো সেদিন তটিনী আপনা থেকেই মুসলমান হতে চাইলো। নির্বোধ আমি বুঝিনি। তাহলে ব্যাপারটা এই?

মুহসীন বিশ্বাস দিল খুলে হাসতে লাগলেন। মরিয়ম বিশ্বাস বললেন–হ্যাঁ বড় ভাই। সেই জন্যেই তো বলছি। কিন্তু–

মুহসীন বিশ্বাস মাথা নেড়ে বললেন–না–না, এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। সৎকাজ যত সত্বর সমাধা হয় ততই উত্তম।

তটিনীর মা যে ছোট মিয়ার ভয় করছে–মানে তটিনীর বাপ যদি এতে গোস্বা হয়, সেই ভয় করছে। তার মতামত না নিয়ে কোন কিছু করা হলে ছোট মিয়া যদি–

মুহসীন বিশ্বাস বীরত্বের সাথে বললেন–আরে রাখো তোমার ছোটমিয়া। তটিনীর অভিভাবক সুরেশ্বর একাই? আমি কেউ নই? আমি যদি কিছু করি সুরেশ্বরের সাধ্য আছে তার বিরুদ্ধে কথা বলে? করবো আমি। বলুক দেখি কথা?

কিন্তু–

বউমা, তুমি অনেকদিন আগে এবাড়িতে এসেছো। সুরেশ্বর বলো, বীরেশ্বর বলো, কাউকে কোনদিন দেখেছো আমার মুখে মুখে কথা বলতে? আমার চোখের দিকে তাকাতে? হুঁ–হু–বাবা। ভাই কার, দেখতে হবে তো? মুহসীন বিশ্বাসের ভাই বলে কথা। অমন বেয়াদপ কেউ তারা ছিলনা, হতেও পারেনা। খামাখা তোমরা ভাবছো কেন?

তা হলে এখন– মুহসীন বিশ্বাস উৎসাহ দিয়ে বললেন–কিচ্ছু ভেবোনা। সব ব্যবস্থা আমি করবো। আগে বর–কনে–এদের নিয়ে বসতে হবে একটু। ওদের একত্র করে দাও, যা করার আমি করছি।

বর–কনের মতামত যাচাই করার পর মুহসীন বিশ্বাস সবাইকে নিয়ে স্থির করলেন–আগামী পরশু শুক্রবার। ঐদিনই তটিনীকে ইসলাম কবুল করানোর পর বিয়ে পড়ানো হবে।

তাজউদ্দীন আর তটিনী অধীর আগ্রহে ঐ শুক্রবারের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। মাঝে আর একটা মাত্র দিন। তবু দিন যেন যায়না। ঐ একটা দিনই হঠাৎ করে এক বছরের সমপরিমান দীর্ঘ হয়ে গেল। সময়ের গতি হলো শম্বুকবৎ। একটুও এগোয়না। দুপুর হলে সাঁঝ লাগেনা। সাঁঝ লাগলে রাত পোহায়না। রাত পোহালে ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে যায় সকালটা। বেলা আর নড়েনা।



www.pathagar.com

পাত্রপাত্রী কেউ আর এখন কাছাকাছি হয়না। দূর থেকে দুইজনই দুইজনকে দেখে আর চোখে চোখ পড়লেই দুইজনই দুই জনের প্রতি শিশুর মতো ভেংচি কাটে।

অবশেষে এলো সেই শুক্রবার। মুয়াজ্জীনের সুললিত কণ্ঠের আজান ধ্বনির সাথে সাথে ভোর হলো শুক্রবারের। ঘুমভাঙ্গার সাথে সাথেই এক অনাস্বাদিত শিহরণে রোমাঞ্চিত হলো তাজউদ্দীন ও তটিনী–উভয়েরই অন্তর।

ঘুমভাঙ্গার পরও তটিনী বিশ্বাস শয্যার ওপর পড়েই রইলো কিছুক্ষণ। খানিকপর সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর দিলো। পূব আকাশে তখন সোনালী থালার উঁকি দিচ্ছে সূর্য। বিচ্ছুরিত আলোর রক্তিম আভায় রোশনাই হয়ে উঠেছে সামনের দিগন্ত। পলকহীন নেত্রে এই দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইলো তটিনী। দীলেও তার উঁকি দিচ্ছে নয়া জিন্দেগীর সূর্য। সে সূর্যের আভায় রোশনাই হয়ে উঠেছে তটিনীর মুখমন্ডল।

ফজরের নামাজ আদায় করে এসে তাজউদ্দীন কোরান শরীফ খুলে বসলো। কিছুক্ষণ কোরান তেলায়েতের পর সে বেরিয়ে এসে বাইরের বারান্দায় বসলো। অতপর সক্রিয় হলো–তার চক্ষুকর্ণের কর্মশক্তি। উদ্দেশ্য–তটিনীর দর্শনটা কিঞ্চিৎ যদি পাওয়া যায়–কিংবা যদি শোনা যায় তার বিমোহিনী কণ্ঠের সুমধুর আওয়াজ।

আওয়াজই শুনতে পেলো তাজউদ্দীন। আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলো। তবে এ আওয়াজ তটিনীর নয়। এ আওয়াজ–এইযে, খেলার খেলা পায়রা খেলা,

দ্যাখ্‌নেওয়ালা দ্যাখ্ এ বেলা,

খেলছে খেলা ভুলুর চেলা–

বাজীকরকে দেখেই তার কাছে ছুটে গেল তাজউদ্দীন। তাজউদ্দীন কাছে আসতেই নীচু অথচ ব্যস্তকণ্ঠে বাজীকর তাকে বললো–অবস্থা খুব খারাপ। বড় খতরনাক পরিস্থিতি। আপনি শিগগীর বেরিয়ে আসুন।

বলেই সে খেলা দেখানোর বদলে এইযে, খেলার খেলা পায়রা খেলা' হাঁকতে হাঁকতে ত্রস্তপদে ওয়াপস্ গেল। আরো অনেকের কাছে পয়গাম পৌছাতে হবে তাকে।

তাজউদ্দীন হতভম্ব। এখন কি করবে সে। ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলো। নাস্তার ওয়াক্ত হয়ে এলো। একটু পরেই শুরু হবে অনুষ্ঠান। এখন উপায়। বিয়ে বউ এর মধ্যে ঢুকলে তো আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার উপায় নেই। পরিস্থিতি খতরনাক্ হলে নয়া জিন্দেগীর স্বাদই বা সে আস্বাদন করতে পারবে কি? ইতিমধ্যেই কানে এলো আর এক আওয়াজ–'সারে জাহানের মালিক আল্লাহ তুমিছাড়া আর মাবুদ নেই .....।'

একতারা বাজিয়ে ভিন্ন রাস্তা বেয়ে বিশ্বাসদের বাহির আঙ্গিনায় গীত কণ্ঠে হাজির হলো সোনা বাউল। তারও গতি ত্রস্ত। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে দু'এক পয়ার গান গেয়েই সে থেমে গেল। ইনাম দেয়ার অছিলায় তাজউদ্দীন সামনে এলে নেয়া–দেয়ার ফাঁকে সোনা বাউল তাজ উদ্দীনের হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে গীতকণ্ঠে আবার অন্যদিকে চলে গেল।

পর পর তাকিদ। চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকলো তাজউদ্দীন। ছোট্ট একটা চিঠি। কয়েক ছত্র লেখা। লেখা দেখলেই বোঝা যায়–খুব ব্যস্ততার মধ্যে লেখা হয়েছে চিঠিখানা। বাহালুল খাঁ লিখেছে–



www.pathagar.com

উস্তাদ, বিগ্‌ড়ে গেছে রাজা গণেশ। অবস্থা খুব জটিল। আমি পাণ্ডুয়াতে ছুটলাম। খবর নিয়ে আজই ফিরে আসবো। আপনি সোজা খানকা শরীফে চলে আসুন। এক্ষুণি। –বাহালুল খাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো তাজউদ্দীনের দুই চোখ। আর সে বিয়ের নওশা নয় এখন। এখন সে সৈনিক। বলে–কয়ে যাওয়া আজ দুঃসাধ্য। ক্ষিপ্র হস্তে কয়েক ছত্র কথা সে এক টুকরো কাগজের ওপর লিখলো। সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং বিয়ের দিন পিছিয়ে দেয়ার অনুরোধ করে লেখা এই কাগজ খানা বিছানার ওপর এক টুকরো পাথর চাপা দিয়ে রেখে সকলের অলক্ষ্যে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লো তাজউদ্দীন।

## ১৩

নিজের জান বাজী রেখে নানা প্রকার বেইজ্জতি হজম করে সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব তাঁর ওয়াদা পালন করলেন। বঙ্গ বিজয় পরিহার করে ওয়াপস্ গেলেন মহা পরাক্রম সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। কিন্তু রাজা গণেশ তাঁর নিজের ওয়াদা রাখলেন না। মওকা পেয়েই বেঁকে বসলেন।

ইব্রাহিম শর্কী ইন্তেকাল করলেন। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই বিধ্বস্ত হলো তাঁর বিপুল পরাক্রম। অসংখ্য ওয়ারিশের আগ্রাসী থাবায় খন্ড খন্ড হয়ে গেল ইব্রাহিম শর্কীর রাজ্য। অন্তর্হিত হলো তাঁর অপরাজেয় বাহিনী। স্বার্থান্বেষী ওয়ারিশগণ স্বার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যেই কলহ বিবাদ বাধিয়ে, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে, জরাগ্রস্ত রুগীর মতো পঙ্গু হয়ে পড়লো। তারা নিজেরাই হলো হেফাজতির কাঙাল। বহিঃশক্তির আগ্রাসনের নিজেরই তারা শিকার হয়ে পড়লো। অন্যকে হেফাজত করার প্রশ্নই ওঠেনা।

তৎকালীন বাংলা মুলুকের আশেপাশে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীই ছিলেন একমাত্র পরাক্রমশালী মুসলমান শক্তি। এই শক্তির অন্তর্ধান হওয়ার ফলে বাংলামুলুকে মুসলমানদের স্বার্থ হেফাজত করার মতো আর কোন শক্তিই রইলোনা। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষুদ্র–বৃহৎ রাজ্য বা রাজ্য খন্ড ছাড়া, বাংলার চারপাশে কোন হিম্মতদার মুসলমান হুকুমাতের আর অস্তিত্বই ছিলনা। এ অবস্থা সুচতুর রাজা গণেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এর তিনি পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করলেন।

রাজ কুমার যদু নারায়ণ জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে পাণ্ডুয়ার মসনদে উপবেশন করার পর রাজা গণেশ কয়েকদিন চুপচাপ রইলেন এবং নীরবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সংসার ধর্মত্যাগ করে ভিন্ন জীবন যাপন করার প্রসঙ্গ তাঁর রাজনৈতিক চাল



www.pathagar.com

ছাড়া অন্য কিছুই ছিলনা। মাকসাদ হাসিলের উদ্দেশ্যে ছলা-কলা-চাতুরী তাঁর কাছে নতুন কিছুই নয়। প্রয়োজনের তাকিদে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া আর প্রয়োজন ফুরালেই সে ওয়াদা ভঙ্গ করা তাঁর কাছে নেহাতই এক মামুলী বাত ছিল। পান্ডুয়ার ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর আমল থেকে আজতক এমন অসংখ্য ছলচাতুরী আর ওয়াদা ভঙ্গের বেসাতি করেই তিনি পান্ডুয়ার মসনদ হস্তগত করেন। সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের কাছে এ ওয়াদা তাঁর এ জিন্দেগীর হাজারটা মিথ্যা ওয়াদার একটা বই নয়।

পান্ডুয়ার মসনদে জালালউদ্দীন নামধারী একজন নও-মুসলিম অধিষ্ঠিত থাকলেও, পান্ডুয়ার শাহী প্রাসাদ রাজা গণেশেরই প্রাসাদ ছিল তখনও। রাজ প্রাসাদে অবস্থিত ও রাজকার্যে নিয়োজিত তামাম ব্যক্তিবর্গই ছিলেন ঐ সাবেক হিন্দুবর্গ। একমাত্র যদু নারায়ণ জালালউদ্দীন হওয়া ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তখন পর্যন্ত হুকুমাতে আসেনি। ব্যাপক এক হিন্দুয়ানী পরিবেশে পুত্র হলেও একমাত্র মুসলমানের এই অস্তিত্ব রাজা গণেশের কাছে এমন কোন পরিতোষের বিষয়বস্তু ছিলনা। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিজেই তিনি এই অবস্থা পয়দা করেছেন বলে চুপচাপ দিন গুজরান করছিলেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী প্রত্যাগমনের পর থেকেই অতপর কি করনীয় বসে বসে ভাবছিলেন।

এই মুহূর্তে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর মৃত্যু সংবাদ রাজা গণেশের কানে অপরিমিত অমৃত বর্ষণ করলো। অতঃপর এই মুসলিম শক্তির করুন এই অবলুপ্তি তাকে আরো সোচ্চার করে তুললো। তিনি আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন। আর কোন পরোয়া নেই। এখন প্রয়োজন শুধু পরিকল্পনার।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর এই পরিণতি লক্ষ্য করে শুধু রাজা গণেশই গরম হয়ে উঠলেন না, হিন্দু কুল চূড়ামণি অবনীনাথ সান্যাল, সুচতুর মন্ত্রী নরসিং মহাশয়, বাহাদুর সেনাপতি শ্রী-শ্রীমাধব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ গতদিনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে স্বার্থের গন্ধে সজাগ হয়ে উঠলেন। পরিকল্পনা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গণেশ যখন গোপন মন্ত্রণালয়ে স্মরণ করলেন তাঁদের, একডাকে সবাই এসে জমায়েত হলেন সেখানে।

এক লহমায় সকলেই একমতে পৌঁছলেন। সবারই মুখে এক কথা-আর প্রয়োজন কি এই প্রহসনের? যদুকে সরিয়ে সিংহাসনে উঠে বসে পুনরায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলে, এবং বেয়াদপ মুসলমানদের ঐ ধৃষ্টতার বিষদাঁত শিল নোড়ায় ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে, এখন আর কারসাধ্য আছে মহারাজ গণেশ নারায়ণের সামনে টু শব্দটি করে? অনেক নাকের পানি-চোখের পানি এক করেছে ব্যাটারা। প্রতিশোধ গ্রহণের এই সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয় কোন বেয়াকুফ? এর মতো দুস্‌রা কোন বেয়াকুফী আছে এই দুনিয়ায়?

অবনীনাথের কথা- শুভস্য শীঘ্রম্। মসনদে বসেই যদু নারায়ণ যেহারে মুসলমানদের সেনাদলে ভর্তি করে চলেছে তাতে অধিক বিলম্ব হলে বিপত্তি হবে অনেক। মুসলমান সেপাই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মানেই বেকায়দাও বৃদ্ধি পাওয়া। মুখের কথাতেই মাকসাদ হাসিল হবে, তার নিশ্চয়তা কি? বল প্রয়োগের প্রয়োজনও হতে পারে। অতএব সময়ের এক ফৌড়, অসময়ের নয়ফৌড়ের বাড়া।



www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত হলো–যদু নারায়ণ পিতৃভক্ত সন্তান। অল্প কথায় কাজ হবে। আগে তাকে বুঝিয়ে দেখা হোক। নেহাতই বেঁকে বসলে– সৈন্যেরাতো এখনও শ্রীমাধবের নিয়ন্ত্রণেই আছে, তাকে জোর করে টেনে নামানো হবে। বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ অবনীনাথ সান্যাল এই সমঝানোর দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করলেন।

যদু ওরফে জলালউদ্দীন মসনদ লাভের পর যে অধিকতর দৃষ্টিকটু ছিলো তা হলো–রাজ প্রাসাদে জালালউদ্দীন যদুর সাথে অন্যদের অবস্থান। জা পাক, ভিন্ন চুলা হলেও, রাজ প্রাসাদের ------- সব বাসিন্দাই হিন্দু, এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু। সেখানে গোমাংসের অনু প্রবেশ জালাল উদ্দীনের ধর্মান্তরকেই মজবুত করা ছাড়া আর পাঁচজন হিন্দুর চোখে এটা কোন সুন্দর দৃশ্য ছিলনা। তার কুলীন ব্রাহ্মণ মাতা–পিতার মান সম্মানের এটা ছিল একান্তই বিপক্ষে এবং তাই তাঁদের অপরিসীম মর্মব্যথার কারণ ছিল এটা।

এ অবস্থার একমাত্র সমাধানই ছিল–হয় যদুর সাথে সকলেরই ইসলাম গ্রহণ করা, নয় যদুকে রাজ প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে তাঁদের সকলেরই অন্যত্র সরে দাঁড়ানো। কিন্তু রাজ প্রাসাদ যে আর তাঁদের নয় এটা মেনে নেয়ার মতো মনমানসিকতা রাজ প্রাসাদে অবস্থান কারী একজন হিন্দুরও ছিলনা। বরং ভাবখানা এই রকম যে, যদুই অন্য কোথাও সরে না গিয়ে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করে জটিলতা বৃদ্ধি করছে।

অপরাধটা যারই হোক, এর ফলে রাজ প্রাসাদের বাইরে প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই সৃষ্টি হয়েছে। উপযুক্ত পুত্রকে সিংহাসন ছেড়ে দিলে পিতার মুখ উচু হয়। কিন্তু বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মসনদ ছেড়ে দিয়েও রাজা গণেশের উচু মুখ অনেকখানি নিম্নমুখী হয়েছে। মানুষের মুখের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। তাই শুরু হয়েছে গুঞ্জরণ। প্রয়োজনের তাকিদে কিছুটা হেরফের করতে হলেও, রাজা মহারাজা যা–ই হোননা, তিনি আবার কিসের ব্রাহ্মণ? হিন্দুই বা কোন জাতের? কোন হাড়ি–ডোম–চন্ডালও তো এ অবস্থা সহজে মেনে নেবেনা। নিজেকে এখন রাজা গণেশ কুলীন বলে দাবী করেন কোন্ আক্কেলে? অন্যকে যে নরকের ভয় দেখায়, নিজের তাঁর নরকের ভয় নেই? এত মোহ রাজ প্রাসাদের পাতকী হয়ে ম্লেচ্ছের সাথে রাজ প্রাসাদে থাকার চেয়ে বন বাদাড়ে কুঁড়ে ঘরে বাস করাও ঢের ঢের পূণ্যের।

আতংক আর নেই। মানুষের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন এখন ফাঁকা। ফাঁকা মনে এমন মুখরোচক আলোচনা কেরোসিনে আগুন দেয়ার মতোই। দপ করে জ্বলে উঠে ছড়িয়ে যায় সে আগুন। দেখতে দেখতে এই সমালোচনা সর্বত্র বিস্তার লাভ করলো। ঘুরতে ফিরতেই এসব কথা এখন কানে পড়ে অনেকের, কানে পড়ে জালালউদ্দীন যদুরও। কানে পড়লেই যদু নারায়ণ আনমনা হয়ে ওঠে।

অবসর এক সময়ে জালালউদ্দীনকে নিয়ে অবনীনাথ বসলেন। কিছুক্ষণ ভূমিকা করার পর তিনি জালালউদ্দীনকে বললেন–বাবাজী, কথা একটা নাবললেও পারিনে, ওদিকে আবার বললেও কেমন মনে করবে তুমি–এই এক সমস্যা হয়েছে আমার।

জালাল উদ্দীন যদু সরল চিত্তে প্রশ্ন করলো–কি কথা কাকা?



www.pathagar.com

আমতা আমতা করে অবনীনাথ কায়দার সাথে বললেন কথাটা একটু জটিল বাবা। আবার একদিক দিয়ে জটিলও নয়। একেবারে জলের মতো তরল, আর কাঁচের মতো স্বচ্ছ। সেরেফ একটু অনুভূতির ব্যাপার।

আগ্রহভরে জালালউদ্দীন ফের প্রশ্ন করলো–বলুন না কথাটা?

কথাটা হলো–কি পরিস্থিতিতে তোমার বাবাকে মসনদ থেকে নামতে হয়েছে, তাতো তুমি জানোই।

হ্যাঁ, সেতো জানিই।

বৃদ্ধ–বয়সী মানুষ। বহু কষ্টে, বহুত্যাগ তিতিক্ষা করে, এমনকি জানবাজী রেখে এই মসনদ তিনি হস্তগত করেছেন। সেই মসনদ থেকে জীবনের এই শেষ কয়টা দিন আগে নেমে যাওয়াটা যে কতটা কষ্টের ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে অনুমান করা শক্ত।

জালালউদ্দীন তাঁকে সমর্থন দিয়ে বললো–তা ঠিকই কাকা। নেহায়েত বিপদে পড়েই তাকে যে এই মসনদ থেকে নেমে আসতে হয়েছে, তা আমার চেয়ে আর বেশী জানে কে? কিন্তু সেসব কথা এখন বলে আর লাভ কি কাকা? অতীতের সে বেদনার প্রতিকার তো আর এখন করার উপায় নেই।

চিবিয়ে চিবিয়ে অবনীনাথ বললেন–ইচ্ছে থাকলে সব কিছুরই উপায় হয়েই যায় একভাবে। আমি তাঁর বন্ধু মানুষ। এ নিয়ে প্রায়ই আমাকে তাঁর আফসোস্ শুনতে হয়। তার বড় আশা ছিল, এতকষ্টে অর্জিত ঐ মসনদে জীবনের শেষ কটা দিন অধিষ্ঠিত থেকে ইহজনমের সাধটুকু মিটিয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস।

হ্যাঁ কাকা। অদৃষ্টের পরিহাস বৈকি! মুসলমানদের প্রতি তাঁর আচরণটা অনেকখানি অসংযত হলেও এটা তাঁর অদৃষ্টেরই লিখন। নইলে এমন বিপদও হয় মানুষের!

ফাঁক পেয়েই অবনীনাথ তারে একটা টোকা দিলেন। বললেন–কিন্তু বিপদটাতো আর এখন নেই, যে ভয়ে বা যে প্রয়োজনে পড়ে তাঁকে এটা করতে হয়েছে, সে সবতো কিছুই আর নেই এখন।

না, তা আর নেই। কিন্তু–

পিতার মনের দুঃখ মোচন করা, মাতাপিতার মর্মব্যথা দূর করা প্রত্যেকটি যোগ্য পুত্রেরই পবিত্রতম কর্তব্য এবং একান্তই করণীয় কাজ। ইচ্ছে করলে তুমিও তোমার বৃদ্ধ পিতার এই মর্মব্যথা দূর করতে পারো। আজ বাদে কালই শ্মশানে যাবে যে ব্যক্তি, তার মনের ইচ্ছা পূরণ করা অনন্ত পূণ্যের কাজ বাবা।

জালালউদ্দীন যদু অবনীনাথের বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইলো। পরে বললো আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে কাকা, আমাকে আপনি কি করতে বলছেন, বা আমার পিতার জন্যে আমি কি করতে পারি।

অবনীনাথ উৎসাহিত হয়ে যদুর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন–অনেক কিছুই করতে পারো। তুমি এখন নওজোয়ান। একেবারেই তরুণ। দীর্ঘজীবন সামনে আছে তোমার। কিন্তু তোমার পিতার তো তা নেই। পিতার প্রথম পুত্র হিসাবে মসনদ তোমারই প্রাপ্য। যে দু' পাঁচদিন বেঁচে



www.pathagar.com

আছেন তিনি, এই কয়দিনের জন্যে তুমি একটু সরে এসে পাশের আসনে বসলে, তোমার পিতা ঐ মসনদে বসে মনের আক্ষেপটুকু মিটিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এই আকস্মিক প্রস্তাবে হতবুদ্ধি হয়ে জালালউদ্দীন যদু বললো–কাকা!

অবনীনাথ ঐ একই ভাবে তার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে চললেন। বললেন–মুসলমান হতে পারলে তো আগেই তিনি হতেন। সে প্রশ্ন তো আর ওঠেনা। অথচ মসনদে অধিষ্ঠিত মুসলমান পুত্রের অধীনে হিন্দু হয়ে থেকেও তিনি তিল পরিমাণ সুখ শান্তি পাচ্ছেন না। তাঁকে হাজার জনে অবিরাম হাজার কথা শুনাচ্ছে। অথচ উনি যদি এ ক'টা দিন রাজা হয়ে থাকেন, তাহলে তুমি মুসলমান না বৌদ্ধ হলে, এ নিয়ে এত মাথা ঘামাতে কোন লোক যাবেনা বা যাবার সাহসও কেউ পাবেনা। রাজা আর নন বলে কত কথা যে শুনতে হচ্ছে তাঁকে তাতো অজানা নয় তোমারও।

জালালউদ্দীন কিছুক্ষণ কথা বলত পারলোনা। পিতা তার মর্মকষ্টে আছেন, সে তা বোঝে। পাঁচজনের পাঁচরকম বিরূপ আলোচনাও এখন জোরদার। কিন্তু কি করতে পারে সে। মসনদে তো জোর করে সে বসেনি। মসনদের প্রতি এমন কোন মোহও তার ছিলনা। পিতাকে দুঃচিন্তা মুক্ত করার জন্যেই এবং পিতারই চাপে পড়ে সে ধর্মত্যাগ করেছে আর এই অল্প বয়সে মসনদে উঠে বসেছে। সেই পিতারই আবার সেজন্যে দুঃখ হলে তার কি করার আছে।

জালালকে নীরব হয়ে থাকতে দেখে সুচতুর অবনীনাথ যুক্তি টেনে আনলেন। বললেন–তোমার অন্তরে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি বাবা। তবে একটা কথা চিন্তা করলেই সব দ্বন্দ্ব চুকে যায়। বাড়িতে ডাকাত পড়ার সম্ভবনা দেখা দিলে, ঘরের জিনিস পরের বাড়িতে পার করে দিতে হয়। তাই বলে সে জিনিস গুলো পরের হয়ে যায়না। ডাকাত বিদেয় হওয়ার পর, না চাইতেই ঐ সব জিনিস ফেরত দেয়া যে কোন নীতিবান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির একান্ত করণীয় কাজ। না দেয়াটাই পাপ। তোমার এই মসনদে ওঠার ব্যাপারটাও তো বাবা এর চেয়ে পৃথক কিছু নয়? বাপের জিনিস বাপকে তুমি ফেরত দেবে, বাপ অভাবেই তোমার জিনিস তুমি আবার বুঝে নেবে। এর মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের তেমন কিছুতো দেখিনে বাপু।

সরল সৎ জালালউদ্দীন লা–জবাব হয়ে গেল। বয়সে সে ছেলে মানুষ কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক দূরদর্শন তার কিছু কম ছিলনা। তবে মাতাপিতার প্রতি তার দরদ এবং ভক্তি ছিল তামাম কিছুর উর্ধে। মাতাপিতাকে নিয়ে রাজনীতি করার মতো হীনমন্যতা সে কল্পনা করতে পারেনা। তাদের সুখশান্তি বিধান করার ঐকান্তিক ইচ্ছা দীলে তার তখনও তপ্ত। হোকনা এখন ভিন্ন ধর্মের লোক, তবু তারাই তো এ দুনিয়ার মুখ দেখিয়েছে তাকে। লালন করেছে কষ্ট করে।

অবনীনাথের এ প্রস্তাব আর জালালউদ্দীন উপেক্ষা করতে পারলোনা। শুধু একটা ব্যাপারে মনে তার প্রচুর সংশয় থাকায় সে বললো–কাকা, আপনার প্রস্তাবটা কোন অসংগত প্রস্তাব নয়। সংগত প্রস্তাবই বটে। ওটা মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে একটা প্রশ্নই এখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলা মুলুকের মুসলমানদের ওপর অমানুষিক জুলুম করার কারণেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়। এই জুলুম বন্ধ করার জামানত স্বরূপ আমার এই মসনদে আরোহণ। মুসলমানদের স্বার্থ হেফাজত করার দলিল বা পাট্টা স্বরূপই এই মসনদে মুসলমান হয়ে বসতে



www.pathagar.com

হয়েছে আমাকে। আজ নিজেও আমি মুসলমান। আমার পিতাকে মসনদ ছেড়ে দেয়ার পর যদি আবার ঐ পূর্ব অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে আমি শুধু গুনাহগারই হবোনা, আমার কওমের কাছে তথা বিশ্বের কাছে আমি একটা মস্তবড় বিশ্বাসঘাতক রূপেও প্রতিপন্ন হবো। এ ব্যাপারে কি নিশ্চয়তা আমাকে দিতে পারেন আপনি?

জালালউদ্দীনের কথা শুনে অবনীনাথের কপালে পরপর কয়েকটা কুঞ্চন দেখা দিলো। শানিত হলো দুই নয়নের দৃষ্টি। কিন্তু নিজেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংযত করে নিলেন। গুটিয়ে নিলেন সাপের মতো। কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা এনে হাসতে হাসতে বললেন–আরে রাম–রাম। পাগল হয়েছো বাবা। এমন শিক্ষার পরও আবার নেড়ে বেলতলাতে যাবে? ওসব কোন দুশ্চিন্তাই মনে তুমি রেখোনা, জান গেলেও তোমার কওমের অসম্মান আর কেউ করবেনা, বা করতে দেয়া হবেনা। এ জন্যে তোমার পিতার কাছে যে ওয়াদা চাও, তাই তিনি দেবেন।

জালালউদ্দীন তবু ইতস্তত করে বললো–ভাল করে বুঝে দেখবেন কাকা।

অবনীনাথ সোচ্চার কণ্ঠে বললেন–কিচ্ছু নেই–কিচ্ছু নেই। এর মধ্যে বুঝার কিচ্ছু নেই। তুমি যেভাবে চালাবে সেইভাবেই শাসনকাজ চলবে। আসলেতো শাসন কাজ চালাতে হবে তোমাকেই। উনিতো আর শাসন কাজ চালাবেন না, বা সে শখও তাঁর নেই। তাঁর শখ বলতে ঐ একটাই, মসনদের ওপর একটু বসে থাকা মাত্র। রাজা ছিলেন, সবার সামনে রাজা হয়ে থেকে নিজের মুখটা একটু উঁচু করে রাখা।

জালালউদ্দীন যদু শেষ পর্যন্ত রাজী হলো। সে রাজী হলে তাদের এই বৈঠকও শেষ হলো।

জালালউদ্দীনের সম্মতি লাভ করেই অবনীনাথ গণেশের কাছে ছুটে এলেন। রাজাকে এই সুসংবাদ দান করে সবাইকে নিয়ে আবার তাঁরা গোপন বৈঠকে বসলেন। যদু নারায়ণের মন মানসিকতা সবার কাছে বিশ্লেষণ করার পর অবনীনাথ রাজা গণেশ সহ সবাইকে লক্ষ্য করে বল্লেন, মুখের কথাতেই কাজ হচ্ছে যখন, বল প্রয়োগের প্রয়োজনই হচ্ছেনা, তখন হৈ চৈ করে খামোখা কোন বিপত্তি ঘটানো ঠিক হবেনা। বরং যে ওয়াদা চায় যদু, তাই তাকে দিতে হবে। ক্ষমতাটা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে কারো অধৈর্য হলে চলবেনা বা বাক্যালাপেও কাউকেই অসংযত হওয়া চলবেনা।

কথা মতোই কাজ হলো। পিতাকে নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলতে পুত্রের রুচি সায় দিলোনা। কিন্তু পিতা পুত্রকে নিয়ে নির্লজ্জভাবে রাজনীতির এক নজীর বিহীন খেলা খেলতে লাগলেন।

বাংলা মুলুকের মুসলমানদের তিল পরিমান স্বার্থহানি হবেনা, তাদের জানমালের নিরাপত্তা কোন প্রকারেই বিঘ্নিত হবেনা–এই মর্মে রাজা গণেশ ঢালাও ওয়াদা দান করলেন পুত্রকে।

পরেরদিন তামাম বাংলার মানুষ তাজ্জব হয়ে জানলো–বাংলার মসনদ আর জালালউদ্দীনের নয়, মসনদে আর জালালউদ্দীন নেই, ওটা ফের রাজা গণেশের হাতে গেছে এবং রাজা গণেশই এখন আবার বাংলা মুলুকের রাজা।



www.pathagar.com

মসনদে উঠে রাজা গণেশ মজবুত হয়ে বসলেন। সেনাসৈন্য পাত্রমিত্র আবার তাঁর অধীনে চলে এলো। অতপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে মন্ত্রী নরসিংহ হুংকার দিয়ে উঠতে গেলেন। অবনীনাথ সান্যাল তাঁকে চেপে ধরে থামালেন। বললেন–আরে, করেন কি–করেন কি? কাজ অনেক বাকী এখনও----

নাখোশকণ্ঠে মন্ত্রী মহাশয় বললেন–মসনদ এখন মহারাজের। রাজদন্ডও তাঁর হাতে। আবার বাকী কি?

অবনীনাথ সান্যাল ব্যাখ্যা করে বললেন–মন্ত্রী মহাশয়, জালালউদ্দীনকে পুনরায় যদু বানাতে হবেনা? ঘরের মধ্যে মুসলমান রেখে বাইরের দিকের মুসলমানের ওপর চোখ পাকিয়ে লাভ কি?

কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রী নরসিং থেমে গিয়ে চিন্তা করলেন। এরপর তিনি বললেন–কি বলতে চান আপনি? আর কি করতে হবে আমাদের?

অবনীনাথ বললেন–তেমন কিছুই নয়। আমাদের শুধু অভিনয় করে দেখাতে হবে। মানে যদু নারায়ণকে বুঝাতে হবে কেউ আমরা মুসলমান বিদ্বেষী নই। মুসলমানদের ওপর এরাজ্যে আর কোন জুলুমই হবেনা। সেজন্যে যদুকে আর মুসলমান হয়ে থাকার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই।

মন্ত্রী বললেন–তারপর?

রাজা গণেশ চুপচাপ বসে থেকে এদের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন–তারপর তাকে সবাই মিলে বোঝাবেন–হিন্দু পরিবারের মধ্যে মুসলমান হয়ে থেকে জটিলতা আর বৃদ্ধি না করে তার ফের হিন্দু হয়ে যাওয়াটাই হাজার দিক দিয়ে উত্তম। তার নিজের এবং পরিবারের সকলের জন্যেই সেটা কল্যাণকর ও তৃপ্তি দায়ক। তবুও অস্বীকৃতি জানালে ফের বললেন–সে যখন রাজা হবে আবার, সাধ থাকে, তখন যেন মুসলমান হয়েই মসনদে ওঠে সে। শুদ্ধি এখন হতেই হবে তাকে।

মন্ত্রী নরসিংহ নির্বাক হয়ে রাজা গণেশের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তা লক্ষ্য করে রাজা গণেশ বললেন–কিছুই বুঝতে পারলেন না? যদুকে ফের আমাদের ধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিধানগতভাবে ওকে শুদ্ধি করতে না পারলে ওকে হত্যা করে রাজপরিবারকে শুদ্ধ করতে হবে।

উপস্থিত সকলেই চমকে উঠলেন এ কথায়। বড় কঠিন প্রশ্ন। নির্মম হলেও ব্যাপারটা সত্য। যদু নারায়ণকে পুনরায় হিন্দু বানাতেই হয়, নয় হত্যা করতেই হয়। সত্যিই আর তৃতীয় পথ নেই।

নরসিংহ তবু ঘাড় চুলকিয়ে বললেন–সে বিধান কি আছে মহারাজ? যে একবার গোমাংস ভক্ষণ করে ফেলেছে, তাকে কি আর শুদ্ধি করার বিধান কিছু আছে।

রাজা গণেশ ক্ষুণ্ন হলেন। গোস্বাভরে জবাব দিলেন–অবশ্যই কোন না কোন বিধান একটা আছেই। টাকা থাকলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়, আর তুচ্ছ একটা বিধান পাওয়া যাবেনা?



www.pathagar.com

সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখুন। যত কঠিন আর ব্যয় বহুলই হোক, আমি তা পালন করতে প্রস্তুত।

মন্ত্রী বললেন–মহারাজ।

রাজা বললেন–যদুকে আগে ইসলাম ত্যাগ করে ফের হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে সম্মত করুন। তারপর আপনারা না পারেন নিজে আমি বিধান খুঁজে আনবো।

অবনীনাথ বললেন–মহারাজ।

গণেশ নারায়ণ বললেন–এ চেষ্টাও করতে হবে আপনাকেই। দরকার হলে আপনার কন্যাকে আপনি লাগাতে পারেন একাজে। যতদুর আমি জানি, যদু খুবই ভালবাসে যমুনাকে। তার সাথে যমুনার বিয়ের টোপ ফেলুন। তাকে বিয়ে করার আগ্রহেও যদু নারায়ণের মন ঘুরে যেতে পারে।

শুরু হলো সমঝানো। যদু নারায়ণ জালালকে সকলেই ঐ শেখানো বুলিই শোনাতে লাগলেন–সে হিন্দু হয়ে গেলেও মুসলমানদের ওপর আর জুলুম করা হবেনা, সুফী সাহেবকে দেয়া ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। অবনীনাথ সান্যালের মতোই মন্ত্রী নরসিংহ ও যদু নারায়ণের পিতার আত্মতৃপ্তির প্রসঙ্গ টেনে আনলেন এখানেও। যদুকে তিনি বোঝালেন–তার পিতা গণেশ নারায়ণ যে কয়দিন বেঁচে আছেন অন্তত এ কয়দিনের জন্যে হিন্দুধর্মে ফিরে আসুক যদু, পরে যেন আবার সে ইসলাম ধর্মে ফিরে যায়।

অবনীনাথ সান্যাল তাকে নানাভাবে বোঝালেন। যমুনা সান্যালের প্রসঙ্গও টেনে আনলেন কেউ কেউ। যদুকে তাঁরা বললেন, কুমার, আপনার ধর্মান্তরের অপেক্ষায় যমুনার বিয়ে আটকে আছে। আপনি যদি হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন তাহলে আপনার সাথেই সান্যাল মহাশয় বিয়ে দেবেন যমুনার। নইলে ভাল ভাল অনেক সম্পর্ক চার দিক থেকে আসছে। আপনি রাজী নাহলে, সেখানেই তিনি বিয়ে দেবেন কন্যার। আর বেশী দেরী করতে তো পারেন না তিনি। বামুনের ঘরের মেয়ে। অনেক আগেই বিয়ের বয়স হয়েছে। শুধু আপনার দিকে চেয়ে থেকেই কেটে গেছে এতদিন। আরতো এই অপেক্ষায় বেশী দিন থাকতে পারেন না সান্যাল মশাই। এদিকে আবার বামুনের ঘরের মেয়ের বিয়ে মুসলমানের সাথে হবে, ভুলেও এটা কল্পনা করার কিছুমাত্র যুক্তি নেই।

কিন্তু এ প্রশ্নে জালালউদ্দীন ইস্পাতের মতো শক্ত আর পাহাড়ের মতো অনড় হয়ে রইলো। কারো কোন যুক্তিই তাকে নরম করতে পারলো না।

অবশেষে হাজির হলো যমুনা সান্যাল। সুপারিশ নিয়ে নয়, প্রতিবাদ নিয়ে। অবনীনাথ সান্যাল তাকে পাঠাননি। গোমাংস খেয়ে পাতকী হয়েছে যে, হিন্দু ধর্মে ফিরে এলেও তার সাথে যমুনার বিয়ে হোক–এটা অবনীনাথের আন্তরিক ইচ্ছে নয়। যমুনা এলো নিজ গরজে। এসেই সে জালালউদ্দীন যদুকে আক্রমণ করে বললো–কি, কেমন লাগছে এখন?

জালালউদ্দীন অসহায় কণ্ঠে বললো–মানে?

যমুনা সান্যাল বললো–মানে, কি বুঝতে পারছেন? মসনদ গেছে, ধর্ম যাওয়ার পথে, এরপর প্রাণটা। আক্কেলগুণে শিক্ষাটা মন্দ হবেনা আপনার।



www.pathagar.com

আপনার?

হ্যাঁ আপনার। তুমি বলার অবস্থাতো রাখেননি আপনি।

যমুনা।

চিনেন না আপনি আপনার বাপকে? চিনেন না আমার জন্মদাতাকেও? এদের কথায় বিশ্বাস করে হাজার জনের ভরাডুবি হয়েছে। আপনারটা বাকী থাকবে ভেবেছেন? স্বার্থের খাতিরে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই যা দিতে এরা কস্মিনকালেও ইতস্তত করেছেন? এতকিছু দেখেও কোন শিক্ষাই হয়নি আপনার?

জালালউদ্দীন কি জবাব দেবে, হাতড়িয়ে পেলোনা। সে শুধু আমতা আমতা করতে লাগলো।

যমুনা ফের ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো–মসনদ ছেড়ে দেয়ার এ দুর্মতি হঠাৎ করে কোথা থেকে এলো আপনার, আমি ভেবে কোন কুল কিনারা পাচ্ছিনে। একজন নালায়েক নাদানও কোনকিছু করার আগে একদন্ড ভাবে। আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ হয়ে এতবড় প্রশ্ন একটু ভেবে দেখতেও গেলেন না বা কাউকে একটু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধও করলেন না?

একটু নড়ে চড়ে বসে জালালউদ্দীন বললো–তুমি হয়তো এদের ব্যাপারে একটু বেশী ভাবছো যমুনা। ক্রোধের বশে একা অবিচার করছো এদের প্রতি। এঁরা আমার শুভাকাঙ্খী। একজন আমার পিতা, একজন তোমার পিতা। অন্যের সাথে যা–ই করুন, তাঁরা কি কোন অমঙ্গল চিন্তা করতে পারেন আমার যে, তাদের কথায় অবিশ্বাস করবো আমি?

ফুঁসে উঠলো যমুনা। সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো–বটে। এখনও হুঁশ ফেরেনি। আপনার পুরুষ না হয়ে আউরত হয়ে জন্মানোই একান্ত উচিত ছিল। এত দুর্বল চিত্ত আপনার?

যমুনা।

একটু তাপ লাগলেই যে চিত্ত গলে যায়, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, পরিণতিটাও চিন্তা করে দেখেনা, সে আর যে দাবীই করুক, পুরুষ বলে তার দাবী করা সাজেনা। অথবা একজন আদনা আদমীর অধিক কিছু নিজেকে তার চিন্তা করাও উচিত নয়।

যমুনা, তুমি খামাখাই রাগ করছো।

খামাখা? আপনাকে নিয়ে কত গর্ব ছিল আমার। আপনার ব্যক্তিত্ব, পান্ডিত্য আর বিচারবুদ্ধি নিয়ে কত বড়াই করেছি আমি। সেগুলো সবই আমার মিথ্যা করে দিলেন? আপনাকে আমি আমার নিজেরও অধিক আপন বলে ভেবেছি, অথচ এতবড় মারাত্মক সিদ্ধান্তগুলো একা একাই গ্রহণ করছেন আপনি? আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসাও করছেন না?

জালালউদ্দীন যদু লাচার কণ্ঠে জবাব দিলেন করেই বা কি হতো? যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, এর ভিন্ন কিছু উপদেশ তুমিও দিতে পারতেনা। আসলে এমনই সব পরিস্থিতি সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় যে, নিজের ইচ্ছার একদম বিরুদ্ধেও মত দিতে হয় আমাকে।

যমুনা সান্যাল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো–যেমন?

দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে জালালউদ্দীন বললো–এইযে আমার ধর্মান্তরের ব্যাপারটা। কিছুতেই আমি চাইনে, আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করি। অন্যে যে যা–ই ভাবুন, এর মধ্যে ঢুকে এর মাজেজা আমি যেটুকু বুঝেছি, তাতে এটাকে ত্যাগ করে গ্রহণ করার মতো কোন সমকক্ষ



www.pathagar.com

ধর্মই আর নজরে আমার পড়ছেন না। অথচ দেখো, যে চিন্তা করাও আমার পাপ, আল্লাহ রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর ঈমান ফের কমজোর হওয়াও মস্থবড় গুনাহ্, তবু সেই চিন্তাই দীলে আমার জোরদার হয়ে উঠেছে। ঈমান আমার কমজোর হয়ে পড়ছে।

কারণ?

তুমি।

আমি?

হ্যাঁ। কোন মুসলমানের সাথে তো তোমার বাপ বিয়ে দেবেনা তোমার। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্মে না এলে তোমাকে পাই আমি কি করে?

তুচ্ছ একটা মেয়ের লোভেই ফের ধর্মত্যাগ করবেন আপনি?

তা করতে আমি পারিনে বলেই তো এত মর্মব্যথা আমার।

হিন্দু ধর্মে এলেই যে আপনি আমাকে পাবেন–এ বিশ্বাস কিসে এলো আপনার?

বুঝতে না পেরে জালালউদ্দীন প্রশ্ন করলো–পাবোনা?

না।

মানে?

প্রথমত আমি তার অন্তরায়।

তুমি।

হ্যাঁ, আমি। এক অস্থির মস্তিষ্ক নালায়েককে কেন আমি বিয়ে করবো? অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে যে পাগলের মত মসনদ ত্যাগ করতে পারে, একবার ধর্ম ত্যাগ করে যে সামান্যতম স্বার্থের লোভে আবার ধর্ম ত্যাগ করতে চায়, সামান্যতম কারণেই সে যে বউ ত্যাগ করে বসবেনা, তার নিশ্চয়তা কি?

জালালউদ্দীন আহত কণ্ঠে বললো–যমুনা।

যমুনা সান্যাল অধিকতর শাণিত কণ্ঠে বললো–স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলতেই আমি ভালবাসি।

জালালউদ্দীনও এবার চড়া গলায় বললো–কোনটা তোমার স্পষ্ট কথা? হিন্দু হলেও যদি বিয়ে করতে বাধে তোমার, মুসলমনাকে বিয়ে করতে পারতে?

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যমুনা সান্যাল জবাব দিলো–আমি যাকে বিয়ে করবো, সে হিন্দু–না মুসলমান, এ প্রশ্ন আমার কাছে বড় নয়। এটা দেখতেও আমি চাইনি। আমি চেয়েছি আদর্শ একজন মানুষকে বিয়ে করতে। যে ব্যক্তিত্ব দৃঢ় সিদ্ধান্তে অটল, সত্যের সেবক ও মনুষত্বের প্রতীক, এমনই একজন মানুষকে ঘিরেই ছিলাম আমি–ধর্মকে ঘিরে নয়। এমনই একটা মানুষকেই ভালবেসেছি আমি, কোন টিকিটুপিকে নয়। আমার সেই মানুষটাই যখন মরে গেল, তখন ঐ হিন্দু মুসলমান নিয়ে কি করবো আমি? ধুয়ে খাবো?

দিশেহারা জালালউদ্দীন অস্থির কণ্ঠে বললো–যমুনা।

যমুনা সান্যাল আক্ষেপ করে বললো–একি মতিভ্রম হলো আপনার? স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি আপনার এমন ভাবে লোপ পেলো কি করে? আপনি কি করে ভাবছেন–একবার গরুর মাংস



www.pathagar.com

ভক্ষণ করার পর ফের হিন্দু হয়ে গেলেই আমার বাপ আমাকে বিয়ে দেবে আপনার সাথে? কেটে আমাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারেন তিনি, তবু স্বেচ্ছায় ওটি করতে যাবেন না।

তাহলে?

তাহলে আবার কি? আগের অবস্থা আর নেই। এখন আমাকে পেতে হলে জোর করেই পেতে হবে। কেড়ে নিয়ে পেতে হবে। আর যে আমাকে পেতে চায়, তাকে সেই কেড়ে নেয়ার সামর্থ অর্জন করতে হবে। হিন্দু মুসলমান, যবন-বামুন-এইসব ছাপ ফোঁটায় আসবে যাবে কি?

বিস্ফারিত নেত্রে যমুনার দিকে চেয়ে থেকে জালালউদ্দীন বললো-যমুনা।

যমুনা তার বক্তব্যের জের টেনে বললো-নিজের মেরুদন্ডটা শক্ত করুন আগে। যমুনার কথা ভাবতে বসবেন তারপর। আর এই কথাটাই বলার জন্যে এসেছিলাম।

ঘুরে দাঁড়ালো যমুনা। ব্যস্তকণ্ঠে জালালউদ্দীন বললো আমি তাহলে-

যেতে যেতে যমুনা সান্যাল বললো -পুরুষ হওয়ার চেষ্টা করুন। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি আমি, আপনাকে প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানাবো।

## ১৪

সমঝানোর সকল প্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। জালাল উদ্দীন কিছুতেই যদু নারায়ণ হতে আর সম্মত হলোনা। কারো কোন যুক্তিই কোন কাজে এলোনা।

দেখে শুনে রাজা গণেশ উল্টা পথ ধরলেন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত লোকজনদের নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে বললেন-সকল ভাবেই তো চেষ্টা করে দেখলাম, তাকে রাজী করানো গেলোনা।

সকলেই সমস্বরে বললেন-হ্যাঁ মহারাজ, কিছুতেই তাকে রাজী করানো গেলনা।

এবার পথ পাল্টাতে হবে।

মহারাজ।

সব রোগই এক ওষুধে সারেনা। সোজা পথেই সব সময় সব জায়গায় যাওয়া যায়না। অনেক স্থানে বাঁকা পথে ঘুরে ঘুরেও যেতে হয়। এনিয়ে আপনারা আর কোন আলোচনাই করবেননা। সকলেই একেবারে নীরব হয়ে যান। সেই সাথে লোক পাঠান চারদিকে। এদেশের যেখানে যেখানে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত আছেন, আমাদের লোক গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করুক। এ ব্যাপারে কারো কোন বিধান জানা থাকলে, তাকে সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসুন। এ


www.pathagar.com

কাজগুলো এমন ভাবে হওয়া চাই, যাতে করে কিসে কি হচ্ছে, সেটা কেউ আঁচ করতে না পারে।

মন্ত্রী নরসিং বললেন–মহারাজ, আমরা নিজেরাই তো বিধান একটা তৈরী করতে পারি। আমাদের চেয়ে অধিক শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত আর কে আছে এদেশে?

রাজা গণেশ মুচ্‌কি হেসে বললেন–আছে, আছে। নিজেকেই এতবড় ভাবেন কেন? জীবনটাইতো গেল আমাদের রাজনীতির নামে হাজার রকম দুর্নীতির লালন করতে। শাস্ত্র পাঠের সময় আমরা পেলাম কৈ? এদেশে এখনও এমন অনেক লোক আছে যারা শাস্ত্র নিয়েই পড়ে আছে আজীবন। মন গড়া বিধানের চেয়ে শাস্ত্র সম্মত বিধান যদি পাওয়া যায়, তাহলে সব দিক দিয়ে মঙ্গল। পাপতো আর কম হয়নি জীবনে। পূণ্যির চেষ্টা যদিও এখন বৃথা, তবু যদুর যদি শুদ্ধিটা সঠিক ভাবে না হয়, তাহলে তার সাথে এক পংক্তিতে অন্নগ্রহণ করে পাতক হওয়ার পাপ থেকেও রেহাই কেউ পাবোনা।

সেনাপতি শ্রীমাধব বললেন–সে কথাতো হাজার বার ঠিক মহারাজ। কিন্তু আমি ভাবছি, রাজকুমার যেখানে একান্তই নারাজ সেখানে কি এমন বাঁকাপথ আছে যে, বিধান পাওয়া গেলেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে?

আবার হাসলেন রাজা গণেশ। বললেন–এই জন্যেই তো লোকে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করে সেপাইদের। দৈহিক শক্তির সাধনা করে মগজের শক্তি বিলকুলই বিনাশ করে বসে আছো? তিক্ত ঔষধ সেবন করানোর আয়োজনটা গোপনেই করতে হয়। খাওয়াতে হয় চেপে ধরে জোর করেই। রুগীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কা না রেখে গায়ের বল প্রয়োগ করেই অনিচ্ছার ওষুধ সেবন করাতে হয়। যদু নারায়ণের ব্যাপারে এখন এইটেই আমার পদক্ষেপ। বল প্রয়োগের মাধ্যমেই ইসলাম বিরোধী আচার–অনুষ্ঠান করিয়ে নিলে, ইসলাম বিরোধী খাদ্য–পানীয় খাইয়ে দিলে, বিষদাঁত ভেঙ্গে যাবে বাছাধনের। ইসলাম থেকে আপ্‌ছে আপ্‌ও খারিজ হয়ে যাবে। তখন সেঁকা খাওয়া সাপের মতো সুড় সুড় করে ঝাঁপীর মধ্যে ঢুকতে আর পথ খুঁজে পাবেনা।

শ্রীমাধব নিরুত্তর হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বললো–মহারাজ। রাজা গণেশ দাঁতপিষে বললেন– ঐ নেড়েটাই যদুকে আমার যাদু করে রেখেছে। আগে ঐ যাদুটা ছুটিয়ে দেই, পরে সব ব্যাটাদের দেখবো। এখন দেখো, বিধান কোথায় পাও।

অবনীনাথ বললেন–আমার যতটা জানা আছে, তাতে পাকুড়তলাতেই আমাদের লোক পাঠানো উচিত। অনেক ব্রাহ্মণ–পন্ডিত বাস করেন ওখানে। প্রাচীন কাল থেকেই পাকুড়তলা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পন্ডিতের আবাস স্থল হিসাবে বিখ্যাত।

রাজা গণেশ বললেন। সেতো আমিও জানি। তবু এক জায়গার ওপর নির্ভর করে না থেকে, সেখানেও লোক পাঠান, অন্যত্রও লোক পাঠান। যেখানে থেকে হোক, বিধান একটা পেলেই হলো আমার।

পরেরদিন প্রত্যুষেই লোক ছুটলো চারদিকে। কিন্তু তারা গিয়ে এ ব্যাপারে যেখানেই যার কাছে বিধান চাইলো, সেই শুনে আকাশ থেকে পড়লো। সবাই তারা বললো হিন্দুকে মুসলমান



www.pathagar.com

করার বিধান আছে ওদের। কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু করার কোন পাকাপোক্ত বিধান আমাদের নেই।

একে একে সবাই এই খবরই রাজা গণেশকে পরিবেশন করতে লাগলো। গণেশ এতে মহাক্রোধে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। গালি গালাজও করতে লাগলেন বার্তা বাহকদের। অপদার্থের দল! শাস্ত্র তো বন্ধ্যা নয় যে, খোঁজার মতো খোঁজ করলে বিধান পাওয়া যাবেনা। একের পর এক না বাচক বার্তা শুনে রাজা গণেশের মাথায় চড় চড় করে রক্ত উঠতে লাগলো। পাকুড়কলার খবর যখন এলো, একমাত্র তখনই তিনি ঠান্ডা হলেন আবার।

পাকুড়তলায় যে দলটি বিধান খুঁজতে বেরিয়েছিল, তাদের প্রধান ছিলেন অভয়চরণ ভাদুরী। এ অঞ্চল তার চেনা। তাই তাঁকেই এই দলের সাথে পাঠানো হলো এখানে। অভয়চরণ তার দল নিয়ে পাকুড়তলার বাজারে এসে হাজির হলেন। বাজারে এসে ভাবতে লাগলেন–কোন দিকে যাওয়া যায়। বামুন পাড়াতো সামনেই। কিন্তু ঠিক কার কাছে যাবেন তারা ঠিক করতে পারলেন না। এলাকা তাঁর চেনা ঠিকই, কিন্তু লোকজনকে তো ঠিক মতো চিনেন না।

দল নিয়ে বিষ্ণুপালের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অভয়চরণ। তাঁদের ইতস্তত করতে দেখে বিষ্ণুপাল জিজ্ঞেস করলো–মশাইরা কি খোঁজ করছেন কাউকে?

অভয়চরণ ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন–হ্যাঁ, হ্যাঁ। খোঁজই করছি আমরা। আচ্ছা, বামুন পাড়াতো সামনেই, না?

জবাবে বিষ্ণুপাল বললো–হ্যাঁ সামনেই। সোজা উত্তর দিকে গিয়ে বাঁয়ে একটু ঘুরলেই।

অভয়চরণ আবার প্রশ্ন করলেন–আচ্ছা, আর একটা খবর দিতে পারো? মানে, এখানে সবচে' অধিক শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত বামুন কে? বিধান টিধান জানা আছে ভাল–এমন পন্ডিত কে আছেন এখানে? নামটা কি তাঁর?

বিষ্ণুপাল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো–বলতে পারবো না মানে? পন্ডিত বামুন তো একজনই আছেন পাকুড়তলায়। দেশের সেরা পন্ডিত। আগামী কালই তাঁর দেশান্তরে যাওয়ার কথা। যান–যান, তাঁর কাছেই যান। যা জানতে চান একমাত্র তার কাছেই সঠিক জানতে পারবেন।

তাঁর নাম?

শ্রী মহাদেব চক্রবর্তী। নমস্য ব্যক্তি।

মহাদেব চক্রবর্তীকে পুনরায় ডেকে পাঠিয়েছেন ত্রিহুত রাজ দেবসিংহ। তাঁর বিশেষ অনুরোধে মহাদেব চক্রবর্তী কিছু দিনের জন্যে আবার ত্রিহুত রাজ্যে যাচ্ছেন। আগামী কালই রওনা হবেন তিনি। পাকুড়তলার ঘাটে তাঁর জন্যে বজরা আসবে। বাংলাদেশের সীমান্তে হাতী থাকবে মোতায়েন।

মহাদেব চক্রবর্তী বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত ছিলেন। এমনই সময় লোকজন নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলেন অভয়চরণ। অচেনা লোক দেখে মহাদেব চক্রবর্তী ত্রস্তপদে এগিয়ে এলেন। পরিচয়ান্তে তাঁদের যথাসাধ্য সম্মানজনক বসার আসন দিয়ে মহাদেব চক্রবর্তী তাঁদের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। অভয়চরণ ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বললেন–এ সম্বন্ধে বিধান কিছু জানা থাকলে, তা শিগগির আমাদের দিন। আমি খোদ রাজার আত্মীয়।



www.pathagar.com

মনের মতো বিধান দিতে পারলে, আপনাকে আমি আশাতীত পুরস্কারে পুরস্কৃত করবো। বলে অভয়চরণ রাজকীয় মেজাজে চক্রবর্তীর সামনে পা নাচাতে লাগলেন। অভয়চরণ জানতেন না যে, যাঁর সামনে পা নাচাচ্ছেন তিনি, বা পুরস্কারের লোভ দেখাচ্ছেন যাঁকে, তিনি একজন নগণ্য লোক নন, একজন রাজাধিরাজের গুরু।

অভয়চরণের কথা শুনে মহাদেব চক্রবর্তী নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন–দেখুন, একমাত্র লোকাচার ছাড়া এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সঠিক বিধান কিছু নেই। খুঁজলে কোথাও পাওয়া যাবে, এমন কোন বিশ্বাসও আমার নেই। বিধান বলে যা পাবেন, তা সবই আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। গোবর–জল খাইয়ে আচার অনুষ্ঠান করে যেভাবেই গোমাংসভোজী রাজপুত্রকে হিন্দু আপনারা করেন না কেন, সবই আত্মতৃপ্তি মাত্র। আর এই আত্মতৃপ্তিতে পরমতৃপ্তি লাভ করতে পারলে, এটাই অবশ্য করণীয়। আসলে ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা মানসিক ব্যাপার। মুসলমান হওয়ার পর কেউ মনে প্রাণে স্বধর্মে ফিরে এলে তাকে ত্যাগ না করে গ্রহণ করাই উচিত। তবে তাকে মন্দিরে তোলা যাবে কিনা, তার হাতে পূজা–অর্চনা হবে কিনা–এ নিয়ে সংশয় একটা থাকবেই।

অভয়চরণ ক্ষুণ্ন হলেন। বললেন–তাহলে বিধান কিছু নেই? কোন ব্রত–অনুষ্ঠান? যত টাকাই লাগুক–

অভয়চরণকে থামিয়ে দিয়ে চক্রবর্তী মহাশয় বললেন–থাকবে না কেন? আছে। বিনি পয়সার ব্রত–অনুষ্ঠানও ব্রত, লক্ষ টাকার ব্রত–অনুষ্ঠানও ব্রত। আসলে ব্যাপারটা তো মনের। আত্ম–শুদ্ধি আত্মার সাথেই সম্পৃক্ত, অর্থের সাথে নয়।

অভয়চরণ রাজার আত্মীয়। তিনি নীতিবাক্য শুনতে এখানে আসেননি। হুকুম করে জবাব নিতে এসেছেন। মহাদেব চক্রবর্তীর কথা শুনে তিনি সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–বিদ্যা কিছু পেটে যে আদৌ নেই, সেটা বলতে এত লজ্জা কিসের মশাই? সবার ওপর পন্ডিতি করার অভ্যাস এরপর থেকে ছাড়বেন। নইলে কপালে অনেক দুঃখ জুটতে পারে।

বলেই তিনি তাঁর লোকজনদের বললেন–চলুন আমরা অন্যের কাছে যাই–

কোনদিকে না চেয়ে মহাদেব চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে সদলবলে হন হন করে বেরিয়ে এলেন অভয়চরণ।

ব্যাপারটা কি করে ইতিমধ্যেই প্রচার হয়ে গিয়েছিল। রাজার লোক কিসের না কিসের বিধান খুঁজতে এসেছেন কথাটা ভোলা ভট্টাচার্য্যের কানে যেতেই তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। কিয়ৎদূর এগুতেই তাঁর অভয়চরণের দলের সাথে দেখা। এরাই সেই রাজার লোক জেনে তিনি সমাদরে সবাইকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। আদর যত্ন আপ্যায়নে সবাইকে তৃপ্ততুষ্ট করার পর এদের সাথে আলোচনায় বসলেন। অভয়চরণ সব কথা খুলে বললেন ভোলা ওরফে ভোলানাথ ভট্টাচার্যকে। বললেন–যত টাকা লাগে রাজা তা খরচ করতে প্রস্তুত। অভয়চরণের কথা শুনে নেচে উঠলেন ভোলানাথ। বললেন–বিধান নেই মানে? কড়কড়ে বিধান আছে।

অভয়চরণ বললেন–অছে নাকি? অথচ ঐ মহাদেব চক্রবর্তী না কি নাম, উনি বললেন–



www.pathagar.com

অভয়চরণকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে ভোলা ভট্টাচার্য্য লাফিয়ে উঠে বললেন–ঐ মহাদেব চক্রবর্তীর কাছে কেন যে আপনারা গিয়েছিলেন? কিছু জানে নাকি ঐ ব্যাটা খোট্টাইয়া বামুন? মূর্খ–মূর্খ। একবারে গোমূর্খ। ঐ ব্যাটা ম্লেচ্ছ ঘেষা বামুনের মাথায় ধামা ধামা ষাড়ের গোবর ছাড়া আর কোন পদার্থ নেই।

অভয়চরণ সায় দিয়ে বললেন–হ্যাঁ, সেই রকমই মনে হলো।

সংগে সংগে ভোলা ভট্টাচার্য্য বললেন–হতেই হবে। এ তল্লাটের সব লোকই এ বিষয়টা জানে। তা আপনারা বিশ্রাম করুন। এ নিয়ে আপনাদের আর তিল পরিমাণ চিন্তা করতে হবেনা। সব ব্যবস্থাই বাৎলে দেবো অমরা। পাকুড়তলায় এসে আমরা মানে এই পাড়ার বামুনেরা থাকতে বিধান কেউ পায়নি–এ অপবাদ এ বিশ্বে কেউ দিতে পারবেনা।

আগন্তুকদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ পাড়ার মধ্যে ছুটলেন। পাকুড়তলার স্বদলীয় বামুনদের নিয়ে গোপন এক পরামর্শে বসলেন। যত টাকা লাগুক, রাজা তা খরচ করতে প্রস্তুত শুনে সমবেত বামুনেরা আকাশ পেলেন হাতে। তৎক্ষণাৎ সকলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবেন তাঁরা। বিধান আর হাতড়াতে যাবেন কি? যা তাঁরা বাত্‌লাবেন–সেইটেই বিধান। জানিনে বলে বিদায় করলে শুধু নিজেদের অজ্ঞতাটাই জাহির হয়ে পড়বে না, সুবর্ণ সুযোগটা হাতের মধ্যে পেয়েও পায়ে ঠেলা হবে। সুযোগটা কারো কাছে বার বার আসেনা। একবার যখন এসেছে, তখন এই দফাতেই জনমের কামাই কামিয়ে নিতে হবে।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য্যকেই বামুনেরা তাদের দলের মুখপাত্র বানালেন। তাকে সব কিছু সমঝিয়ে দিয়ে বামুনেরা বললেন–বিধানটা এদের শুনিয়ে কাজ নেই। এ নিয়ে সরাসরি রাজার সাথে কথা বলতে হবে। রাজার আগ্রহ আর মেজাজ মর্জি অনুসারে বিধানের ধরন ও খরচের পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে।

যুক্তি শলা এঁটে নিয়ে সদলবলে নিজ গৃহে ফিরে এলেন ভোলা ভট্টাচার্য্য। অভয়চরণদের বললেন বিধানটা বড় জটিল এবং প্রশস্ত। আপনাদের ব্যাখ্যা করে শুনালেও কিছু আপনারা মনে রাখতে পারবেন না। বিধান যদি একান্তই চাই আপনাদের, তাহলে আমাদের রাজার সাথেই কথা বলতে হবে।

অভয়চরণ লাফিয়ে উঠলো। বললো বিধান তাহলে আছে তো?

ভোলা ভট্টাচার্য্য বললেন–আছে মানে। একেবারে টাটকা বিধান আছে।

পাকুড়তলার দশদশটি বামুনের একটি দল অভয়চরণের সাথে ঐদিনই পাণ্ডুয়ার পথে রওনা হলো।

বিধান পাওয়া গেছে এবং বিধান নিয়ে পাকুড়তলার বামুনেরা স্বয়ং এসে রাজ প্রাসাদে পৌঁছেছেন–এই খবর যখন রাজার কানে গেল, তখন তাঁর মাথার গরম রক্ত দ্রুত গতিতে ঠান্ডা হয়ে এলো। তিনি বামুনদের নিয়ে তাড়াতাড়ি গোপন কক্ষে বসলেন। সঙ্গে রইলেন – অবনীনাথ, নরসিং, পীতাম্বর ও শ্রীমাধব। একপাল সভাসদদের মাঝে এরাই ও মুষ্টিমেয় আর কয়েকজন এখন পাণ্ডুয়ারাজ গণেশের ডানহাত ও বাঁহাত।



www.pathagar.com

ব্রাহ্মণদের সমাদরে আসনদান করার পর রাজাগণেশ ভক্তিভরে বললেন–পন্ডিত মহাশয়গণ, আমার ছেলের সব কথাই আশা করি আপনারা শুনেছেন। নিতান্তই এক দুর্বিপাকে পড়ে তাকে আমার মুসলমান করতে হয়েছে। ইতিমধ্যেই সে গোমাংশ ভক্ষণও করেছে। ইসলামের নীতি নির্দেশ সে এখন নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছে। এই ছেলেকে পুনরায় আমি আমার নিজ ধর্মে ফিরিয়ে আনতে চাই।

রাজা গণেশ একটু থামলেন। এই ফাঁকে ব্রাহ্মণেরা বললেন–আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, এসব কথা সবই আমরা শুনেছি।

রাজা গণেশ আবার বললেন–আমি নিজেও একজন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র যে কিছু জানিনে তা নয়। তবু জন্মের পর থেকেই পাঁজিপাঁতির ব্যাপারে আপনাদের –মানে,পাকুড়তলার বামুনদের খুব নামডাক শুনে আসছি। আপনাদের দেয়া বিধানটাই অধিক শাস্ত্রসম্মত হবে বলেই, ওটা আপনাদের নিকট থেকেই চাই আমি, নিজে কোন পন্ডিতি করতে চাইনে।

মহারাজ।

আর তাছাড়া, শাস্ত্র কিছু জানা থাকা মানেই এমন একটা জটিল আর শক্ত ব্যাপারের বিধান জানা নয়। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে উপযুক্ত কোন কিছু হাতড়িয়ে আমরা এ যাবত পাইনি। কাজেই আপনাদের কাছেই চাই এর বিধান। এখন আপনারা বলুন, কি বিধান আছে এর?

রাজা গণেশ থামলে ভোলা ভট্টাচার্য্য মাথা চুলকিয়ে বললেন–বিধান তো আছেই মহারাজ; অত্যন্ত শাস্ত্রসম্মত বিধান। কিন্তু –

উৎসাহিত হয়ে উঠে রাজা গণেশ বললেন–কিন্তু কি?

ভোলা ভট্টাচার্য্য মহারাজের আগ্রহের পরিমাণটা যাচাই করতে করতে ফের ঘাড় চুলকিয়ে বললেন খুবই খরচ সাপেক্ষ, মানে–

রাজা গণেশ দরাজ কণ্ঠে বললেন–আরে খরচ? ও নিয়ে ভাবছেন কেন আপনারা? খরচ কোন ব্যাপারই নয় এখানে। শাস্ত্র সম্মত বিধান পেলে রাজকোষটা উজাড় করে দিতেও আমি তৈয়ার। বড় গুরুতর অশুদ্ধি। একে শুদ্ধি করতে যত লক্ষ লাগে লাগুক না, আমি তা খরচ করতে তিলপরিমাণ কুন্ঠিত হবো না।

উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ একবাক্যে বললেন–সাধু–সাধু।

ভোলা ভট্টাচার্য্য বললেন–এ না হলে মহারাজ। যে দেশের রাজাধিরাজ শাস্ত্রের প্রতি এমন শ্রদ্ধাশীল হন, ধন্য সে দেশ। ধন্য সে দেশবাসী।

গণেশ বললেন–বলুন কি করতে হবে আমাকে? খরচ লাগবে কত তা নিঃসংকোচে বলুন। আপনাদের আমি আশাতীত পারিশ্রমিক দেবো।

ভোলানাথ ফের গম্ভীর হয়ে বললেন–পারিশ্রমিকের কথাটাই একমাত্র বড় কথা নয় মহারাজ। এর জন্যে একটা মাত্রই বিধান আছে শাস্ত্রে মানে একটা মাত্র ব্রত উদযাপন। কিন্তু ব্রতটা সত্যিই বড় খরচ সাপেক্ষ।



www.pathagar.com

রাজা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হলেন। ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন–একটা কথা বার বার কেন আপনারা ভুল করছেন? কেন আপনারা ভুলে যাচ্ছেন–যাকে বিধান দিতে এসেছেন তিনি কোন নিরন্ন গৃহস্থ নন, তিনি একটা দেশের রাজা? পরিমাণে যতই হোক, খরচটা কোন ব্যাপারই নয় তার কাছে। বলুন কি সে ব্রত?

ভোলা ভট্টাচার্য্য অলক্ষ্যে সঙ্গীদের দিকে চাইলেন। চোখ ইশারায় তাঁরা তাঁকে সমর্থন করে সাহস যোগালেন। ভোলা ভট্টাচার্য্য বললেন–ব্রতের নাম সুবর্ণধেনু ব্রত মহারাজ। রাজ রাজড়াদের পক্ষেই এ ব্রত উদযাপন করা সম্ভব।

রাজা বললেন–সুবর্ণধেনু ব্রত?

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। সোনার গরুর ব্রত।

এর আসল খরচটা কি তাহলেঃ মানে–ঐ ------

ঐ গরুর পেছনেই মহারাজ। সোনার গাভী নির্মাণ করার পেছনে। অন্যান্য খরচটা সে তুলনায় কিছুই নয়। সাত সাতটা বৃহৎ আকার সোনার গাভী নির্মাণ করে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে রাজপুত্রকে সেই গাভীগুলোর সম্মুখ ভাগ দিয়ে চালিত করে পশ্চাৎ ভাগ দিয়ে বের করাই ব্রতের মূল কর্মকান্ড। আরো অনেক আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম থাকলেও এ ব্রত্যের কেন্দ্রীয় বিষয় ঐ সোনার গরু।

আচ্ছা।

অনুষ্ঠানাদির পর একটা ব্রাহ্মণ ভোজ দিয়ে ঐ স্বর্ণনির্মিত গাভীগুলি সহ এ ব্রতের সমুদয় উচ্ছিষ্টগুলো পুরোহিতদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেই সম্পন্ন হবে এ ব্রত। রাজকুমারও পাতক থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু–

কিন্তু?

এর মধ্যে ফাঁক থাকলে–মানে কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে পণ্ড হবে সব কিছু।

পণ্ড হবে মানে?

ঐ ব্রাহ্মণ দলের মধ্যে থেকে এবার আর এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ বললেন–মানে, এই ব্রত সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দিয়েই এই ব্রতের পৌরোহিত্য করাতে হবে, যাতে করে আচার অনুষ্ঠানাদির প্রতিটি দিকই পঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হয়। নইলে তিল পরিমাণ ত্রুটিবিচ্যুতির কারণেও পণ্ড হবে এ ব্রত। এছাড়া ঐ সুবর্ণধেনুর তিল পরিমাণ অংশও এই ব্রতের পুরোহিতদের দান না করে অন্যথা করলেও সম্পূর্ণ ব্রতটাই অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

রাজাগণেশ বললেন–না–না, অন্যথা করা হবে কেন? চিরাচরিত নিয়মানুসারে ব্রত–যজ্ঞ–অর্চনার সমুদয় সামগ্রীই তো পুরোহিতদেরই প্রাপ্য। এ তো নতুন কিছু নয়।

ভোলা ভট্টাচার্য্য বিনয়ের সাথে বললেন–তবু স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাখা ভাল মহারাজ। এত টাকার ব্রত।

অভাবনীয় প্রাপ্তি যোগের সম্ভাবনায় পাকুড়তলার ব্রাহ্মণদের দিল খুশীতে দোলনার মতো দোল খেতে লাগলো। কিঞ্চিৎ চিন্তা করে রাজা গণেশ বললেন–আচ্ছা, এই ব্রত সম্বন্ধে সেই যথাযথ জ্ঞান–সম্পন্ন পুরোহিত আমি পাবোতো খোঁজ করলে কোথাও?



www.pathagar.com

অলক্ষ্যে চমকে উঠলেন ব্রাহ্মণেরা। এ বলে কি মহারাজ! এতবড় প্রাপ্তিটা অন্যেরা পাবে বলেই কি, এত কায়দা করে এই বিধানটা উপস্থাপন করলেন তারা? সকলেই তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন।

রাজাকে নিতান্তই নিরুৎসাহ করে ভোলা ভট্টাচার্য্য বললেন–সে ভরসা আপনাকে আমরা লেশমাত্রও দিতে পারছিনে মহারাজ। কারণ, এদেশের মোটামুটি প্রায় ব্রাহ্মণদেরই চিনি আমরা। কার পেটে কতটুকু বিদ্যা আছে, তাও আমাদের অজানা নয়। এর চেয়ে শতগুণে সহজ কোন ব্রত পালনের জন্যেও সারা দেশের মানুষ আমাদের ঐ পাকুড়তলাতেই পুরোহিত খুঁজতে আসে। কাজেই এমন একটা কঠিন ব্রতের পুরোহিত অন্য কোথাও মিলবে কিনা, এ সম্বন্ধে আপনাকে কোন আশ্বাসই দিতে পারছিনে আমরা।

শুনে রাজা বললেন–তাহলে তো শুধু বিধান নিয়েই আপনাদের আমি ছেড়ে দিতে পারিনে। এই ব্রতের পৌরোহিত্য করে ব্রতটা সুসম্পন্ন করে দিয়েই তো যেতে হয় আপনাদের?

ব্রাহ্মণদের শুষ্ক দিলে পানি এলো। তাঁরা খুশীতে গদগদ হয়ে বললেন–মহারাজ যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে। রাজ ইচ্ছা উপেক্ষা করা শাস্ত্রমতে মহাপাপ।

রাজা বললেন–শুধু ইচ্ছা–অনিচ্ছার ব্যাপারই তো নয় এটা। অন্যকে দিয়ে এ ব্রতের পৌরোহিত্য করাতে গেলে ঝামেলাও আছে অনেক। বিধানের খুঁটিনাটি সব কিছু জেনে নিয়ে, আমাকেই আবার বলে বলে করাতে হবে সবগুলো। তাদের ওপর ছেড়ে দিলে, তাদের ধ্যানধারণা অনুসারে কোনটা তারা করে, কোনটা আবার বাদ দেয়–ইত্যাদি অনেক ফ্যাসাদ!

ব্রাহ্মণেরা কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে বললেন–অবশ্যই–অবশ্যই।

অন্য একজন বললেন–মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সূক্ষ্ম তা দেখেছেন? গলদটা কোন জায়গায় ঘটতে পারে, উনি ঠিকই ধরে ফেলেছেন।

জবাবে ব্রাহ্মণদের আর একজন বললেন–ধরবেন না। একি আমার আপনার মতো নির্বোধ–নাদান মানুষ উনি? গভীর জ্ঞানের মানুষ বলেই তো মহারাজ।

মহারাজকে শুনিয়ে শুনিয়েই ব্রাহ্মণেরা এ আলোচনা করতে লাগলেন। সেদিকে কান না দিয়ে মহারাজ তাঁর বক্তব্যের জের টেনে বললেন–অথচ বিধানটা আপনাদেরই দেয়া। এর পৌরোহিত্যটাও আপনারাই করলে, যা করণীয় বুঝে বুঝে আপনারাই করবেন। আমার কোন ঝুট ঝামেলা বা দুর্ভাবনা থাকবেনা।

ব্রাহ্মণেরা সমস্বরে বললেন–তা–ঠিক। তা–ঠিক।

রাজা গণেশ সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন–তাহলে এই কথাই ঠিক রইলো–এ ব্রতে আপনারাই পুরোহিতগিরি করবেন এবং ব্রতটা সুসম্পন্ন করে দিয়ে তবেই পাড়ুয়া থেকে যাবেন। কি, অসুবিধা হবে কিছু?

জবাবে ব্রাহ্মণেরা বললেন–না–না, অসুবিধা আর কি?

ভোলা ভট্টাচার্য্য আরো খানিক জোর দিয়ে বললেন –আর অসুবিধে কিছু হলেও তো, রাজকার্য অসম্পন্ন রেখে যাওয়া আমাদের কিছুতেই উচিত নয়। তাছাড়া বললামই তো আমরা,



www.pathagar.com

রাজকার্যের ওপর কোন কাজই থাকতে পারেনা। আর সে কাজ সম্পন্ন করা আমাদের শুধু কর্তব্যই নয়, পরম পূণ্যের ব্যাপারও বটে।

শুরু হলো ব্রত পালনের আনজাম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকশত সুদক্ষ স্বর্ণকারকে রাজপ্রাসাদে ডেকে আনা হলো। বিপুল পরিমাণ সোনা এনে তাদের সামনে স্তূপীকৃত করা হলো। চরম তাকিদের মুখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে স্বর্ণকারেরা সুবর্ণধেনু নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন। পূরোহিতদের নির্দেশে অনুষ্ঠানের আনুসঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যাদি পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজেরা যোগাড় করে আনতে লাগলো। হঠাৎ করে রাজ প্রাসাদে বিপুল এক অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে গেল। কিসের অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে-সীমিত কিছু ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জানলোনা। জালালউদ্দীন যদু বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এ নিয়ে প্রশ্ন করলে, তাদের বলা হলো-বিগত ঐ নিদারুণ বিপদমুক্তির উল্লাসে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঈশ্বরের অপরিসীম দয়াতেই তো রক্ষা পেয়েছে এ দেশের স্বাধীনতা।

আয়োজন শেষ হলো। রাজ প্রাসাদের প্রশস্ত আঙ্গিনায় একটি সুউচ্চ বেদী নির্মাণ করা হলো। অনুষ্ঠানের সরঞ্জামাদি এনে বেদীর সামনে সাজানো হলো। পুষ্পস্তবক ছড়িয়ে বেদীর ওপরে নীচে সমুদয় স্থান কুসুমাস্তীর্ণ করা হলো। সবশেষে স্বর্ণ নির্মিত সাত সাতটি সুবৃহৎ গাভী এনে বেদীর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো।

রাজা গণেশ এবার তাঁর পারিষদদের গোপনে ডেকে বললেন শ্রীমাধব তার বাহিনী নিয়ে তৈরী থাকবে। রাজপুত্রকে বেদীর সামনে ডেকে এনে আর একবার সমঝানো হবে। তবুও যদি ধর্মান্তরে সে নারাজ হয়, তাকে বন্দী করা হবে এবং হাত পা বেঁধে তাকে ঐ গাভীগুলির সম্মুখ ভাগ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পশ্চাৎভাগ দিয়ে বের করা হবে ও বল প্রয়োগেই অন্যান্য ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে ধর্মান্তরিত করা হবে।

পরিকল্পনা এঁটে নিয়ে সবাই এসে বেদীর সামনে দাঁড়ালেন। একদল সেপাই নিয়ে শ্রীমাধব আশেপাশেই তৈরী রইলেন। এরপর যদু নারায়ণ জালালকে আহবান করা হলো।

আহবান পেয়ে যদু নারায়ণ জালালউদ্দীন সরল মনে সেখানে এসে হাজির হলো। সে এসে দাঁড়াতেই তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন আত্মীয়-স্বজন পাত্রমিত্র সকলেই। রাজা গণেশ এসে পুত্রের সামনে দাঁড়ালেন। জালালউদ্দীন ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই রাজা গণেশ খোদ, এই ব্রতের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। সেই সাথে তিনি রাজপুত্রকে জানালেন তার নিজের, বংশের, এবং আত্মীয় স্বজনসহ বাংলা মুলুকের তামাম হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও তৃপ্তির কথা চিন্তা করেই এই ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পিতৃভক্ত সন্তান হিসাবে যদু নারায়ণের এ ব্যবস্থা মেনে নেয়া উচিত।

রাজা গণেশ থামলে মাতা-পিতার মনোতুষ্টির খাতিরে এবং রাজপ্রাসাদের ও রাজ পরিবারের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার মানসে জালালউদ্দীনের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত -এই মর্মে রাজকুমারকে উপদেশ দিতে লাগলেন-অবনীনাথ, নরসিং, পীতাম্বর এবং একে একে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন পাত্র পারিষদ সকলেই।



www.pathagar.com

উপদেশ শেষ হলে শুরু হলো অনুরোধ ও অনুনয়ের পালা। সকল প্রকার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার পর জালালউদ্দীনের জবাব চাওয়া হলে সে নির্বিকার কণ্ঠে বললো–লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

ধমকে উঠলেন রাজা গণেশ। ক্রোধান্বিত কণ্ঠে তিনি বললেন–হুঁশিয়ার। পুত্র বলেই এ ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি এযাবত। সকলের এই সৎ উপদেশ উপেক্ষা করে ফের যদি দ্বিরুক্তি করো তুমি, ক্ষমা আজ আর মাথা কুটেও পাবেনা। বলো–তুমি ধর্মান্তরে রাজী কিনা?

জালালউদ্দীন ক্লিষ্ট হেসে বললো–কি বলবো! আপনি আমার পিতা, আমার জন্মদাতা। তাই আমার কিছু বলার নেই। ধর্মান্তরের প্রশ্নই কিছু ওঠেনা।

গণেশ বললেন–মানে?

জালাল বললো–ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আমি যাবো আর কোন ধর্মে? উপাসনা করবো কার?

কেন, তোমার পিতা পিতামহের চিরারাধ্য দেব দেবীর?

বাতুল।

বাতুল। কে বাতুল? আমি না তুমি?

আপনারা সকলেই।

চোখ রক্তবর্ণ করে রাজা গণেশ বললেন–চুপ কর নরাধম। শেষবারের মতো বলছি–বল্, স্বেচ্ছায় তুই ইসলাম ত্যাগ করবি কিনা? পিতৃপুরুষের দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবি কিনা?

ঃ বলেছিই তো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।

ফেটে পড়লেন রাজা গণেশ। চীৎকার করে বললেন–খবরদার!

জালালউদ্দীন এ চীৎকারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলোনা। বরং সেও বুলন্দ কণ্ঠে বললো – আশ্‌হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াদাহু, লা শরীকালাহু ওয়া আশ্‌শাহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসুলুহু।

ক্রোধে উম্মাদ হয়ে রাজা গণেশ হুংকার দিয়ে বললেন–বন্দী করো, বন্দী করো এ নরকের কীটকে। যার যা প্রাপ্য, তাকে তা না দিয়ে শুধু শুধু ধোপ দিলে কয়লার ময়লা কোনদিনই যাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে জালালউদ্দীনকে বন্দী করা হলো। অতপর বল প্রয়োগেই তাকে মন্ত্র পাঠের সাথে সাথে গাভীগুলির ভেতর দিয়ে চালনা করা হলো এবং বেদীর সামনে বসিয়ে ফোঁটা তিলক পরিয়ে ও মন্ত্র উচ্চারণ করে তাকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা হলো। তবুও সে নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করতে ও তাদের পাকের খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণে অসম্মত হলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। আর দেশব্যাপী ঘোষণা দেয়া হলো –রাজপুত্র যদু নারায়ণকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে এবং রাজ প্রাসাদ ও রাজ বংশ থেকে ইসলামের আবিলতা মুছে ফেলা হয়েছে। সেই সাথে যদু নারায়ণকে জানিয়ে দেয়া হলো– যতদিন সে নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করতে আর হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান মেনে চলতে



www.pathagar.com

অস্বীকৃতি জানাবে, ততদিন তাকে কারারুদ্ধ রাখা হবে এবং তার ওপর নিয়মিত নির্যাতন চালানো হবে।

ব্রাহ্মণ ভোজনের মধ্যে দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন সমাপ্ত হলো এবং সেই বৃহৎ আকার সাত সাতটি সোনার গরু ও অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত সমুদয় সামগ্রী পাকুড়তলার পুরোহিতদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। গরুর গাড়ি বোঝাই করে লব্ধ সম্পদ নিয়ে পাকুড়তলার বামুনেরা মহানন্দে পাকুড়তলায় ফিরে এলেন।

জালালউদ্দীনকে কারাগারে প্রেরণ করেই রাজা গণেশ নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। সেই দিনই দরবারে বসে তিনি বিপুল বিক্রমে ঘোষণা দিলেন –নাম তাঁর আর গণেশ নারায়ণ ভাদুরী নয়। আজ থেকে নাম তাঁর দনুজমর্দন। দনুজমর্দন দেব। পাপিষ্ঠ যবনেরা যৎপরনাস্তি ভোগান্তির কারণ হয়েছে তাঁর। চোখের জল নাকের জল এক করে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছে তস্করেরও অধিক। এবার তা কড়ায় গন্ডায় শোধ করবেন তিনি। যবনদের সেই আচরণের মর্মান্তিক প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবার। তিনি তার দনুজমর্দন নাম করণের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, দনুজ অর্থে দানব। দানবদের ধৃষ্টতার জন্যে দেবতারা যেমন দানবদের দুই পায়ে মর্দন করেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশের যবনরূপী দানবদের তিনি বিগত ঐ ঔদ্ধত্যের জন্যে দুইপায়ে মর্দন করবেন। সেনা –সৈন্য, লোক–লস্কর ও সভাসদদের ওপর তিনি আদেশ জারি করলেন– কোন মুসলমানকে অতপর আর ছেড়ে কথা নেই। দেখামাত্র শিরচ্ছেদ করা চাইই। আর সেই সাথে ঘোষণা দিলেন –তৌহিদ বেগের মাথার মূল্য লক্ষ মুদ্রা। মাথা আনতে না পারলেও, সন্ধান যে দিতে পারবে–তার প্রাপ্য অর্ধলক্ষ।

www.pathagar.com

# ১৫

জালালউদ্দীনের মসনদ ত্যাগ এবং কয়েদ হয়ে কারাবরণ কোন মাস বছরের ঘটনা নয়। রাজা গণেশের পুনরায় মসনদে আরোহণ থেকে সুবর্ণধেনু ব্রত উদযাপন ও জালালউদ্দীনের কারাগার গমন মাত্র কয়েক দিনের ঘটনা। জালালউদ্দীনকে ফুস্‌লিয়ে মসনদ থেকে নামিয়ে নিজে গিয়ে মসনদে উঠে বসার পরেই তিনি প্রতিটি পদক্ষেপ এত দ্রুত গতিতে গ্রহণ করলেন যে, দেশের লোক তো দূরের কথা, রাজধানীর লোকেরাই কি দিয়ে কি হয়ে গেল, পুরোপুরি ঠাহর করতে পারলো না।

রাজা গণেশের পুনরায় মসনদ প্রাপ্তির খবর পেয়েই ভুলু খাঁ ওরফে বাহালুল খাঁ যখন পাণ্ডুয়ায় ছুটে এলো তখন জালালউদ্দীনকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার সুপারিশ চলছে। নানাজন জালাল উদ্দীনকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার কসরত করছে। এরপর তাজউদ্দীন যখন পাণ্ডুয়ায় এসে পৌছলো, তখন জালালউদ্দীন কারাগারে।

সোনা বাউলের হাতে তাজউদ্দীনকে খবর দিয়েই ভুলু খাঁ পাণ্ডুয়ায় ছুটে এলো। খবর নিয়ে সে পরের দিন সুফী হজরত নূর কুতুব-ই- আলমের খানকা শরীফে ওয়াপস্ এলো। দ্রুতগামী অশ্ব ব্যবহার করেও ভুলু খাঁ একদিনে ফিরে আসতে পারলো না। খবর পেয়ে তাজউদ্দীনও এসে খানকা শরীফে হাজির হলো এবং ভুলু খাঁর এন্তেজারে রইলো। সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব প্রথম প্রথম এ কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি চিন্তা করতে পারেননি, এতটার পর রাজা গণেশ ফের এমন বেইমানি করতে পারে। ভুলু খাঁ যখন ফিরে এসে বললো -রাজা গণেশ শুধু মসনদেই ওঠেননি, জালালউদ্দীনকেও পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ কোশেশ্ করছেন, তখন তিনি লা-জবাব হয়ে গেলেন।

সুফী সাহেবের খানকা শরীফে আবার নেমে এলো বিষাদ ও দুশ্চিন্তার ঘনকৃষ্ণ ছায়া। আনন্দ মুখর খানকা শরীফ মরণোন্মুখ রুগীর মতো ম্রিয়মান হয়ে গেল। পাণ্ডুয়া থেকে ভুলু খাঁ যখন ফিরে এলো তখন খানকা শরীফে উপস্থিত ছিলেন মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় প্রায় সমুদয় ব্যক্তিবর্গই। রাজা গণেশের চাতুরীর খবর শুনে সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং ঘটনা কি জানার জন্যে খানকা শরীফে ছুটে আসেন। ভুলু খাঁ যখন পাণ্ডুয়ার চলতি খবর পেশ করলো, সকলের মুখমন্ডল ছাই বর্ণের হয়ে গেল। সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ী করতে লাগলেন। শায়খ আনোয়ার সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন- খলের কথায় বিশ্বাস করার মতো নির্বুদ্ধিতা দুস্‌রা কিছু এ দুনিয়ায় আছে কিনা জানা নেই। আরা হজুরের মতো একজন বুজুর্গ ব্যক্তি কেন যে ঐ কাফেরের কথায় গলে গেলেন, এর কোন যুক্তি খুঁজে পাইনে।



www.pathagar.com

শায়খ জাহিদ আফসোস করে বললেন–বাংলা মুলুকের মুসলমানদের নসীবে আরো অনেক দুঃখ কষ্ট আছে বলেই এমনটি তখন ঘটেছে। কি গুণাহ্‌ই যে করেছিল এদেশের বদ নসীব এই কওম।

একজন প্রবীণ মুসল্লী এসব কথা শুনতে শুনতে বললেন –যা ঘটে গেছে তা নিয়ে তো আর আফসোস্ করে লাভ নেই। সময় থাকতে আমাদের আবার প্রতিরক্ষার চিন্তাভাবনা করতে হয়। আজ আর তো সুলতান ইব্রাহিম শর্কী নেই যে, জুলুম হচ্ছে শুনলেই ছুটে আসবেন জৌনপুর থেকে।

শায়খ হোসেন সাহেব বললেন–ইব্রাহিম শর্কী না থাকুক, আল্লাহ তায়ালা তো আছেন। রাখে আল্লাহ, মারে কে? এখনই এত না–উম্মীদ হওয়ার কারণ নেই।

সেই প্রবীণ মুসল্লীটি এর জবাবে বললেন–না–উম্মীদ হওয়ার কথা আমিও বলছিনে। আমি যা বলছি, তা হলো– আমাদের এখন পাল্টা কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো মুসিবতের দিনে আল্লাহ তায়ালা ছাপপড় ফেড়ে মদদ পাঠিয়ে দেবেন না। সে মদদ পাওয়ার মতো উপযুক্ত প্রচেষ্টা আমাদেরও থাকতে হবে। আমাদেরও হাত পা নেড়ে হেফাজতির লক্ষ্যে কোশেশ্ কস্‌রত করতে হবে।

এতক্ষণে মুখ খুললেন হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেব। বললেন–হ্যাঁ, নিজের চেষ্টা নিজেকে আগে করতে হবে আর সেই সাথে আল্লাহর করুণাও চাইতে হবে। আমাদের এই বাংলা মুলুকের কওমকে নিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে খেলা খেলতে চান, তা তিনি খেলবেনই। অতীতের ঘটনাগুলি তারই আলামত। কোন কিছুই তাঁর বিনা হুকুমে ঘটেনা। কোথাও কারো হাত নেই। যা ঘটবার তা ঘটবেই। আমরা সবাই তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। তাঁর হুকুমের গোলাম। কাজেই অতীত নিয়ে আফসোস্ করা বাতুলতা। বর্তমানের করণীয়ই বিশ্বাসীদের যোগ্য কাজ।

সুফী সাহেব থামলেন। এবার তাজউদ্দীন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করলেন–এই মুহূর্তে ঠিক কি আমাদের করণীয় বলে হুজুর পাক চিন্তা করছেন?

সুফী সাহেব বললেন –আবার এক চরম মুসিবত আমাদের জন্যে আসছে বলেই আমার ধারণা। আরো অনেক খেশারতই আমাদের হয়তো দিতে হবে।

সুফী সাহেবের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এলো। তা লক্ষ্য করে সকলেই সন্ত্রস্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন–হুজুর।

সুফী সাহেব বললেন–মুসিবতের কালে কাউকে হতাশ হলে চলবেনা। ইমানের শক্তিতে সবাইকে সব কিছু সহ্য করতে হবে। মুসিবতের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শ্রম দিতে হবে। এখন আমাদের সবার জন্যে করণীয়, ভবিষ্যতের জন্যে ইমানকে শক্ত করা আর সামর্থবানদের জন্যে করণীয় জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহকে যথাসাধ্য মদদ দেয়া।

তাজউদ্দীন ও ভুলু খাঁ এক সঙ্গে বললো, হুজুর।

জালালউদ্দীন আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যতদূর আমি বুঝেছি, সে খাস্ দীলে ইসলাম কবুল করেছে। ইসলাম সে কিছুতেই ত্যাগ করবেনা। তার কাছেই যাও। তাকে ঘিরেই


www.pathagar.com

শুরু করো সংগ্রাম। সে-ই হবে এ সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দু। আল্লাহ পাকের রহমে তার মাধ্যমেই নিশ্চিত হবে বাংলা মুলুকের মুসলমানদের কায়েমী হিফাজতি। এই আমার বিশ্বাস।

এই পর্যন্ত বলেই নীরব হলেন সুফী সাহেব। চোখ বুজে তসবীহ তেলাওয়াতে রত হলেন। অতপর আর কারো প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না।

তা দেখে শায়খ জাহিদ সাহেব বললেন-এখানে আর অযথা জটলা করে ফায়দা নেই। এখন আমাদের জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহর কথা ভাবতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাজউদ্দীন বললো-আমি যথা শিগগিরই রওনা হবো। আমার সাথে জালালউদ্দীনের দোস্তী আছে। রাজপ্রাসাদে আমার পরিচিতি ও প্রাধান্য আছে। এখনই আমি এইভাবেই যেতে পারতাম। কিন্তু খলকে আর বিশ্বাস নেই। রাজা গণেশের এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার মুখে সেরেফ হামদরদীর ওপর ভরসা করে আমি রওনা হতে পারিনে। আমি সেখানে যথা সম্ভব প্রস্তুত হয়েই যাবো।

ভুলু খাঁর পাণ্ডুয়ায় যেতে আসতে এবং সবাই মিলে আহাজারী করতে কয়েক দিন গেল। তারপর বিছিন্ন সৈন্যদের এত্তেলা দিলো ভুলু খাঁ। এদের একত্রিত করে আবার তালিম দেয়া হলো এবং লড়াইয়ের জন্যে তৈরী থাকার হুশিয়ারী দেয়া হলো। এতেও গেল কিছু দিন। সবশেষে এদের মধ্য থেকেই কয়েকজন বাছাই করা সেপাইকে ছদ্মবেশে সঙ্গে নিয়ে তাজউদ্দীনের তৈরী হতে মাঝখানে গত হলো আরো কয়েক দিন।

এরপর সে পাণ্ডুয়ায় এক সাঁঝ ওয়াক্তে এসে যখন পৌছলো, তখন শুনলো-গতকল্যই জালালউদ্দীন যদুকে কয়েদ করে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং আজকের এই দিনের মধ্যে রাজধানীর প্রায় শতাধিক মুসলমান গণেশের ফৌজের আকস্মিক হামলায় নিহত হয়েছে এবং পথে ঘাটে অবিরাম তা হচ্ছে। গণেশের এই পরিবর্তনের খবর প্রচার হওয়ার আগেই শুরু হয়েছে এই মুসলমান-নিধন উৎসব। সে আরো শুনলো-তৌহিদ বেগের মাথার মূল্য লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা করা হয়েছে, আর সন্ধান দানের মূল্য নগদ পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা ধার্য করা হয়েছে।

সব কিছু দেখেশুনে তাজউদ্দীন তাজ্জব বনে গেল। এ ধরনের ব্যাপক একটা পরিবর্তন তার কল্পনাতেও আসেনি। নিজ পুত্রের হাত থেকে গণেশ আবার মসনদটা কেড়ে নিতে যাবে, গোমাংস ভোজী পুত্রকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার কোশেশ্ করবে-এই পর্যন্ত কল্পনা করাই কঠিন। তার ওপর এই হিন্দু হতে নারাজ হওয়ার কারণে পুত্রকে কয়েদ করা আর মুসলিম বিদ্বেষের দরুন সুফী সাহেবের পায়ের ওপর মাথা কুটার পরও আবার এই মুসলমান নিধন কর্মে তাঁর ব্রতী হওয়া, কোন সুস্থ মগজের মানুষ কল্পনা করতে পারেনা।

তাজউদ্দীন সন্তর্পণে রাজধানীর ভেতরে ঢুকে ঘুরে ফিরে দেখলো-রাজার ফৌজ হন্যে হয়ে মুসলমানদের সন্ধান করে ফিরছে। রাজধানীর মুসলমানেরা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে। জালালউদ্দীনের মসনদ প্রাপ্তির পর অনেক বাস্তুত্যাগী মুসলমান ইতিমধ্যেই রাজধানীতে ফিরে আসে। অনেকেই আবার ব্যবসা খুলে বসে। আবার এই আচানক হামলায় সর্বস্ব ফেলে দিশেহারা হয়ে তারা পালছে। রাজধানীর দোকানপাট, বেচাকেনা ও স্বাভাবিক জীবন এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে।



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন চিন্তা করে দেখলো–এ অবস্থায় রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করা তো দূরের কথা খোলা–মেলাভাবে এখানে তার বিচরণও নিরাপদ নয়। মুসলমান হওয়ার কারণে নিজ পুত্রকে যে কয়েদ করতে পারে, পুত্রের মুসলমান বন্ধুকে কোতল করতে বিবেকে তার কিছু মাত্র বাধবে না। সুফী সাহেবের কাছে সর্বস্ব রক্ষার এতবড় ঋণ যে বিস্মৃত হতে পারে, তাজউদ্দীনের কাছে তার পুত্রের প্রাণরক্ষার এই সামান্য ঋণ সে গণ্যের মধ্যেই আনবে না।

সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছে। রাজধানীতে কোথাও গিয়ে এত লোক নিয়ে ওঠা এখন সন্দেহজনক। তাই তাজউদ্দীন তার সঙ্গীদের নিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে গ্রামের মধ্যে চলে এলো এবং সেখানেই বিভিন্ন স্থানে রাতটা কাটিয়ে দিলো।

পরেরদিন ভোরেই তাজউদ্দীনের চিন্তা –এখন কি করা যায়। রাজপুত্র কারাগারে। রাজপরিবারের সাথে তার সম্পর্ক এখন বিপজ্জনক। যারা তাকে একদিন সাদরে গ্রহণ করেছে, আজ তারা নিশ্চয়ই তাকে সে নজরে নেবেনা। অথচ রাজপুত্র জালালউদ্দীনের সাথে তার যোগাযোগ করা চাই–ই। জালালউদ্দীনের পাত্তা লাগানো না গেলে এখানে তার অবস্থান অর্থহীন। তার চেয়ে রাজধানীর বাইরে গিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অনেকখানি অর্থবহ।

সেই সাথেই তাজউদ্দীনের মনে পড়লো সুফী সাহেবের মন্তব্যের কথা। মুসলমানদের নিরাপত্তার স্থায়ী বিধান জালালউদ্দীন যদুর সাথেই সম্পৃক্ত। বাইরে গিয়ে সাময়িক ও খন্ড প্রতিরোধ পয়দা করে কোন স্থায়ী সমাধান আসবেনা। জালালউদ্দীনকেই আনতে হবে মসনদে। শেষ সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে টিকিয়ে রাখতে না পারার লোকসানটা একমাত্র জালালউদ্দীনের মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে –যদি তাকে মুক্ত করা সম্ভব হয় এবং মুক্ত করে মসনদে আনা যায়।

খাটো করে ধুতিপরা ছদ্মবেশী সেপাইদের আশেপাশে নিয়ে তাজউদ্দীন আবার সকালেই রাজধানীতে প্রবেশ করলো। কিয়ৎদূর অগ্রসর হতেই সে অবাক হয়ে দেখলো –কাঠখড়ি, মাছ–তরকারী এবং চাউল–ডাউলের ভার নিয়ে ও তেল–লবণ–মরিচ–মস্‌লার আস্ত আস্ত দোকান ভারে তুলে নিয়ে গ্রাম থেকে বেশ কিছু মুসলমান রাজধানীতে যাচ্ছে। উৎসুক হয়ে তাজউদ্দীন তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো–গতরাতে রাজার লোকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এলান দিয়ে এসেছে যে, ব্যবসায়ী, দোকানদার এবং তরিতরকারী ও ফসল উৎপাদনকারী মুসলমানদের হেফাজত করার দায়িত্ব খোদ রাজার। তাদের ওপর কেউ কোন জুলুম কখনও করবেনা। তারা রাজধানীতে আসবে এবং নিশ্চিন্তে ব্যবসা–বাণিজ্য ও কেনাবেচা করবে। এতে যারা অন্যথা করবে, তাদের কোন বিপদ হলে সে দায়িত্ব রাজা গ্রহণ করবে না।

তাজউদ্দীন এর কারণ জানতে চাইলে বক্তা ফের বললো যে, রাজধানীর বড় বড় ব্যবসায়ীরা বেশীর ভাগই মুসলমান। দোকনদারেরাও তাই। রাজধানীতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেশীর ভাগই মুসলমানেরাই সরবরাহ করে থাকে। তরিতরকারী খড়ি–লাকড়ী, চাউল–ডাউল মুসলমানেরাই নিয়ে আসে রাজধানীতে। এ সব কাজে হিন্দুরা এখনও বেশী এগুতে পারেনি। রাজার ফৌজ গতকাল অকস্মাৎ তাদের ওপর চড়াও হওয়ায় তারা রাজধানী থেকে পালিয়েছে। এতে করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে একদিনেই রাজধানীতে হাহাকার



www.pathagar.com

পড়ে গেছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা দোকান পাট বন্ধ করায় ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়েও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অধিক আক্রোশে জিদের মাথায় মহারাজ মুসলমান হত্যার এই ঢালাও আদেশ দিয়েছিলেন। আদেশ দেয়ার পরই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন এবং এখানকার দোকানদার, তেজারতদার ও কুলী মজুরদের হেফাজতির দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন।

তাজউদ্দীনের হাসি পেলো। খলের কোন অভাব নেই ছলনার। আজ এদের প্রয়োজন, তাই আজ তিনি নিজে এসেছেন এদের দায়িত্ব নিতে। কাল যখন এ সবের জন্যে আর প্রয়োজন হবেনা এদের, এসব কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে অমুসলমান সম্প্রদায়, তখন এইসব মুসলমানদের লাশগুলো লাথি মেরে পগারে ছুড়ে দেবেন ছেঁড়া জুতোর মতো।

তবু বর্তমান অবস্থায় এই বার্তা শুনে তাজউদ্দীন বর্তে গেল। অবলম্বন একটা পাওয়া গেল গ্রহণযোগ্য। সেপাইদের নিয়ে তার রাজধানীতে অবস্থানের অবলম্বন। বসার জায়গা পাওয়া গেলে শোয়ার জায়গা মিলিয়ে দেবেন আল্লাহ পাকই।

তাদের সকলের কয়েকদিনের খরচ বাবদ যে অর্থ তাজউদ্দীনের সাথে ছিল তা পরিমাণে অনেকই। অল্প কিছু বাদে এই অর্থ তামামই সে নিয়োগ করলো তেজারতে। আলু-বেগুন, তরিতরকারী, চাউল-ডাউল, কাঠখড়ি ইত্যাদি বাজার থেকে পাইকারী দরে কিনে বাজারেই বিক্রি করার তেজারতি। ছদ্মবেশ খুলে, ঝুড়ি-ডালী, ছালা-বস্তা নিয়ে রাজ প্রাসাদের নিকটতম বাজারে এক জায়গায় জটলা করে নানা দ্রব্যের দোকান খুলে বসে গেল তাজউদ্দীনের সেপাইরা। দিনান্তে দেখা গেল, এ থেকে যা মুনাফা আসছে, তাই দিয়ে তাদের বিশ ত্রিশজন মানুষের আহার খরচ বাদেও কিছু অতিরিক্ত হাতে থাকছে।

দুই একদিন এখানে সেখানে কাটলো। দোকানদার বিবেচনায় অমুসলমান সকলেই তাদের সাথে সৎব্যবহারই করতে লাগলো। অন্তত বেচাকেনার বাজারে বা তার আশেপাশে মুসলমানদের ওপর আর কোন হামলার তেমন খবর পাওয়া গেল না।

এরপর বাজারেরই এক অবহেলিত ও পশ্চাদপদ এলাকায় এক মহাজনের পুরাতন এক গুদামবাড়ি ভাড়া করে ওখানেই তারা আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিলো। তাজউদ্দীন নিজে কোন দোকান খুলে বসলো না। সে তাদের সাথেই গা ঢাকা দিয়ে আসল ধান্ধায় রয়ে গেল। সেপাইরা বাজারে বসে দোকানদারী করে, তাজউদ্দীন ছদ্মবেশে এদিক ওদিক ঘোরে আর রাজ প্রাসাদের বিশ্বস্ত জনের তালাশ করে।

জালালউদ্দীন যদুর সৎস্বভাব ও সদয় সুন্দর আচরণের জন্যে রাজ প্রাসাদের রক্ষী-প্রহরী, সেপাই-শান্ত্রী ও দাস দাসী সকলেই তাকে ভালবাসতো। এরমধ্যে কয়েকজন ছিল রাজপুত্রের জন্য একবারেই নিবেদিত প্রাণ। রাজপুত্রের কল্যাণে তারা অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। এদের একজন কেদার নাথ। সে অন্দর মহলের খাস বান্দা। তারপরেই মোহন চাঁদ, জনার্দ্দন, বিক্রমবাহু, ভূতেশ্বর ও আরো কয়েকজন। এরা কেউ রক্ষী, কেউ প্রহরী, কেউ হুকুম বরদার ও নওকর নফর। রাজার চেয়ে এরা রাজপুত্রকে পেয়ার করতো হাজারগুণে অধিক। সেই সূত্রে



www.pathagar.com

তারা তাজউদ্দীনকেও অত্যধিক সমাদর করতো। এ ছাড়া, কিছু সেপাই-সেনা ও রাজদরবারের বেশ কয়েকজন সভাসদও রাজপুত্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করতো।

তাজউদ্দীন ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদের আশেপাশে ঘোরে আর ভাবে, এদের সবাই কি বদলে গেছে একদিনে? এদের কারো সাথেই কি দেখা হবেনা তার? রাজপুত্রের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম যে একটা পেতেই হবে তাকে।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাজউদ্দীন একদিন দেখে-কেদারনাথ বাউলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর বিভিন্ন জনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তার ভাব দেখে তাজউদ্দীনের মনে হলো সে কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কেদারনাথ হাঁটতে হাঁটতে এক নির্জন জায়গায় এলে তাজউদ্দীন তাকে অনুসরণ করে পাশে এসে দাঁড়ালো। চোখ তুলে তাজউদ্দীন এবার আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধের ওপর হাত রাখতেই কেদার নাথ চমকে উঠে বললো কে?

তাজউদ্দীন বুঝলো, কেদার নাথ চিনতে পারেনি তাকে। তাজউদ্দীন তার মস্তকাবরণ খানিকটা সরিয়ে তার মুখখানা আরো অধিক মেলে ধরলো। তার মুখের দিকে তাকিয়েই ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো কেদারনাথ। বললো-হুজুর, কয়দিন ধরে পাগলের মতো আপনাকেই আমি খুঁজে ফিরছি।

তাজউদ্দীন অবাক হয়ে বললো-বলো কি?

কেদারনাথ বললো-শুধু আমি একা নই হুজুর, মোহনচাঁদ, ভূতেশ্বর, বিক্রম-আমরা সকলেই যে যখন ফাঁক পাচ্ছি, খোঁজ করছি আপনার।

তাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। কুমার হুজুরের ধারণা, তাঁর দুরবস্থার খবর শুনে আপনি কিছুতেই নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। অবশ্য ছুটে এসেছেন রাজধানীতে।

তুমি কি করে জানলে তা? তিনি তো এখন কারাগারে?

কারাগারেই তো তার সাথে আমার কথা।

এ্যাঁ!

উনি তো কারাগারের পাক খেতে পারেন না। তাই রাণীমার সুপারিশে অন্দর থেকেই খানা দেয়া হয় তাঁকে আর সেই খানা নিয়ে আমিও তো দুইবেলা যাই তাঁর কাছে।

তাজউদ্দীন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো-অন্দর থেকে খানা দেয়া হয়?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

সেই খানা খান উনি?

তাউদ্দীনের বুকখানা দুরুদুরু করতে লাগলো। এখনই বুঝি ধ্বসে যায় তার কল্পনায় গড়া প্রাসাদ। ইসলামে যদি অটল না থাকে জালালউদ্দীন, বিজাতির হাতের পাকানো অন্দরের খানা খাওয়ার মতো যদি কমজোর হয় তার ইমান, তাহলে আর বাংলা মুলুকের মুসলমানদের কোন কল্যাণে লাগবে সে।



www.pathagar.com

তাজউদ্দীনের প্রশ্নের জবাবে কেদার নাথ এদিক ওদিক চেয়ে কণ্ঠস্বর আরো খানিক খাটো করে বললো- পাগল হয়েছেন হুজুর। জান গেলেও ওগুলো ছুঁতে যাবেন তিনি? ওগুলোতো লোক দেখানো খানা। আসল খানাতো বাইরে থেকে আসে।

বলো কি!

তাজউদ্দীনের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কেদারনাথ বললো-হ্যাঁ হুজুর। প্রথম দিকে দু'একদিন তো স্রেফ অনাহারেই ছিলেন উনি। অন্দরের খানা মুখেই দেননি। তারপর থেকে বাইরের এক মুসলমান বাবুর্চির পাক করা খানা অন্দরের ঐ খানার সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যাই। তবে এতে একটা কাজ হয়েছে হুজুর। অন্দরের খানা কারাগারে যাচ্ছে দেখে মহারাজ খুব খুশী। তাঁর ধারণা, আস্তে আস্তে এইভাবে কুমারের মন-মতলব পাল্টে যাবে। আর তাই কুমারকে যে নির্যাতন করার কথা ছিল, ওটাও বাদ দিয়েছেন।

আচ্ছা।

বাইরে থেকে খানা আনার এমন ব্যবস্থা করেছি যে, শত চেষ্টা করলেও কাকপক্ষীতে সন্ধানটি তার পাবেনা। আর এতে করে কুমার হুজুরকে আর অনাহারে কখনও থাকতে হবেনা হুজুর।

খুশীতে কেদারনাথ দুলতে লাগলো। তার আচরণেই তাজউদ্দীন বুঝলো, রাজপুত্রের প্রতি কেদারনাথের দরদ আগের চেয়ে বরং খানিকটা বেড়েছে বৈ একবিন্দুও কমেনি। তবুও সে কৌতূহল বশে প্রশ্ন করলো-ওগুলো যে মুসলমান বাবুর্চির পাক করা খানা, উনি কি করে তা জানবেন? উনিতো আর দেখতে কিছু পাচ্ছেন না?

কেদার নাথ সোচ্চার কণ্ঠে বললো-উনাকে দেখতে হবে কেন? আমি নিজে দেখে নিয়ে যাই যে। আমি তো আর হুজুরের কাছে মিথ্যা বলতে পারিনে?

সাব্বাস।

হুজুর বলেছেন-আপনার দেখা পেলেই উনাকে তা জানাতে। আপনাকে অনেক কথা বলবেনউনি।

কিভাবে?

পত্র লিখে। আপনি কোথায় থাকছেন তা বলে দিন। আমি আজকে সন্ধ্যার মধ্যেই ছোট হুজুরের পত্র এনে দেবো আপনাকে।

একটু চিন্তা করে তাজউদ্দীন বললো-তা বলছি। কিন্তু তোমার কি মনে হয়- রাজ প্রাসাদে এখন আমার যাওয়া উচিত?

কেদার নাথের মুখমন্ডল মলিন হলো। সে বিষণ্ন কণ্ঠে বললো-আমার মনে হয় আপনার সেখানে না যাওয়াই মঙ্গল হুজুর। আপনার ওপর মাহরাজ আদৌ খুশী নন। তাঁর ধারণা- আপনিই মাথা খেয়েছেন ছোট হুজুরের। আপনার সাথে মিশে মিশেই ইসলামের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ বেড়েছে।

কেদার নাথ!



www.pathagar.com

এ ধরনের আলোচনা এখন অন্দরমহলে প্রায়ই হয় হুজুর। মহারাজকে নিজে বলতে শুনেছি।

হুঁঃ।

আপনি গেলেই যে কোতল করবেন আপনাকে তা হয়তো ঠিক নয়। তবে ছোট হুজুরকে পুনরায় তাঁর পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে আনার টোপ হিসাবেও উনি আপনাকে ব্যবহার করতে পারেন। এ জন্যে যেখানে যে সুযোগটুকু দেখছেন, তাই তিনি ব্যবহার করছেন, কোন ন্যায় অন্যায় দেখছেননা।

তাজউদ্দীন অবাক হলো। বিস্মিত কণ্ঠে বললো–বলো কি! এতটা চিন্তাও করো তুমি?

কেদারনাথ বললো, কেন করবোনা হুজুর! মহারাজকে তো দেখে আসছি সেই ছোট বেলা থেকে। নিজের স্বার্থে এমন কাজ নেই যা করতে উনার বিবেক বিবেচনায় বাধে। ওখানে গেলে আপনাকেই হয়তো বলে বসবেন –যে ভাবেই হোক ওকে তুমি ফিরিয়ে দাও পূর্ব ধর্মে, নইলে তোমাকে কোতল করা হবে, বা ঐ একই কথা ছোট হুজুরকেও বলতে পারেন। তাঁকে এই বলে হুমকি দিতে পারেন যে, তিনি হিন্দু ধর্মে ফিরে না এলে তাঁর দোস্তকে কোতল করা হবে।

তাজ্জব হয়ে কিছুক্ষণ কেদারনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইলো তাজউদ্দীন। এরপর সে খুশী হয়ে বললো–সাব্বাস। তুমি ঠিক আমার মনের কথাই বলেছো। এমন একটা সন্দেহই আমার মনেও জেগেছে। আচ্ছা, তুমি এসো আমার সাথে, যোগাযোগের ঠিকানা তোমাকে দেখিয়ে দেই।

এরপর তাজউদ্দীন কেদারনাথকে নিয়ে গিয়ে তাদের কয়েকটি দোকান দেখিয়ে দিয়ে বললো–এদের যে কারো সাথে যোগাযোগ করলেই আমার সন্ধান পাবে, বা পত্র দিলে তা আমার হাতে পড়বে।

কেদারনাথ মাথা হেলিয়ে বললো, জি আচ্ছা।

কেদারনাথ প্রস্থানোদ্যোগ করলে তাজউদ্দীন বললো, আর শোনো, তুমিই পারো আর আমার দোস্তের বিশ্বস্ত লোকজনদের যে কেউই পারুক, দিনের মধ্যে অন্তত একবার করে যোগাযোগ করবে আমার সাথে। রাজদরবারের ভেতরে এবং বাইরে কোথায় কি ঘটছে, যথা সম্ভব সে সব জানিয়ে যাবে।

জি আচ্ছা।

হুশিয়ার! কোন ক্রমেই এসব ফাঁশ যেন না হয়।

ঘুরে দাঁড়ালো কেদার নাথ। মাথা তুলে বললো হুজুর! আমরা পুরানো লোক। এসব কাজে ঝুঁকি যে কতখানি, তা জেনেই এ কাজে হাত দিয়েছি। ছোট হুজুরের এই দুর্দিনে কি করে আমরা চুপ করে থাকি বলুন? এসব ফাঁশ হলে শুধু আপনারই বিপদ হবেনা হুজুর, আমাদের মাথাই আগে যাবে। আমরা যে কয়জন এর মধ্যে আছি মুখ্যু সুখ্যু হলেও তারা কেউ কাঁচা নই, সবাই পাকা লোক। তবে ঐ যে একটা কথা আছে–নসীবের মার এলে পর্বতও ধুলার ঢিপি।

ঃ বহুৎ খুব। এবার তুমি এসো।



www.pathagar.com

ঃ জি আচ্ছা হজুর–

কেদার নাথ খুশী হয়ে চলে গেল।

সেইদিনই সাঁঝের বেলা জালালউদ্দীনের খত এলো তাজউদ্দীনের হাতে। দীর্ঘ এক চিঠি কারাগার থেকে জালালউদ্দীন লিখেছেঃ

প্রিয় দোস্ত,

বাদ তসলীম জানাই, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানি যে, শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম। আমি জানতাম, আমার এই মুসিবতে আপনি দূরে থাকতে পারেন না। আমার সব কথাই আশা করি ইতিমধ্যে শুনেছেন। শুনে আপনি তাজ্জব হবেন, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, আমার জন্মদাতা আমার সাথে রাজনীতির নামে এরকম একটা জঘন্য চাতুরী করবেন। পুত্র হয়ে পিতার সাথে যে চাতুরী করতে পারিনি আমি, তার চেয়ে ঘৃণ্যতম চাতুরী আমার এই পিতৃরূপী অমানুষ আমার সাথে করেছে। দিলের আবেদনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কতবড় আহাম্মকী যে করেছি আমি, তা অল্প কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই ও প্রসঙ্গ থাক। আমার নির্বুদ্ধিতার ফিরিস্তি তুলে ধরে বাহুল্য বাড়াবো না।

দোস্ত, আপনি এখন আমার এক মস্তবড় ভরসা। আর তাই আপনার সাহায্য এখন আমার একান্ত প্রয়োজন। মুক্তি আমার পেতেই হবে। মসনদে আমাকে বসতেই হবে এবং এই জালিমের জুলুম থেকে আমার কওমকে নাজাত আমাকে দিতেই হবে। আর তাই মেহেরবানি করে আপনি যেভাবেই হোক, তৌহিদ বেগ সাহেবের সন্ধান করুন এবং তাঁকে আমার মদদে নিয়োজিত করুন। মুখের কথায় আর কোন কাজ এখানে হবে না। এখানে প্রয়োজন শক্তি। শক্তি কিছু আমার পক্ষেও আছে। আমাদের সেনা বাহিনীতে এমনও বেশ কিছু লোক আছেন যারা আমার জন্যে জান কোরবান করতেও তৈয়ার। এখন শুধু প্রয়োজন এ ব্যাপারে একজনের নেতৃত্ব নেয়া।

আমি চাইবো, তৌহিদ বেগ সাহেব এসে এই নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। তাঁর হিম্মতের অনেক খবর আমি শুনেছি এবং জেনেছি। এই তুফানে কিস্তি ভাসালে একমাত্র তাঁর মতো কান্ডারীই কিস্তিটাকে কূলে ভিড়াতে পারবেন। বাংলা মুলুকের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক হিম্মতদার আর কাউকে আমি জানিনা যে তার কথা বলবো। আমি কোন বিধর্মী নই। আমি একজন মুসলমান। একজন মুসলমানের মুসিবতে তৌহিদ বেগের মতো কওমের একজন বাহাদুর খাদেম অবশ্যই সোচ্চার হবেন–এ বিশ্বাস আমার আছে। তাঁর সেপাইদের নিয়ে তিনি এসে নেতৃত্বে দাঁড়ালে গোপনে আমার পক্ষেও একটা বড় রকমের শক্তি গড়ে উঠবে। আমার কয়েকজন ছোট ছোট সেনাপতি বন্ধু ও দু' একজন বড় ধরনের শুভাকাঙ্খীও আছেন। রাজার ফৌজে চাকুরীরত থাকায় তাঁরা সরাসরি কিছু করে উঠতে পারছেন না। তৌহিদ বেগ সাহেব এলেই তাঁদের সন্ধান তাঁকে জানাবো। এই সব সেনাসৈন্যেরা অমুসলমান হলেও দিল এঁদের বড়। তাঁরা মনুষত্বকেই বড় করে দেখেন, ধর্মকে নয়। বিবেকবান ও দরাজদিল যে কোন ধর্মের লোকের অধীনে এঁরা নকরী করতে প্রস্তুত কিন্তু কোন বিবেকহীন বেইমানের অধীনে নয়।

www.pathagar.com

দোস্ত, তাই আমার আরজ, আমার পত্র পাঠ মাত্র আপনি বেরিয়ে পড়ুন এবং তৌহিদবেগ সাহেবের সন্ধান করুন। নিজে তাঁর সন্ধান করতে না পারলে আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের খানকা মোবারকে যান। তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম জানিয়ে তাঁর কাছে তৌহিদ বেগ সাহেবের সন্ধান চান। আমার বিশ্বাস, মজলুম্ এই খাদেমের আহবান সুফী সাহেবের দিলে অবশ্যই সাড়া জাগাবে।

আজ এই পর্যন্তই।

আরজ গোজার,
জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্।

পত্রপাঠ অন্তে তাজউদ্দীনের ঠোঁটে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠে আবার তা মিলিয়ে গেল। এই পত্রের কি জবাব সে লিখবে ভাবতে লাগলো। পত্র নিয়ে কেদারনাথ বাজার থেকে সেপাইয়ের সাথে এবার তাদের গুদামবাড়িতেই এসেছে এবং জবাব নেয়ার ইরাদায় সে অদূরেই এন্তেজারে আছে। তাজউদ্দীন ফাঁপরে পড়লো।

শেষ পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ কোন জবাব লিখতে না বসে আগামীকাল জবাব নিতে আসার কথা বলে তাজউদ্দীন আপাতত বিদেয় করলো কেদারনাথকে।

সারারাত ভেবেচিন্তে প্রত্যুষেই তাজউদ্দীন জালালউদ্দীনকে পত্র লিখতে বসলো। সে লিখলো

দোস্ত,

সালাম অন্তে জানাই, কেদার নাথের হাতে গত সন্ধ্যায় আপনার পত্র পেয়েছি। পত্র পাঠে আপনার দিলের অবস্থা অনুধাবন করতে পারছি। আল্লাহ পাকের কাছে আপনার জন্যে রহম কামনা করা ছাড়া সান্ত্বনা দেবার জবান আমার নেই।

দোস্ত, যে কথা আজও আপনাকে বলিনি, এই প্রেক্ষিতে আজ তা বলতে হচ্ছে আমাকে। আমি সত্যিসত্যিই কোন ফেরীওয়ালা বা ব্যবসায়ী লোক নই। আমি একজন সৈনিক। পেশায় এবং নেশায় আমি আজীবন এক সেপাই। আপনার পত্রের অধিকাংশ স্থান জুড়েই বিরাজ করছে তৌহিদবেগ। আপনি তৌহিদবেগের মদদ চান। কিন্তু দোস্ত, নিরাপত্তার খাতিরেই তৌহিদবেগ আজও উহ্য আছে সবার কাছে। উহ্যই সে থাকবে। যে মদদ তৌহিদবেগের নিকট থেকে চান আপনি, সে মদদ আমার কাছেই পেতে পারেন। যে দায়িত্ব তৌহিদবেগকে দিতে আপনি আগ্রহী, সে দায়িত্ব আমার ওপরই ছেড়ে দিন। আসলে তৌহিদবেগ আর আমার মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। তাজউদ্দীনকে বাদ দিলে তৌহিদবেগ অস্তিত্বহীন। তৌহিদবেগের তামাম লড়াই তাজউদ্দীনকেই লড়তে হয়, তৌহিদবেগের তামাম ফৌজ তাজউদ্দীনকেই চালাতে হয়। তৌহিদবেগ আপনার পক্ষেই ছিল, আছে এবং থাকবে। তৌহিদবেগের কাজ তাজউদ্দীন করবে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আপনাকে যদি কোনদিন মুক্ত করতে পারি, সেদিন আপনাকে



www.pathagar.com

খোশআমদেদ তৌহিদবেগই আগে জানাবে। তাজউদ্দীন তার পরে। কাজেই এ নিয়ে আপনার পেরেশান হওয়ার কারণ নেই।

দোস্ত, এহেন দুর্দিনে আমি একেবারেই নাঙ্গা অবস্থায় পাড়ুয়ায় আসিনি। কয়েকজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়েই এসেছি। বাদবাকীরা বাইরে আছে। সংখ্যায় তারা অধিক না হলেও নিতান্তই নগণ্য নয়। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এখন বাইরে তাদের অনেক কাজ। প্রয়োজন মতো আস্তে আস্তে তাদেরকেও হাজির করবো। আপনার পক্ষের সেনা সৈন্যদের হদিশ পরবর্তী পত্রের মাধ্যমে জানাবেন। অতপর যা করার আমিই সব করবো। আপনি শুধু আপনার পিতার সাথে সমঝোতার অভিনয় করে কাল ক্ষেপণ করতে থাকুন। রাজধানীতে মোটামুটি একটা শক্তি পয়দা করতে পারলেই আল্লাহর রহমে সুরাহা একটা অবশ্যই করতে পারবো। সব সময় একটা কথা স্মরণ রাখবেন, মুসিবতে ধৈর্য একটা মস্তবড় গুণ। অন্যকথায় ইন্নাল্লাহা মায়াস্ সোয়াবেরীন।

আপনার দোস্ত
তাজউদ্দীন।

পত্রলেখা শেষ হতেই হাজির হলো কেদারনাথ। তাজউদ্দীনের পত্র নিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল এবং সাঁঝওয়াক্তের মধ্যেই ফের জালালউদ্দীনের জবাবও এনে দিয়ে গেল।

তাজউদ্দীন একজন সৈনিক এবং সংগ্রামের নেতৃত্ব তাজউদ্দীনই স্বেচ্ছায় নিতে আগ্রহী জেনে জালালউদ্দীন তার পত্রে যারপরনাই খুশী প্রকাশ করেছে এবং তার বিশ্বস্ত লোকজনদের ঠিকানা-হদিস দিয়েছে। সেই সাথে সে তাজউদ্দীনকে জানিয়েছে যে, তার লোকজনদেরও এই মর্মে সে পত্র প্রেরণ করছে এবং বাদবাকীদের সাথে কেদারনাথ নিজেই যোগাযোগ করবে: তাদের নিয়ে তাজউদ্দীনকে আদৌ কোন তকলিফ পেতে হবেনা। শুধু তাজউদ্দীন তার পরিচয়টা দিলেই তারা সাগ্রহে তার ঝান্ডা তলে চলে আসবে।

হলোও ঠিক তা-ই। তাজউদ্দীনের ডাকে সকলেই এক বাক্যে সাড়া দিলো। জালালউদ্দীনের সেনাপতি সমর্থকদের একজন ছাড়া সকলেই তাদের সমর্থন জানিয়ে দিলেন। দিলেন না যিনি, তিনি রায় রাজ্যধর রায়। বিরোধিতাও করলেন না তিনি। সক্রিয় ভূমিকাও তার পক্ষ থেকে এলোনা। কেদারনাথও তাঁর ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করলো না। তাঁকে ছাড়াই কয়দিনের মধ্যে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে, যদিও পর্যাপ্ত নয়, তবু শক্ত একটা বাহিনী গড়ে উঠলো। রাজধানী থেকে অল্প কিছু দূরে এক নিভৃত স্থানে বসে তাজউদ্দীন এবার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে লাগলো। রাজ প্রাসাদের বিশ্বস্ত নওকর নফরের দল যোগাযোগ অব্যাহত রেখে অহরহ বার্তা সরবরাহ করতে লাগলো। পাড়ুয়ার রাজবাহিনীতে নিয়োজিত এ পক্ষের সেনাসৈন্যরা প্রকাশ্যে রাজার পক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে না এসে তাজউদ্দীনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাজউদ্দীনের হুকুমের এন্তেজারে রইলো।



www.pathagar.com

# ১৬

যমুনা সান্যালের আখেরাত এখন স্রোতের পানার চেয়েও অনিশ্চিত। ত্রিমুখী চাপে পড়ে এখন তার প্রাণান্ত অবস্থা। রাজা গণেশ চান যমুনাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে। তিনি চান, বিয়ে করার প্রলোভন দিয়ে জালালউদ্দীনকে পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে আনুক যমুনা। যমুনাকে হত্যা করার ভয় দেখিয়েও জালাল উদ্দীনকে যদু নারায়ণ বানাতে চান রাজা গণেশ।

অবনীনাথ সান্যাল চান যথাশিগগির যমুনাকে অন্যত্র বিয়ে দিতে। যমুনার দুর্নিবার জালাল প্রীতির কারণে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বহুলাংশে খর্ব হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তার মতো প্রতাপশালী কুলীন বামুনের মাথা একমাত্র ঐ যমুনার কারণেই দিনে দিনে জমিনের কাছে নেমে যাচ্ছে। পাঁচজনের পাঁচরকম উপহাসের সাথে স্বগোত্রীয় স্বজনদের অহরহ খোঁটা শুনতে হচ্ছে। যমুনাকে যথা শিগগির বিয়ে দিয়ে এই পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান তিনি।

অন্তরাত্মা সমর্থন না করলেও জালাল চায় যমুনা তাকে ভুলে যাক। যদুনারায়ণ বা জালালউদ্দীন নামের কোন কেউ তার জিন্দেগীর সাথে জড়িত ছিল এটাকে একটা বিলকুল দুঃস্বপ্ন মনে করে এ প্রসঙ্গ ঝেড়ে ফেলুক মন থেকে। অন্যত্র বিয়ে হয়ে সে সুখশান্তিতে ঘর সংসার করুক।

যমুনা চায় তার মৃত্যু হোক। এমনটি ঘটার আগে তার বজ্রপাতে মৃত্যু হোক। জালালউদ্দীনের সাথে তার বিয়ে হওয়া না হওয়াটা বড় কথা নয় তার। তার সবচেয়ে বড় কথা, অন্য কাউকেই বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিচারিনী হতে সে পারে না কিছুতেই। দ্বিচারিনী হওয়ার চেয়ে আইবুড়ো হয়ে থাকতেও অনেক তৃপ্তি তার। সামান্যতম সামাজিক বিধানের বিচ্যুতির কারণেও এমন আইবুড়োর সংখ্যা তো কম নয় এখন সমাজে। এ ছাড়া, তার চিন্তা এখন বিয়ে নয়, সুখ শান্তিতে ঘর নয়, তার চিন্তা জালালউদ্দীনের কারা মুক্তি। তার দুর্যোগ মুক্তি।

মহারাজের চাপে পড়ে যমুনাকে কয়েকবার যেতে হয়েছে কারাগারে। মহারাজ তাকে পাঠিয়েছেন জালালউদ্দীনের শক্ত মনকে নরম করতে। যমুনা গিয়ে বার বারই তার শক্ত মনকে আরো অধিক শক্ত করে দিয়ে এসেছে।

এছাড়া যমুনার করার কিছুও ছিলনা। সে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছে তাদের এই বিড়ম্বিত জিন্দেগীর সুরাহা কিছু হলে যদু নারায়ণের মাধ্যমে তা হবে না, একমাত্র জালালউদ্দীনের মাধ্যমেই তা সম্ভব। জালালউদ্দীনকে নরম করে যদু নারায়ণে রূপান্তরিত করলেও সে ফিরে পাবেনা পূর্বজীবন। মান পাবে না সমাজে। শেষ হবেনা আত্মগ্লানির। মসনদ



www.pathagar.com

সে ইহজীবনে পাবেনা। পিতার জীবদ্দশাতে তো নয়ই তাঁর মৃত্যুর পরেও নয়। কট্টর এই ব্রাহ্মণ শাসিত পরিবেশে গণেশের পর মসনদ পেলে যদুর ভাই মহেন্দ্র দেবই পাবে, এক কালের গোমাংসভোজী নষ্ট ব্রাহ্মণ যদু নারায়ণ পাবেনা। তাকে পেতে দেয়া হবে না।

এদিকে আবার জালালউদ্দীন যদু নারায়ণ হলেও তার পিতা অবনীনাথ সান্যাল এই অপবিত্র যদুর সাথে কিছুতেই তার মেয়ে বিয়ে দিতে চাইবেন না এবং তা দিবেন না।

একমাত্র যা করা যেতে পারে তা হলো, জালালউদ্দীনকে যদু করে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ হীনতা তার কাম্য নয়। তার পক্ষে সম্ভবও নয়। কওমের এই দুর্দ্দিনে কওমের কথা না ভেবে জালালউদ্দীন কাপুরুষের মতো তার হাত ধরে পালিয়ে যাক, এ হীনতা যমুনা সান্যাল কল্পনা করতে পারে না। জালালউদ্দীনকে এত বড় বুযদীল সে দেখতে চায় না। ইস্‌লাম প্রীতির ব্যাপারে জালালউদ্দীনের দিলে কোথাও কোন ফাঁক থাকলে অবশ্য এমন চিন্তা করতে পারতো যমুনা। কিন্তু ইসলামকেই সে যখন জানে প্রাণে আঁকড়ে ধরেছে, মুসলমান দেরকেই যখন কওমী ভাই বলে সে সাদাদিলে মেনে নিয়েছে, তখন তার সেই কওমের সাথে বেইমানী করার কুযুক্তি সে কিছুতেই তাকে দিতে পারেনা। জালালউদ্দীনও যে এ যুক্তি মেনে নেবেনা কিছুতেই, যমুনা তা সঠিকভাবেই জানে। আর এতে সে গর্ববোধই করে।

কাজেই জালালউদ্দীন যদি শেষ পর্যন্ত জালালউদ্দীন হয়েই টিকে থাকতে পারে এবং পান্ডুয়ার মসনদ হস্তগত করতে পারে তাহলেই হবে সব অশান্তির সমাধি। তাহলেই সে ভাবতে পারবে অতপর কোন পদক্ষেপ তার পক্ষে সংগত। জালালরূপী যদু নারায়ণের প্রতিষ্ঠা, তার সুখ্যাতি আর সুখশান্তিই অধিক কাম্য যমুনার–নাইবা হলো তার এ জিন্দেগীর তামাম আশা পরিপূর্ণ।

গড়িয়ে যাচ্ছে দিন। কিভাবে এই প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির মোকাবেলা করা যায় এই চিন্তাতেই তাজউদ্দীন বিভোর। শক্তিশালী হলেও মুখোমুখি লড়াইয়ে তার বাহিনী রাজবাহিনীর তুলনায় এখনও খুব নগণ্য। দ্বারী–প্রহরী, বান্দা–রক্ষী, কৃষক–শ্রমিক ও সেই সাথে পেশাদার কিছু সেনা সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনী নিয়ে আগের মতোই গুপ্ত হামলা চালানো চলে, নিয়মিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যায়না। তবে আগের চেয়ে বর্তমানের বিশেষত্ব এই যে, বাহিনী আকারে কিছু বড় এবং তার চেয়েও বড় কথা, এ বাহিনীর শিকড় রাজা গণেশের একদম শয়নকক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

কয়েকজন সেপাই সেনা নিয়ে নিভৃত ডেরায় বসে কর্মপন্থা সম্বন্ধে কিছু আলাপ আলোচনা করে সেদিন সাঁঝ ওয়াক্তের কিছু আগে তাজউদ্দীন তাদের গুদাম বাড়িতে ফিরে আসতেই তার সামনে এলো মোহন চাঁদ। বললো হুজুর, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

তাজউদ্দীন প্রশ্ন করলো কারণ?



www.pathagar.com

মোহন চাঁদ বললো, আপনাকে একটু সান্যাল বাড়িতে যেতে হবে।

তাজউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কেন? সান্যালবাড়িতে কেন?

যমুনা দিদি ! কথা বলবেন আপনার সঙ্গে।

যমুনা দিদি। কোন যমুনা? অবনীনাথের কন্যা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেকি!

তাজউদ্দীনের চোখ দুটি ফুটে উঠলো। ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে সে বললো সর্বনাশ।

মোহন চাঁদ বললো–হুজুর!

তাজউদ্দীন ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, তোমরা কি সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে চাও? হত্যা করতে চাও আমাকে?

এবার মোহন চাঁদও তাজ্জব হলো। প্রশ্ন করলো– হুজুর! একথা বলছেন কেন?

জবাবে তাজউদ্দীন বললো–নইলে যে আমি এখানে আছি, এখবর সান্যাল বাড়িতে গেল কি করে?

সান্যাল বাড়িতে যায়নি হুজুর। শুধু যমুনাদিদির কাছেই গেছে।

তার কাছেই বা গেল কি করে?

আমাদের কাছেই তিনি জেনেছেন হুজুর।

তোমাদের কাছে!

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। তিনি তো আমাদের থেকে পৃথক নন। আমাদের দলেরই লোক। বলতে পারেন উনিই আমাদের চালাচ্ছেন।

মানে।

মানে আমরা তো সব গোমুখ্যু চাকর–বাকর মানুষ। মাথায় আমাদের বুদ্ধি কম। কোন অসুবিধা দেখা দিলে তার বুদ্ধিই তো নেই আমরা। তার পরামর্শ মতোই চলি।

বলো কি!

নইলে কি এরকম ঠিক পথে চলতে পারতাম আমরা? কখন কি করে বসতাম আর সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়তাম।

আচ্ছা।

দিদি বললেন, আজকেই ডেকে আনো তাজউদ্দীন ভাইকে। তাঁকে আমার বিশেষ দরকার।

কোথায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করবো আমি? প্রকাশ্যে তো দেখা করা সম্ভব নয়।

আজ্ঞে না। গোপনে উনি দেখা করতে বলেছেন। উনাদের ফুল বাগানের পরেই যে পুকুর আছে, ঐ পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বনের ধারেই আছে এক শিবমন্দির। ঐ মন্দিরের ওখানেই উনি আজ সাঁঝ ওয়াক্তে যেতে বলেছেন আপনাকে।

তুমি ঠিক জানোতো? কোন ষড়যন্ত্র নেই তো আবার এর মধ্যে?

হুজুর।



www.pathagar.com

মোহন চাঁদের চোখে মুখে বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে মর্মাহত হলো। তা লক্ষ্য করে তাজউদ্দীন হেসে উঠে বললো, না, বলছি উনি নিজে বলেছেন তো একথা, না অন্য কাউকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন?

মোহন চাঁদ জোর দিয়ে বললো–নিজে হুজুর, নিজে। দিদিমনি নিজে এসে গোপনে আমাকে এ কথা বলে গেলেন। অন্যে বললে, যাচাই না করেই অসবো আমি?

তাজউদ্দীন আশ্বস্ত হয়ে বললো–ও আচ্ছা।

মোহন চাঁদ তাকিদ দিয়ে বললো–আপনি আসছেন তো হুজুর? দিদি মনিকে জানাতে হবে এ কথা।

তাজউদ্দীন সম্মতি দিয়ে বললো আচ্ছা, জানাওগে।

মোহন চাঁদ চলে গেল। ঐদিনই সাঁঝ, ওয়াক্তে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাজউদ্দীন হাজির হলো নির্দিষ্ট ঐ শিবতলায়। এদিক ওদিক চাইতেই এক নারী মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো তার দিকে। খানিক দূরে থেকেই সেই নারীমূর্তি শংকিত কণ্ঠে আওয়াজ দিলো কে? আপনি কি আমার বন্ধু?

যমুনার কণ্ঠ চিনতে পেরে তাজউদ্দীন জবাব দিলো হ্যাঁ, আমি তাজউদ্দীন। আমার বান্ধবী হঠাৎ কি জন্যে আমাকে ডেকেছেন এখানে?

তাজউদ্দীন ছদ্মবেশে ছিল মুখের আবরণ সরিয়ে সে এগিয়ে এসে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। যমুনা সান্যাল ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আমার বড়ই বিপদ বন্ধু। আপনি আমাকে বাঁচান!

বিপদ।

হ্যাঁ মস্তবড় বিপদ। সব আপত্তি নাকচ করে আমার বাপ আমার বিয়ে দিচ্ছেন। আমার কোন কথাই শুনছেন না।

সেকি। এতে মহারাজ কিছু বলছেন না?

বলতেন, যদি আপনার বন্ধুকে আমি হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। তা যখন পারিনি, তখন আমি ভাগাড়ে গেলেইবা কি, আর নর্দমায় গেলেই বা কি। তিনি আর তা দেখতে যাবেন কেন?

হুঁ।

এর ব্যবস্থা কিছু করেন আপনি। যে ভাবেই হোক। নইলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন পথই আর রইবে না আমার।

তাজউদ্দীন চিন্তা করে বললো–কি ব্যবস্থা করবো বলুন? আপনার পিতার সামনে তো যেতে পারছিনে আমি। আর পারলেও তো আমার কথায় কাজ হতোনা কিছু। যমুনা সান্যাল বললো–না, আমার পিতাকে বলে ফায়দা কিছুই হবেনা। আপনি যদি বরপক্ষকে সমঝে দিতে পারেন যে, কনে এ বিয়েতে রাজী নয়, তাহলে হয়তো ফয়সালা একটা হতে পারে।

তাজউদ্দীন বললো–আমি বলবো বরপক্ষকে?



www.pathagar.com

যমুনা সান্যাল ইতস্তত করে বললো–তাছাড়া যে আর কেউ নেই আমার। আপনার বন্ধুকে আমি ভুলতে পারিনি বলে গোটা পাণ্ডুয়াই আমার পর হয়ে গেছে এখন। কোন আত্মীয় স্বজনও আমাকে আর সুনজরে দেখছেন না।

নির্মম হলেও ঘটনা সত্য। তাজউদ্দীন বুঝে দেখলো, সে এখানে হস্তক্ষেপ না করলে যমুনার আর সত্যি সত্যিই সহায় কেউ নেই। ভাল করে বুঝে দেখে তাজউদ্দীন বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি এনিয়ে আর চিন্তা কিছুই করবেন না। এ দিকের সব দায়িত্ব আমার ওপরই রইলো। যখন যা করার আমিই তা করবো। আপনি নিশ্চিন্তে ঘরে যান।

বরপক্ষের ঠিকানা নিয়ে চলে এলো তাজউদ্দীন। পরের দিন সকালেই তাজউদ্দীন ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লো। বরের বাড়ি দমদমা। পাণ্ডুয়া থেকে অনেক খানি দূরে। সে বরের বাড়িতে গিয়ে বরপক্ষের সাথে সাক্ষাত করলো। তাদের আদি–অন্ত তামাম কথা বলার পর কনের একান্ত অনিচ্ছার কথা জানালো। কিন্তু ফল কিছু হলোনা।

যমুনা সান্যালের মানসিকতার খবর পেয়ে পরপর কয়েকটি বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। তাই বিপুল পরিমান যৌতুকের লোভ দেখিয়ে এক লোভী পরিবারের ততোধিক লোভী এক বরের সাথে এই বিয়ে ঠিক করেছেন অবনীনাথ। আশাতীত যৌতুকের লোভে বরপক্ষ তাজউদ্দীনের কোন কথায় কর্ণপাতই করলোনা। বরং তাকেই কিছু কটুবাক্য শুনিয়ে বিদেয় করে দিল এবং বিয়ের আনজাম জোরের সাথে চালাতে লাগলো। তাজউদ্দীন দেখলো সোজা পথে কাজ এখানে হবে না। অবশেষে সে হুমকি পাঠালো বরপক্ষের উদ্দেশ্যে। ঠিকানাহীন পত্রে তাদের জানালো এ বিয়ের আশা ত্যাগ না করলে সমূহ বিপদ আছে তাদের অনেকের নসীবে।

তবুও কাজ হলোনা। এই পত্র পাওয়ার পরও বরপক্ষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলো না। ঐ উড়তি পত্রের ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে তাদের সিদ্ধান্তে অটুট রইলো তারা।

বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো। যমুনা সান্যাল ক্রমেই শংকিত হয়ে পড়তে লাগলো। সে আবার স্মরণ করলো তাজউদ্দীনকে। তাজউদ্দীন নির্বিকার কণ্ঠে জানালো ভয় নেই।

সোনা বাউলের হাতে তাজউদ্দীন পত্র দিলো ভুলু খাঁকে। বরপক্ষকে হুশিয়ারী স্বরূপ একটা ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিল। হাজার ঝামেলার মাঝেও উস্তাদের আদেশ পালন করলো ভুলু খাঁ। বিয়ের আর তিনদিন মাত্র বাকী। ভুলুখাঁ তার কয়েকজন সেপাই নিয়ে রাত্রিকালে ছদ্মবেশে হাজির হলো দমদমায়। হানা দিল বরের গৃহে। বরকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে বিয়ের জন্যে যোগাড়কৃত তামাম দ্রব্যসহ বরের বাড়ির পোশাক–পরিচ্ছদ বিছানা–বালিশ সবার সামনেই ভস্মীভূত করলো তারা। আসার সময় ভুলু খাঁ তাদের এই মর্মে হুশিয়ারি দিয়ে এলো যে, মরণের যদি একান্তই সাধ না থাকে বরের, আর বরের মুন্ডুহীন দেহ যদি দেখার কোন সাধ না থাকে বরপক্ষের, তাহলে এপথে আর তারা যেন পা না তোলে।

এবার সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গেল রবপক্ষ। তারা ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে খবর পাঠালো অবনীনাথের কাছে। শুনে অবনীনাথ হংকার দিয়ে উঠলেন–কি, এত দুঃসাহস। পাপিষ্ঠ যদুর পাপিষ্ঠ মুসলমান সমর্থকেরা ছাড়া এ কর্ম আর কেউ করতে পারেনা।



www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে সান্যাল মহাশয় রাজ প্রাসাদে ছুটলেন। রাজার কাছে গিয়ে তিনি চরম আক্ষেপের সাথে অভিযোগ করে বললেন।–ঐ নরাধম যবনদের এত স্পর্দ্ধা যদি বিদ্যমান থাকে আজও, তাদের ভয়েই এ বিয়ে যদি বন্ধ করতে হয় আমাদের, তাহলে এ রাজ্যে হিন্দুদের নিরাপত্তা বলে আর থাকে কি?

আত্মসম্মানে ঘা লাগলো মহারাজের। তিনিও হুংকার দিয়ে বললেন–তবেরে! দেশের মাটি ভিজে যাচ্ছে পাপিষ্ঠদের রক্তে, তবু এত স্পর্দ্ধা। এ বিয়ে হবেই। আয়োজন চালিয়ে যান আপনারা। বর কনে দুই পক্ষের বাড়িতেই উপযুক্ত ফৌজ মোতায়েন করার ব্যবস্থা এখনই আমি করছি। এছাড়া বর কনের যাতায়াতের পথেও সেপাই দেয়া হবে। দেখি কি করতে পারে দুর্বৃত্তরা।

সেইদিনই দুইদল সেপাই গিয়ে হাজির হলো দুইবাড়িতে। সঙ্গে রইলো এক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। সৈন্যাধক্ষেরা উভয় পক্ষকে নির্ভয়ে এবং ফূর্তির সাথে বিয়ের আয়োজন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করলো। রাজফৌজের মদদ পেয়ে বরপক্ষ নেচে উঠলো পুনরায়। দুই বাড়িতে আবার পুনরুদ্দমে বেজে উঠলো বিয়ের শানাই।

নজরবন্দী যমুনা সান্যাল পত্র মারফত তাজউদ্দীনকে জানালো– বন্ধু, এবার?

তাজউদ্দীন পত্র মারফত জবাব দিলো–ভয় নেই।

রাজফৌজের অত্যাচারে দেশব্যাপী হাহাকার পড়ে গেছে। দলে দলে খুন হচ্ছে বাংলা মুলুকের মুসলমান। ভুলু খাঁ একা কোন তাল সামলাতে পারছে না। আসল ধান্ধা বাদ দিয়ে তাজউদ্দীনেরও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার কোন ফুরসুৎ নেই। তার ওপর বরপক্ষের এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি তাজউদ্দীনের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। এত ঝামেলার মধ্যেও এদিকের একটা ফায়সালা না করলেই নয় তার। যমুনাকে কথা দিয়েছে সে। এ ছাড়া বন্ধুবর জালালউদ্দীনের স্বার্থটাও তো দেখতে হবে তাকে। নইলে ভবিষ্যতে সে জবাব দেবে কি?

সাঁঝের পর তাজউদ্দীন এত্তেলা দিল তার সুদক্ষ নিজস্ব সেপাইদের। পরের দিনই বিয়ে। ভোর হবার আগেই তাজউদ্দীন তার ফৌজ নিয়ে রওনা হলো অভিষ্ট পথে।

বরের বাড়ি দমদমা থেকে শুকানদীঘি হয়ে পান্ডুয়ায় আসার রাস্তা। শুকানদীঘি থেকে দমদমা অনেক দূরের পাল্লা। মাঝখানে বন জঙ্গল আর জনশূণ্য তেপান্তর। পক্ষান্তরে শুকানদীঘি থেকে অবনীনাথের বাসস্থান এবং রাজ প্রাসাদ অনেক খানি নিকটে। শুকান দীঘির সামনেই একটা বন। পথটা ঐ বনের মধ্যে দিয়েই। এমন অনেক বন দমদমা থেকে শুকান দীঘিতে আসার পথেও আছে। এসব বনেরও মধ্যে দিয়েই পথ। কোনটার বা পাশ দিয়ে।

কৌশলগত কারণে অন্য কোথাও না গিয়ে শুকানদীঘির বনের মধ্যেই ফৌজ নিয়ে অবস্থান নিলো তাজউদ্দীন। কয়েকজন সুদক্ষ গুপ্তচরকে বরযাত্রীদের আগমন পথ নিরিখ করার কাজে গোটা পথের মাঝে বসিয়ে দিয়ে রাখলো। খবর আছে তাজউদ্দীনের কাছে–দিবাভাগেই বর আসবে, ফিরেও যাবে দিবাভাগেই, রাতের কোন ঝামেলায় তারা যাবেনা। এও খবর আছে যে, একে দিনের বেলা, তারপরও সকালের ব্যাপার হওয়ায় এবং বরযাত্রীরা সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়ায়, পাহারাদার ফৌজ বেশী বরের সাথে থাকছেনা।



www.pathagar.com

বর নিয়ে রওনা হলো বরযাত্রী। খানিক পরেই খবর এলো তাজউদ্দীনের কাছে। বার্তা বাহক জানালো–সঠিক পথেই অবস্থান নেয়া হয়েছে। এই পথেই চলে আসছে বরসহ বরযাত্রী। আরো সে জানালো–পূর্বের খবর সত্য। সংখ্যায় বরযাত্রীরা অনেক, সেপাই মাত্র কয়েকজন। দিবালোকের পথবোধে এ কয়জন সেপাইও সঙ্গে নিতে পৌরুষে নাকি ঘা লেগেছে বেশ কিছু বরযাত্রীর।

প্রথম প্রথম বরযাত্রীরা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এগুচ্ছিল। বন আসলেই সতর্কভাবে বরের পাল্‌কীর চারদিক ঘিরে একত্র চলছিল। তেপান্তরে এসে তাদের ভীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলো খুব। সেপাইরা হাতের অসি, বরযাত্রীরা বাঁশ লাঠি শক্ত হাতে চেপে ধরে চারদিকে তীক্ষ্ম নজর রেখে অগ্রসর হতে লাগলো। এইভাবে অতিসতর্ক অবস্থায় বনের পর বন তারা পেরিয়ে আসতে লাগলো। শেষ অবধি কোথাও কোন বাধা বিপত্তি না ঘটায় আর রাজধানীর অনেক নিকটে এসে পড়ায়, মনের ভয় ফুরিয়ে গেল তাদের। তারা ধরে নিলো এ ভয় তাদের অমূলক। রাজ শক্তির হাত পড়েছে যেখানে, সেখানে আর বাহাদুরী করার সাহস করে কোন ব্যাটা? রাজার ফৌজের ভয়ে প্রাণ নিয়ে দৌড়ে পালাতে দিশে পাচ্ছেনা যবনেরা। জেনে শুনে রাজার ফৌজের সামনে আসবে তারা। এটা কখনও হয়? পাগল ছাড়া এমন কথা ভাবতে যায় কে?

অতএব আর চিন্তা কি? আনন্দের আধিক্যে এলোপাথাড়ী ভাবে বেহুঁশ হয়ে চলতে লাগলো তারা। বরযাত্রী, বরের পাল্‌কী, রাজার ফৌজ, সব কিছুই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত শূকান দীঘির বনের পথে ঢুকে পড়লো যখন তারা, তখন রাজার ফৌজ চলে এলো অনেক আগে। তার অনেক পেছনে পড়ে রইলো বরযাত্রী। বরের পাল্‌কী তারও পেছনে। রাজধানীর কাছের এই একটি মাত্র বন। এখানে আর বিপদ কি? নিজভাবে বুঁদ হয়ে এক একজন এক এক তালে চলতে লাগলো। বরযাত্রীরা অনেকেই তখন গান ধরেছে মনের সুখে। গানের মৌজে বিভোর হয়ে বরের পাল্‌কী পেছনে ফেলেই এগিয়ে যাচ্ছে তারা। বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে তারস্বরে উত্থিত হচ্ছে গানের সুর–সখী আমায় ধরো–ধরো–

বনের মাঝামাঝি আসতেই রাস্তার দুইপাশ থেকে এক সঙ্গে গর্জে উঠলো তাজউদ্দীনের সেপাইরা ধর ধর।

পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক অন্য কারো ওপর কোন রকম হামলা করতে না গিয়ে তাজউদ্দীনের মুখোশ আটা ছদ্মবেশী সেপাইরা ক্ষিপ্র গতিতে ঘিরে ধরলো বরের পাল্‌কী। অগ্রগামী রাজার ফৌজ আর বরযাত্রীরা তাদের করণীয় স্থির করার আগেই তাজউদ্দীনের সেপাইরা ফের বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজফৌজ আর বরযাত্রীরা হৈ হৈ করে পালকীর কাছে এসে দেখলো পাল্‌কীর পাশেই পড়ে আছে বরের লাশ, কিন্তু তাতে মাথা নেই।

ডুকরে উঠলো বরকর্তা আর বরের নিকটতম আত্মীয় স্বজন। ফৌজসহ কিছু সংখ্যক বরযাত্রী হৈ হৈ করে বনের মধ্যে ঢুকলো। কিন্তু কোথায় কে? এই নিবিড় অরণ্যে কোন পথে গেল তারা, ঠিক কি? এ ছাড়া, কোথায় কে ওঁৎ পেতে আছে, কখন কার ঘাড়ের ওপর কে এসে পড়ে কোনদিক থেকে কে জানে? ভয়ে ভয়ে ফিরে এলো সকলে। এরপর সবাই ভাবতে



www.pathagar.com

লাগলো–এখন কি করা যায়। ভেবেচিন্তে সকলে এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, গৃহে ফিরে না গিয়ে পাল্‌কীতে করে লাশ নিয়ে এইভাবেই যাওয়া হোক রাজধানীতে। অবনীনাথসহ মহারাজকে দেখানো হোক এই বীভৎস দৃশ্য– প্রতিকার চাওয়া হোক এই নৃশংস হত্যার।

পাল্‌কী নিয়ে বরযাত্রীরা রওনা হলো আবার। অবনীনাথের বাড়ি হয়েই রাজ প্রাসাদের পথ। অবনীনাথের বাড়িতে তখন তুফান ছুটছে ধুমধামের। শানাই বাজছে সকাল থেকেই। বাদ্য বাজছে নানা রকম। রং ছড়াচ্ছে যুবকেরা। যুবতীরা দুই হাতে ছিটিয়ে দিচ্ছে আবির। ছেলে–ছোকরা বাল্‌–বাচ্চারা হল্লা করে ছুটে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে।

একটু পরেই তারা কেউ কেউ পথের মাঝে পাল্‌কী সহ বরযাত্রীদের দেখতে পেলো। দূর থেকে দেখতে পেয়েই কনের বাড়িতে শোর পড়লো বর আস্‌ছে বর আসছে–

উল্লাসে নেচে উঠলো অবনীনাথের গৃহ। এখবর যমুনার কানে যেতেই সে ক্ষোভে দুঃখে অজ্ঞান হয়ে গেলো।

ধীরে ধীরে পাল্‌কী সহ এগিয়ে এলো বরযাত্রীরা। অবনীনাথকে তাক করেই এগিয়ে এলো তারা। পাল্‌কী এনে তাঁর সামনে রাখতেই দেখে শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন অবনীনাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল। ছেলেরা চীৎকার করে বলতে লাগলো বরের মাথা কৈ?

একটু পরেই যমুনার জ্ঞান ফিরে আসতেই তার এক বিশ্বস্ত সহচরী কানে কানে বললো সখী, ভয় নেই।

## ১৭

প্লাবন ছুটছে রক্তের। মুসলমানদের রক্তের। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের স্বার্থে রাজধানীতে এ প্লাবনের বেগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে থাকলেও রাজা গণেশ তার তামাম ফৌজকে লেলিয়ে দিয়েছে সারা দেশের অভ্যন্তরে। তারা হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে দেশময়। নির্বিচারে হত্যা করছে মুসলমানদের। দনুজমর্দন গণেশ মুসলমানদের অস্তিত্ব বাংলা মুলুকের মাটি থেকে মুছে ফেলার ইরাদায় হিংস্র পশুর চেয়েও অধিকতর হিংস্র হয়ে উঠেছে। দনুজমর্দন নাম ধারণের আগে তবু মুসলমান হত্যার ব্যাপারে কিছু বাছ বিচারের প্রশ্ন ছিল। সুফী–দরবেশ–মুসল্লীদের ওপরই তখন আক্রোশটা অধিক ছিল। এখন সব একাকার। সকল শ্রেণীর মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করার এক প্রমত্ত নেশায় মেতে উঠেছেন তিনি।



www.pathagar.com

হাহাকার পড়ে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। স্পাইরূপী ঘাতকেরা মুসলমানদের পশুর মতো তাড়া করে ফিরছে। প্রাণভয়ে আতংকিত মানুষ ঘর ছেড়ে মাঠ, মাঠ ছেড়ে অরণ্যে ছুটোছুটি করছে। যে পারছে সে বাংলা ছেড়ে পালাচ্ছে। দেখে-শুনে বুঝে-সমঝে সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব লাশের মতো মূক এবং বধির হয়ে গেছেন।

দিন যত যাচ্ছে মুসলমান পক্ষের প্রতিরোধ তত নগণ্য হয়ে আসছে। অধিকাংশ সেপাই নিয়ে তাজউদ্দীন রাজধানীতে তার কাজে ব্যাপৃত থাকায় এখন নামমাত্র সেপাই নিয়ে ভুলু খাঁ এবং পাশাপাশি মোল্লামুসল্লী আর আলেম নিয়ে শায়খ আনোয়ার সাহেব প্রাণপণ করেও বিপুল প্লাবনের গতি এমন কিছু মন্থর করতে পারছেন না। শায়খ জাহিদ সাহেবকে খানকা শরীফ সামলাতেই প্রাণান্ত হতে হচ্ছে। প্রতিরোধ আর গড়ে তোলে কে?

প্রথমদিকে গ্রামগঞ্জের সাধারণ লোকেরাও কিছু কিছু প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সাহসের সাথে লড়াই করে রাজার ফৌজের সাথে। কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আর প্রশিক্ষণ না থাকায় অভিজ্ঞ আর সুসজ্জিত রাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা কোন সুবিধে করতে পারেনা। বিশেষ করে অশ্ব বাহিনীর সামনে তারা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত প্রতিরোধে নিয়োজিত লোকজন বিলকুলই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দেখে শুনে এ প্রচেষ্টা বাদ দিয়েছে তারা। বাড়িঘর বিষয় সম্পত্তি ফেলে তারা এখন শুধু পালিয়ে বেড়িয়ে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছে আর মরছে।

কোন সম্মুখ যুদ্ধ নয়। মুক্ত মাঠে ছাউনি ফেলে ঘোষিত যুদ্ধ নয়। উভয় পক্ষেরই আকস্মিক আর গুপ্ত হামলার ব্যাপার। রাজার ফৌজ আকস্মিকভাবে চড়াও হচ্ছে বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের ওপর, কখনও বা গুপ্তভাবে চড়াও হচ্ছে রাত বিরাতে। ভুলু খাঁ ও শায়খ আনোয়ার সাহেবেরাও গুপ্তভাবেই জবাব দেয়ার চেষ্টা করছেন গুপ্ত হামলার। আকস্মিকভাবেই রুখে দাঁড়াচ্ছেন আকস্মিক হামলার বিরুদ্ধে।

ভুলু খাঁ এক দুর্ধষ্য সেপাই। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অতি অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তার সেপাইরাও বহুলাংশে তাই। গতি তাদের ক্ষিপ্র। কৌশল তাদের চমক প্রদ। ফলে ভুলু খাঁ আর তার সেপাইদের নাম নিশানার গন্ধটিও রাজার ফৌজ পাচ্ছে না। কোন দিক থেকে আসছে তারা, কোন দিকে ফের যাচ্ছে- এমনকি কারা এই লোকগুলো, এর কোন হদিসই রাজার ফৌজ পায়নি।

কিন্তু শায়খ আনোয়ার সাহেব ও আলেম-উলামা-মুসল্লীরা যুদ্ধ বিদ্যায় অনভ্যস্ত সমাজ-জামাতের লোক। গতি তাঁদের এলোমেলো,কর্মপদ্ধতি অপরিকল্পিত। গ্রামগঞ্জের নিত্যনৈমিত্তিক মারামারি আর হুড়-হাঙ্গামার মতোই তাদের লড়াই করার পদ্ধতি। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা রাজ ফৌজের কাছে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। তাদের ঠাঁই ঠিকানার সন্ধানও রাজার ফৌজ উদ্ধার করলো অনায়াসেই।

শায়খ জাহিদ সাহেব চিহ্নিত ছিলেন আগে থেকেই। খানকা শরীফে আগতদের আশ্রয়দান, প্রতিরোধের আলোচনা, জঙ্গী-ধরনের লোকদের সাথে উঠাবসা- এসব তাঁকে খানকা শরীফে মোতায়েন থেকে অহরহ করতে হয়। সবাই এটা জানে, সবাই এটা দেখে। এ খবর দনুজমর্দন রাজার কাছেও ছিল।



www.pathagar.com

তবু সুফী সাহেবের রক্তের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করা সমীচিন কিনা, এ চিন্তাভাবনা দরবেশের ভয়ে দ্বিধা বিভক্ত দনুজমর্দনের দিলে দোদুল্যমান ছিল। করি কি না করি এমনই একটা অবস্থায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত তখনও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। রাজ ফৌজের ওপর এক পাল্টা হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামান্য এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখোশটুকু খুলে ফেললেন রাজা গণেশ। সুফী সাহেবের খানকার ওপর চড়াও হওয়ার নির্দেশ দিলেন সেপাইদের।

ঘটনাটা খানিকটা শায়খ আনোয়ার সাহেবের কৌশল গত ত্রুটির জন্যেই ঘটলো এবং শায়খ আনোয়ার সাহেব এ হামলার অধিনায়ক রূপে সরাসরি চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

সুফী সাহেবের খানকা মসজিদে জুমার নামাজ অন্তে কয়েকজন মুসল্লী কাতার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন যে, তাঁদের গ্রামে রাজা গণেশের ফৌজ আজ প্রকাশ্য দিবালোকে ঢুকে কয়েকঘর সম্ভ্রান্ত জ্ঞানীগুণী মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। এতে তাঁদের আউরাতেরা আর্তনাদ করে শাপ অভিশাপ দিতে লাগলে, রাজার ফৌজ কয়েকজন পর্দানশীল মুসলমান মহিলাকে ঘর থেকে টেনে এনে চুল ধরে মুক্ত মাঠে গড়িয়েছে এবং লাথি গুড়ির সাথে তাদের বেদম প্রহার করে বে-আব্রু বিবস্ত্র করেছে।

শুনামাত্র লাফিয়ে উঠলেন শায়খ আনোয়ার। সারা দেহের রক্ত তাঁর মাথায় ছুটে এলো। তিনি গর্জে উঠলেন আক্রোশে। এরপর তিনি আক্ষেপ করে বললেন, এ ঘটনাও এখন ব্যাপক হয়ে উঠেছে। জানে মারছে আমাদের তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের মা-বোনদের এই বেইযযতি কি করে আর সহ্য হয়? আমাদের জানমাল সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের এই কওমকে ওরা দুই পায়ে মাড়াবে-জীবন থাকতে এতটা আর সহ্য করি কি করে? প্রতিকার করতে না পারলে এসব দেখার আর শোনার জন্যে বেঁচে থাকা একেবারেই ন্যাক্কার জনক। এসব দেখা আর শোনার চাইতে মওতই হাজার গুণে বেহতর।

হাজেরান মজলিস থেকে সমস্বরে আওয়াজ এলো-ঠিক ঠিক।

শায়খ আনোয়ার বললেন, আমরা মরবোই, কিন্তু ঐ জঘন্য পশুদের আস্ত রেখে মরবোনা। বলুন, সংখ্যায় ওরা কয়জন আর কোনদিকে গেল ওরা?

প্রতিবেদকদের একজন এর জবাবে বললো-ওদের আমরা আমাদের গ্রামের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করতে দেখে এসেছি।

আনোয়ার সাহেব বললেন-এতটার পরও প্রকাশ্যেই ওরা ঘোরাফরা করছে এখনও?

করছে। ওরা আর পরোয়া কিছু করছেনা। ওদের গতিরোধ করার কোন হিম্মত বাংলা মুলুকের মুসলমানদের আর নেই-একথা ওরা দম্ভের সাথে বলে বেড়াচ্ছে আর আসফালন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বটে। সংখ্যায় ওরা কতজন?

সংখ্যায় খুব বেশী নয় ওরা। বড় জোর ত্রিশ চল্লিশ জন।

ত্রিশ চল্লিশ জন?

www.pathagar.com

হ্যাঁ। গ্রামে আমাদের লোক সংখ্যা খুব কম। আশপাশের গ্রাম গুলোও দূরে দূরে। তাই হাতের কাছে প্রয়োজন মতো লোকজন তেমন না পেয়েই পালিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের। নইলে মরেছি তো মরেছিই, ব্যাটাদের আমরা ছিঁড়ে ফেলতাম তখনই।

শায়খ আনোয়ার সাহেব শক্ত কণ্ঠে বললেন ছিঁড়ে ফেলতে হবেই ওদের। বেঁচে থাকার আর অধিকার নেই জালিমদের। ওরা এখন কোনদিকে আসতে পারে বলে আন্দাজ হয় আপনাদের?

থাকলে ওরা ঐ আসে পাশে থাকবে, নইলে ফিরে যাবে পাড়ুয়ায়। এইদিক দিয়েই তো ওদের ফিরে যাবার পথ।

ইতিমধ্যেই বক্তার এক ছেলে এলো বাপের খোঁজে। বাপ তার বেঁচে আছে না মারা পড়েছে ফৌজের হাতে, ছেলে তা জানেনা। বেঁচে থাকলে এই খানকা শরীফেই সে এসে থাকবে, এই ধারণায় ছেলেটি এই খানকা শরীফে এসেছে। অল্প বয়সের ছেলে। না বালক, না যুবক। তার মা তাকে পাঠিয়েছে খোঁজ নিতে।

এসেই সে ঢুকে পড়লো মসজিদ কক্ষে। ঢুকেই সে তার বাপকে কথা বলতে দেখে যারপরনাই খুশী হলো। সে আব্বা বলে খোশদিলে আওয়াজ দিলো।

কুশলগত দু'এক কথার পর ছেলেটির বাপ তাকে প্রশ্ন করলো–রাজার ফৌজ চলে গেছে আমাদের ওখান থেকে?

ছেলেটি বললো–হ্যাঁ। আমি আসার পথে দেখলাম ওরা এখন ঐ বটতলায় বসে আছে।

বাপ বললো–বটতলায় মানে?

ছেলে বললো–মানে ঐ বটতলায়। ভাঙ্গাকলসীর বাজারের ঐ বটতলায়।

চমকে উঠলো বাপ। বললো, সেকি! তুই ঐদিক দিয়েই এলি?

ছেলে বললো–না। ওদের দেখতে পেয়েই আমি এই দিক দিয়ে ঘুরে এলাম। জঙ্গলটার এইদিক দিয়ে একদৌড়ে এসেছি।

ভাঙ্গাকলসী খানকা থেকে পোয়াক্রোশ মাত্র দূরে। এই ভাঙ্গাকলসী হয়েই পাড়ুয়া যাবার সোজা পথ। শায়খ আনোয়ার সাহেব বললেন–বটে। ব্যাটাদের এত বড় সাহস যে, আমরা এখানে এত লোক আছি জেনেও, এই পথে পা বাড়ায়?

অতপর তিনি মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আর অপেক্ষা করার সময় নেই। আপনারা কি তৈয়ার আছেন এইভাবেই?

প্রায় চার পাঁচশো মুসল্লী জুম্মা নামাজে এসেছিলেন, সকলেই একবাক্যে আওয়াজ দিলেন–আমরা তৈয়ার। চলুন এখনই।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে বাঁশ–লাঠি শড়কী–বল্লম ইত্যাদি নিয়ে তৈরী হলেন মুসল্লীরা। রওনা হওয়ার আগে শায়খ জাহিদ সাহেব শায়খ আনোয়ার সাহেবকে বললেন–চাচা, এতটা কি ঠিক হবে?

আনোয়ার সাহেব বললেন কোনটা?

www.pathagar.com

জাহিদ সাহেব বললেন–প্রকাশ্য বাজারে এই রকম খোলামেলাভাবে তাদের ওপর হামলা করলে সবাইকে যে চিনে ফেলবে লোকজন। মুসল্লীদের নিয়ে আমরাও যে ছদ্মবেশে হামলা চালাছি রাজার ফৌজের ওপর, আজ পর্যন্ত এতটা কেউ জানেনা। কিছুটা অনুমান করতে পারলেও, কোথা থেকে আসছে এই হামলা, হামলাকারীরা প্রকৃতপক্ষে কারা, সে সব সম্বন্ধে কেউ এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি।

আনোয়ার সাহেব বললেন–তাই বলে ছেড়ে দেবো এত বড় জালিমদের?

না, বলছিলাম, কোন নির্জন জায়গা দেখে ছদ্মবেশে না এগিয়ে এভাবে পরিচিত হওয়াটা কি ঠিক হবে?

তেমন সুযোগ আর পরিবেশ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তো খোশহালে সরে পড়বে এই পাষন্ডেরা।

কিন্তু–

ইতিমধ্যেই তৈরী হওয়া লোকজন শায়খ আনোয়ার সাহেবকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলো। অনেকেই ইতিমধ্যে এগিয়েও গেছে অনেকখানি। কাজেই চিন্তা করার ফুরসৎ আর নেই দেখে আনোয়ার সাহেব বললেন–যা হয়, তাই হবে। এতবড় জুলুম আর সহ্য করা যায়না। এই জালিমদের ফয়সালাতো করি আগে, এরপর নসীবে যা থাকে তা থাকুক।

ছেলেটার বিবরণ সত্য। রাজার ফৌজ এই ভাঙ্গাকলসীর বট তলাতেই বসেছিল এতক্ষণ। ওখানেই খানিক জিরিয়ে নিয়ে দু'একজন করে সবেমাত্র উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বটতলার পাশেই ছিল পাতলা এক অরণ্য। সেই অরণ্যের আড়াল দিয়ে এসে এই কয়েকশত মুসল্লী অকস্মাত ঘিরে ফেললো সেপাইদের। তারা উঠে ঠিকমতো প্রস্তুত না হতেই শুরু হলো এলোপাথাড়ী মার। এই ত্রিশ চল্লিশজন সেপাইয়ের দুই তিনজন কোন ক্রমে এদিক ওদিক দিয়ে ফস্‌কে মুসল্লীদের আবেষ্টনীর বাইরে আসতে এবং পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে কয়েকটা হিন্দু পরিবারের গৃহকোণে অত্মগোপনে সক্ষম হলো। বাদবাকী তামাম সেপাই গণপিটুনীর চোটে থেঁত্‌লে দুমড়ে গিয়ে ঐ বটতলার মাটিতেই ইহজনমের শেষ শয়নে শায়িত হয়ে রইলো।

প্রকাশ্য দিবালোকে খোলা বাজারের ঘটনা। অনেক লোক এ সময় হাজির ছিল বাজারে। হিন্দু প্রধান এলাকা। এসময়ের উপস্থিত তামাম লোকই হিন্দু। সবাই এরা মহাদেব চক্রবর্তী আর বিষ্ণু পাল নয়। ভোলা ভট্টাচার্য্যও অনেক ছিল এদের মধ্যে। তারা মুসল্লীদের তেমন একটা সানক্ত করতে না পারলেও, দলের নেতা শায়খ আনোয়ার সাহেবকে সনাক্ত করলো সহজেই।

এই হত্যাকান্ডে শায়খ আনোয়ার সাহেবের সক্রিয় ভূমিকার কথা যথা সময়ে রাজার কানে পৌছলো। শুনে গণেশ নারায়ণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন ক্রোধে। কয়েকজন সেনাপতিকে ডেকে তিনি তৎক্ষনাৎ হুকুম দিলেন– আর কোন চিন্তা ভাবনার অবকাশ নেই, দরবেশ বলে খাতির নেই, হামলা চালাও দরবেশের ঐ আখড়ার ওপর। বেঁধে আনো দুর্বৃত্তদের। শায়খ আনোয়ার শায়খ জাহিদ কাউকেই আর ছেড়ে কোন কথা নেই।



www.pathagar.com

হুকুম শুনে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ বললেন–দরবেশকেও কি বাঁধবো মহারাজ? নূর কুতুব–ই–আলমকে?

এ্যাঁ।

অজ্ঞাতেই হোচট খেলেন রাজা গণেশ। মুখে আস্ফালন করলেও দরবেশের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ভয় রাজার মনের অতি গভীরে শিকড় গেড়ে ছিলো। অতীতেরও শিক্ষা আছে। তাই এ প্রশ্নের জবাবে তিনি ইতস্তত করে বললেন–হ্যাঁ, বাঁধতে হবে সবাইকেই। ছেড়ে কাউকে দেবোনা। তবে দরবেশকে এখন নয়। আগে ডাল পালাগুলো সাফ হোক, মূলটাও তুলে ফেলবো সুযোগ মতো।

ঐ সৈন্যাধ্যক্ষই আবার বললেন–তাহলে আজকে গিয়ে প্রয়োজন মতো ফৌজ মোতায়েন করি মহারাজ? বেঁধে আনি দরবেশের বেটা আর নাতিটাকে?

রাজা গণেশ সঙ্গে সঙ্গে বললেন–হ্যাঁ, আর দেখাদেখির দরকার নেই। এতবড় সাহস। আছড়ে মারে রাজার ফৌজ।

হুকুম শুনে সেনাপতিরা প্রস্থানোদ্যোগ করলে রাজা আবার থামিয়ে দিলেন তাঁদের। বললেন –এক কাজ করো তোমরা। হুড়মুড় করে বড় ধরনের কিছু না হয় পয়লা ধাপেই করোনা। ব্যাটা দরবেশের কিছুটা শক্তি–সামর্থ নিশ্চয়ই আছে। অতীতের সুলতানদের সবাইকে বরাবরই দেখেছি তার সামনে ভেড়ার বাচ্চা বনে যেতে। ভেতরে কিছু না থাকলে এমনটি হবে কেন?

রাজার কথায় সেনাপতিরা ঘাবড়ে গেলেন। তাঁরা থতমত করে বললেন–তাহলে?

রাজা আবার উৎসাহ দিলেন তাঁদের। বললেন না, আমি ওসব ফকিরী ফিকিরীর পরোয়া কিছু করিনা। বিশ্বাসও আমি করিনা। ওসব যাদুটোনা করে আর যাকেই ভোলাতে পারুক, আমাকে ভোলাতে পারবেনা। তবে ঐযে একটা কথা আছে–সাবধানের মার নেই? আমাদের তাই সাবধানে আস্তে, আস্তে, এগুতে হবে। সরাসরি বড় কিছু না করে, দরবেশের চর অনুচরদের ওপর হামলা চালাও আগে। তাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করো পয়লা ধাপে। এর পরের ধাপে তাদের বেঁধে চাবুক মারো। এসবে যদি অলৌকিক কিছু না ঘটে, তৃতীয় ধাপে দরবেশের আরো বেশী নিকট ব্যক্তিদের গায়ে হাত ওঠাও। এরপর শায়খ আনোয়ার আর শায়খ জাহিদকে বাঁধো।

আর একজন সেনাপতি এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন–এ দুই জনকে বেঁধে কি এই পাণ্ডুয়ায় আনবো মহারাজ?

রাজা গণেশ আপত্তি করে বললেন না–না, ওসব জঞ্জাল এখানে এনে কাজ নেই। এ ছাড়া খুব একটা প্রকাশ্যে তাদের না বেঁধে, গোপনে বাঁধবে। এরপর এদের এ এলাকা থেকে সরিয়ে একেবারে সোনার গাঁয়ে নিয়ে যাবে। তারপর যা করার সে নির্দেশ আমি পরে দেবো–বুঝেছো?

সেনাপতিরা বললেন–আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, তাই হবে।



www.pathagar.com

অবশেষে রাজা গণেশ আবার তাদের বললেন আজকেই এইভাবে হামলা করতে না গিয়ে আগে দরবেশের ঐ খানকাবাড়ির আশেপাশে গিয়ে আস্তানা গেড়ে বসো। ঘুরে ফিরে দেখো কোথায় কে থাকে, তার সন্ধানাদি যোগাড় করো। তারপর পালাক্রমে হানতে থাকো আঘাত।

সেনাপতিরা বললেন–তথাস্তু।

## ১৮

সারাদেশের হাহাকার রাজধানীতে অবস্থিত তাজউদ্দীনের কানেও এসে অহরহ পড়ছে। দুইকানে আঙ্গুল দিয়ে নিজের প্রস্তুতি নিয়ে সে এক ধ্যানে পড়ে থাকতে চাইছে। ভুলু খাঁ আর শায়খ আনোয়ার সাহেবেরা যে কয়জনকে বাঁচাতে পারেন, সে কয়জন বাঁচুক, বাঁচাতে যাদের না পারেন, তারা মরুক। বাংলা মুলুকের তামাম মুসলমানকে বাঁচানোর এই মূল প্রচেষ্টা ফেলে দু'পাঁচজনকে সাময়িকভাবে বাঁচানোর মতো ফালতু কাজের জন্যে রাজধানী থেকে হটতে সে এখন নারাজ।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে রাজধানীতে পুরোপুরি স্থির থাকতে পারছেনা। মাঝে মাঝে দু'একটা এমন খবরও তার সামনে এসে পড়ছে যা উপেক্ষা করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে মূল কাজ ফেলেও তাকে দু'একবার ছুটতেই হচ্ছে বাইরে।

যমুনা সান্যালের জন্যে তার দিন গেছে একটা। তটিনীর জন্যে এবার একটা রাত দিতে হচ্ছে তাকে। দোষটা অবশ্য তটিনীরই, তার হটকারীতাই এর জন্যে দায়ী। সে যা করে বসেছে এ মুহূর্তে, তাতে এমন একটা পরিস্থিতি আচানক কিছু নয়।

বন্ধ হলো তটিনীর সাথে তাজউদ্দীনের বিয়ে। আকস্মিক ভাবে পন্ড হলো আয়োজন। বিছানার ওপর পত্র রেখে বিয়ের দিন বাঁশবাড়ী থেকে সন্তর্পণে চলে এলো তাজউদ্দীন। আটকে গেল কাজে। এখন সে মহাব্যস্ত।

আর তটিনী? তটিনীর কি কাজ আছে করার? দীর্ঘশ্বাস ফেলা আর বুক চাপড়ানো ছাড়া তার বঞ্চিত জিন্দেগীর এই সুদীর্ঘ সময় সে যাপন করে কি করে? সেই যে গেল তাজউদ্দীন, আর তো সে ফিরলো না।

তাজউদ্দীন চলে যাবার পর প্রায় দুইদিন দুইরাত তটিনী বিশ্বাস ঘর থেকেই বেরুলোনা। দরজা জানালা বন্ধ করে পড়ে রইলো টান হয়ে। সাধাসাধি করেও সে দুয়ার খুলে দিলোনা বা তার মুখে দানাপানিও দিতে কেউ পারলোনা। পরে যখন ঘর থেকে সে বেরুলো, তখন সে



www.pathagar.com

আওয়ারা। খেয়াল খুশী মতো সে ইচ্ছে হলে খায়, না হলে না খেয়েই চুপচাপ বসে থাকে। কারো সাথে কথাও সে বলেনা, কেউ বলতে এলেও কারো কথা সহ্য করতে পারে না।

হপ্তাখানেক কেটে গেলো এইভাবে। আরো কয়দিন মন মরা হয়ে ফিরলো সে। এরপর একদিন আকস্মিক সে হাজির হলো মরিয়ম বিশ্বাসের সামনে। কোন ভূমিকা না করে সে বললো–জেঠীমা, খাবার কি আছে দিন তো?

মরিয়ম বিশ্বাস অবাক হয়ে বললেন–কেন মা?

তটিনী বিশ্বাস বললো–কেন আবার; খাবো।

মরিয়ম বিশ্বাস হেসে বললেন–খাবে তো ভাল কথা। কি খেতে ইচ্ছে তোমার, বলো। তোমার মাকে বলে তৈরী করিয়ে দিচ্ছি।

তটিনী বিশ্বাস বিরক্ত হয়ে বললো–কেন আপনার হাঁড়িতে কিছু নেই? পাক চড়াননি সারাদিন?

না মা, পাক চড়াতে হয়নি আজ।

হয়নি মানে? খেলেন কি?

মসজিদের তোবাররক।

তোবাররক!

হ্যাঁ, মা। মসজিদে আজ মিলাদ ছিলো। আশপাশের আলেম মুসল্লী নিয়ে মস্তবড় মিলাদ আর মোনাজাত ছিল। লানত মুক্তির মোনাজাত। এই উদ্দেশ্যে চাউল ডাউল আর মোরগের গোস্ত দিয়ে ডেকচি কয়েক তোবাররক পাকানো হয়েছিল। বড় মিয়া তারই এক গামলা এনে দিয়ে গেছেন আমাকে।

তটিনী বিশ্বাস মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তার চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সে বললো–ঐ এক গামলার সবই খেয়ে ফেলেছেন?

না মা। আমি বুড়ো মানুষ। অতটা কি খেতে পারি? আধ্‌গাম্‌লাটেক্ আছেই কিন্তু তাতো আর দেয়া যাবেনা তোমাকে?

কেন দেয়া যাবেনা? ঐ তোবাররকই দিন জেঠীমা। ঐ তোবাররকই খাবো আমি।

বিপুল বিস্ময়ে মরিয়ম বিশ্বাস মৃদু একটা ধমক দিয়ে বললেন,

–ছিঃ মা। তুমি হিন্দু মানুষ। মুসলমানের পাকানো মসজিদের ঐ তোবাররক তুমি খাবে কি? এতে তোমার জাত থাকবে?

দপ্ করে দুই চোখ জ্বলে উঠলো তটিনীর। সে তিক্ত কণ্ঠে বললো–ঐ এক দোহাই আর কতদিন ঝাড়বেন আপনারা জেঠীমা? ঐ একবুলি আউড়িয়ে কতদিন আর আমাকে আপনারা বোকা বানিয়ে রাখবেন?

মরিয়ম বিশ্বাস হতবাক। বললেন–তটিনী।

আমার বাপ–মা অমাকে ঠকিয়েছেন, আমার সমাজ আমাকে ঠকিয়েছে। আমার ভরসা ছিল একমাত্র আপনাদের ওপর। সেই অপনারাই ঐ একই চালাকি চালাতে লাগলেন আমার ওপর?

সেকি মা। এ তুমি কি বলছো?



www.pathagar.com

ঠিকই বলছি। আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমার বাপমা আমাকে মুসলমান করার কথা একদিনও ভাবেননি। আমি নিজে যখন মুসলমান হতে চাইলাম বাদী হলেন জেঠামশাই। তিনি যখন রাজী হলেন, তখন বেঁকে বসলো আমার কপাল। কাজেই কারো মুখ চেয়ে আর আমি থাকবো না। আমার ব্যবস্থা নিজেই আমি করবো।

মানে?

মানে, লজ্জার ভয়ে আর মুখ বুজে আমি থাকবো না জেঠীমা। আমি মনে প্রাণে তাজউদ্দীনের স্ত্রী। তাকেই আমি স্বামী বলে অন্তরে স্থান দিয়েছি। সে যদি আর নাও ফিরে আসে, আমি তাজউদ্দীনের বিধবা হিসাবে তৃপ্তির সাথে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। তার স্মৃতিটুকু বুকে নিয়েই কাল কাটাতে চাই আমি। একটা অবলম্বন তো চাই আমার? আমাকে ঐ হিন্দুয়ানীর আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে আপনারা আমাকে সেটুকু তৃপ্তি থেকেও বঞ্চিত করতে চান? না জেঠীমা, ওটি আর হতে দিচ্ছিনে আমি।

তটিনী!

কৈ আপনার তোবাররক? কেউ যখন মুসলমান হতে দেবে না আমাকে, তখন নিজেই অমি বিস্‌মিল্লাহ বলে ঐ তোবাররক খেয়ে মুসলমান বানাবো নিজেকে। কৈ কোথায় সেই গামলা আপনার?

মরিয়ম বিশ্বাস তার এ কথাতে প্রত্যয় আনার আগেই তাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে চোখের পলকে তটিনী বিশ্বাস ছুটে গেল রান্নাঘরে। এরপর ঐ তোবাররকসহ গামলাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে রে-রে করতে করতে গামলা থেকে তোবাররক তুলে তটিনী বিস্‌মিল্লাহ বলে মুখের মধ্যে পুরে দিলো এবং এক ধারছে পর পর কয়েক গ্রাস গিলে ফেললো।

"করো কি-করো কি" বলে মরিয়ম বিশ্বাস ছুটে এলে, তটিনী বিশ্বাস গামলা নিয়ে ছুটে গিয়ে এক ফাঁকে এসে দাঁড়ালো এবং গপ্‌গপ্ করে আরো কয়েক গ্রাস খেয়ে সে পানি খেলো কলসী গড়িয়ে। অতপর আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, আজ থেকে আমার নাম তহমিনা বেগম মেঝো আম্মা। আপনার ছেলে তাজউদ্দীনের বউ তহমিনা বেগম। মারো, কাটো, যা-ই করো, বাড়ি থেকে আর আমি যাচ্ছিনে।

সংগে সংগে খবর গেলো তটিনীর মায়ের কাছে। খবর গেল মুহসীন বিশ্বাসের কাছে। বিশ্বাসবাড়ির ছোটবড় সকলেই ছুটে এলেন। এসে তাঁরা দেখে শুনে লা-জবাব হয়ে গেলেন। তটিনী বিশ্বাস সবাইকে ঐ একই কথা শুনিয়ে যেতে লাগলো আজ থেকে সে মুসলমান। নাম তার তহমিনা বেগম। তাজউদ্দীন বেঁচে থাকলে সে তাজউদ্দীনের বউ, তাজউদ্দীন মৃত হলে সে তাজউদ্দীনের বিধবা। মরিয়ম বিশ্বাস তাজউদ্দীনকে সন্তান বলে স্বীকার করবেন যতদিন, ততদিন তাহমিনা বেগম তাঁর বাড়ি থেকে নড়বে না।

অতপর তটিনী তাজউদ্দীনের সাথে তার বিয়ের দিন ধার্য হওয়ার পর থেকে পবিত্র কুরআনের যে কয়টি আয়াত মুখস্ত করে ফেলেছিল তা অনর্গল আউড়ে যেতে লাগলো।

তা দেখে তটিনীর মা বললো, মেয়ের আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। মরিয়ম বিশ্বাস বললেন, হেকিম ডাকো শিগগির। কিন্তু বেঁকে বসলেন পাড়াপরশী হিন্দুরা। হৈ চৈ শুনে তাঁরাও



www.pathagar.com

এসে বিশ্বাস বাড়িতে জুটেছিলেন। সব দেখে শুনে তাঁরা বললেন, সুরেশ্বরের বউ এই মেয়েকে আর ঘরে তুলতে পারবে না। তা তুললে জাত যাবে তারও এবং এরপর হয় সে মুসলমান হবে নিজেও, নয় তাকে একঘরে করে রাখা হবে। হিন্দু সমাজের আচার অনুষ্ঠানে তো নয়ই, সামাজিক ভাবেও তার সাথে আর সম্পর্ক রাখা হবে না।

হিন্দু সমাজের কথা শুনে মুহসীন বিশ্বাস ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একদিকে তটিনীও হিন্দু থাকতে নারাজ, অন্যদিকে হিন্দুরাও তাকে হিন্দু বলে মেনে নিতে নারাজ। উপায়-অন্তর না দেখে, মুহসীন বিশ্বাস দেশের ঐ চলমান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই দোয়া কালাম পড়িয়ে শরা-শরিয়ত মতে তটিনীকে তহমিনা বেগম নাম দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করালেন। তহমিনা বিশ্বাস অতপর মরিয়ম বিশ্বাসের বাড়িতেই স্থায়ী ভাবে রয়ে গেল।

বাংলাদেশের তৎকালীন ইতিহাসে এটা এমন কোন দেশ কাঁপানো ঘটনা নয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই ঘটনায় গোটা দেশটাই কেঁপে গেল। দেশটাকে ইস্‌লাম মুক্ত করতে যখন দেশের রাজা উম্মাদ, মুসলমান মুক্ত করে যে দেশকে তিনি কুল্লে হিন্দুর দেশ বানাতে চান, সেই সময়ে সেই দেশের হিন্দু কেউ মুসলমান হবে নতুন করে, এটা বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটা আশ্চর্য না হলেও, একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা বৈকি?

ক্ষমতাবানের মনোরঞ্জনের এক ধরনের দালাল এদুনিয়ায় চিরকাল ছিল-আছে-থাকবে। রাজার এই চরম মুসলমান বিরোধী আচরণের জন্যে যে সব হিন্দুরাই সমভাবে উল্লসিত ছিল, তা নয়। না-খোশও অনেকেই ছিল তাদের মধ্যে। আবার খোশদিলের হিন্দুর সংখ্যাও অধিক ছাড়া কম ছিল না। এই শেষ দলে আবার বেশ কিছু পুলক গ্রস্ত হিন্দুও ছিল। ফলে এই ঘটনা রাজ প্রাসাদে পৌঁছতে অধিক বিলম্ব হলো না। বরং অতি সত্বর রং চং এ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য হয়েই এ পয়গাম রাজার কানে পরিবেশিত হলো।

ক্ষিপ্ত হলেন রাজা। একি অকল্পনীয় ধৃষ্টতা। এ দুঃসাহস অংকুরেই ঠান্ডা করে না দিলে পরিবেশটা আস্তে আস্তে গরম করে তুলবে এটা। রাজা সগর্জনে হাঁক দিলেন -এয়, কে আছিস্।

অদৃষ্টের লিখন! ঠিক এই সময়েই রাজার সামনে হাজির ছিলেন অভয়চরণ। সব কাহিনী শোনার পর তার মাথা বিগড়ে গেল। যার জন্যে বার বার সে পাক খেয়েছে বাঁশ বাড়িতে, সে কিনা ভোগে লাগবে যবনের। এত প্রশস্ত সুযোগ পাওয়া সত্বেও সে নিজে থাকবে বঞ্চিত? যে রাজ পুত্রের ভয়ে সে ভীত ছিল এযাবত, সে আজ কারাগারে। তাজউদ্দীনের জন্যে এখন রাজ প্রাসাদ হারাম। প্রাণ বাঁচানোর দায়ে সে এখন ঠাঁই খুঁজছে ভাগাড়ে। এই সুযোগ হাতে পেয়েও সে তটিনীর মতো অপরূপাকে ছেড়ে দেবে ভোগ না করেই।

রাজা গণেশ হাঁক দিতেই অভয়চরণ সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং করজোড়ে বললেন- মহারাজ, অনুগ্রহ করে এ দায়িত্ব আমাকে দিন। আমিই গিয়ে সব কিছু ঠান্ডা করে দিয়ে আসি।

রাজা গণেশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন-পারবে তুমি?



www.pathagar.com

বিপুল উৎসাহের সাথে অভয়চরণ বললেন আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। এতো অতি তুচ্ছ কাজ। এর চেয়ে অনেক বড় কাজও মহারাজের আশীর্বাদে আমি অনায়াসে সমাধা করে এসেছি। সেনাপতি মশাইরা সবাই এটা জানেন।

রাজা গণেশ দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ম করে বললেন–পারবে তুমি বাঁশবাড়ির ঐ মতিচ্ছন্ন পরিবারের সবাইকে হত্যা করতে? তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে?

নিশ্চয়ই পারবো মহারাজ। শুধু ঐ মতিচ্ছন্ন কয়জন মাত্র নচ্ছারদের কেন, বাঁশবাড়ির সকল মুসলমানদের আমি ঘরবাড়ি সহ একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আসবো।

ঐ দুশ্চারিনীর বাপটা নাকি আমার ফৌজে আছে। তার সাথেও তো হিসেব নিকেশ করতে হবে একটা?

ওটাও আমার ওপরই অর্পণ করুন মহারাজ। তুচ্ছ এই মুষিকদের শায়েস্তা করতে আমাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হবেনা। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও যদি মহারাজকে ভাবতে হয়, তাহলে আমরা আছি কি জন্যে?

বিনয়ে গলে পড়লেন অভয়চরণ। রাজা গণেশ তখন এর চেয়ে জরুরী একটা ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি এ নিয়ে আর বেশী ভাবতে গেলেন না। অভয় চরণের ওপরই তিনি ছেড়ে দিলেন এ দায়িত্ব।

হুকুম পেয়েই অভয়চরণ ছুটে এলেন বাইরে। কালবিলম্ব না করে সুরেশ্বর বিশ্বাসের সামনে এসে তম্বির সাথে দাঁড়ালেন। তটিনীর পিতা সুরেশ্বর বিশ্বাস নগণ্য এক সৈনিক। চাকুরীগত প্রাণ। খবরটা তাঁর কানেও এসেছিল। এ জন্যে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছনাও খুব পেয়েছেন। নিরুপায় হয়ে সুরেশ্বর বিশ্বাস অভয়চরণের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বললেন, ঐ কলংকিনীকে চুল ধরে নিয়ে এসে আপনি আপনার চরণের দাসী বানিয়ে নিন কর্তা। ইচ্ছে করলে শেয়াল–কুত্তার মুখে ছুড়ে দিন ঐ পাপিষ্ঠাকে। কিন্তু আমার জান আর নকরীটার ওপর অনুগ্রহ করে হাত দেবেন না। দোহাই আপনার।

অভয়চরণের পায়ে পড়ে সুরেশ্বর বিশ্বাস কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। সুরেশ্বর বিশ্বাস নিজে এতটা ভীরু কখনও ছিলেন না। সাহসী মানুষই ছিলেন। আত্মসম্মান বোধও একদিন তাঁর যথেষ্ঠই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনার পর থেকেই বদলে গেছেন তিনি। দ্বিতীয় পক্ষের সংসারই তাকে এই পর্যায়ে নামিয়েছে।

সুরেশ্বর বিশ্বাসের মিনতিতে অভয়চরণ সাময়িকভাবে সমঝে গেলেন। হাজার হোক, এককালে তাঁকে অনেক খাতির করেছেন লোকটা। তাই ভাবলেন, মেয়েটাকে তো হস্তগত করি আগে। বাপটার ব্যাপার পরবর্তীতে ভেবে দেখা যাবে।

সুরেশ্বরকে ছেড়ে অভয়চরণ ফিরে এলেন রাজ প্রাসাদে। রাজার লক্ষ্য ধৃষ্টতা দমন, অভয়ের লক্ষ্য তটিনী। তাই কোন বাহিনীর মদদ না নিয়ে নিজের কয়জন বিশ্বস্ত অনুচর ও অল্প কয়েক জন সেপাই নিয়েই তৈরী হলেন তিনি। মামুলী এক গ্রামের ব্যাপার। হামলার ভয়ে এখন ভীত–সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী যবনেরা। আট দশ জন সামর্থবান মানুষ হলেই চলে। চাকর বাকর সেপাই মিলে তাঁরা যাচ্ছেন পঁচিশ–ত্রিশ জন জোয়ান মানুষ। বেশী সেপাইয়ের দরকার কি?



www.pathagar.com

এছাড়া, অভয়চরণ নিজে কোন দক্ষ সেপাই নন। সেনাপতি তো ননই। সেপাইয়ের সংখ্যা অধিক হলে, এদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে আবার একজন সেনাপতি সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে নিজের কতৃত্ব খর্ব হয়। এর ওপর আবার ফ্যাসাদ দেখা দেয় আর একটা। তটিনীর ঐ রূপলাবণ্যের ওয়ারিশ আবার পয়দা হয় আর একজন। সেপাই যার হাতে থাকবে, সে শুধু ওয়ারিশ নয়, বড় ওয়ারিশ। এ বেয়াকুফী করবে কেন অভয়চরণ? নিজ কর্তৃত্বের অধীনে এই শক্তিই তার যথেষ্ট।

তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে অভয়চরণের ধ্যান ধারণায় ত্রুটি কিছু ছিলনা। ত্রুটি যা তা তামামই তাঁর নসীবের। রাজ প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন বিরাজ করছে তাজউদ্দীনের অনুচর। দ্বারী-প্রহরী দাস-দাসী অধিকাংশই এখন জালাল উদ্দীনের উপলক্ষে তাজউদ্দীনের গোয়েন্দা। তাজউদীন আর বাঁশবাড়ি এক সূত্রে গাঁথা। এ ব্যাপারে ইংগিতও তাজউদ্দীন এদের দিয়ে রেখেছে আগেই। সেই বাঁশবাড়ির কথা উঠলে, কান আর এদের খাড়া না হয়ে পারে?

অভয়চরণকে এ দায়িত্ব অর্পণ করার সময় কিছু শান্ত্রী প্রহরী জানতে পারে এ কথা। তারা সঙ্গে সঙ্গে কেদারনাথকে খবর দিলে, অভয়চরণের পেছনে জোঁকের মতো লেগে থাকে কেদারনাথ। শুধু কেদারনাথ নয়, আরো কয়েকজন। তাজউদ্দীনকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছে যে মেয়ে, তাকেই এখন ধরতে যাচ্ছে অভয়চরণ। কি সাংঘাতিক। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কেদারনাথ অভয়চরণের খুঁটিনাটি পদক্ষেপের প্রতিটি সন্ধান নিয়ে ফিরতে লাগলো।

কেদারনাথও ফের হোঁচট্ খেলো এক জায়গায়। তার কাছে খবর ছিলো আগামী কাল সকালের দিকে যাত্রা করবে অভয়চরণ। কেদারনাথ নিজে ছাড়াও আর যারা অভয়চরণের পেছনে পেছনে ছিল। তারাও তাকে এই খবরই সরবরাহ করেছিলো। লোক যাচ্ছে কয়জন কি ধরনের লোক যাচ্ছে, কখন যাচ্ছে তারা-সব খবরই সে নিজে এবং অন্যের মারফত পাচ্ছিলো। তামাম খবর যোগাড় করে একবারে গিয়ে তাজউদ্দীনকে জানিয়ে আসবে এই ছিলো কেদারনাথের ইরাদা। কিন্তু হঠাৎ করে পাল্টে গেল অভয়চরণের সিদ্ধান্ত।

সীমিত শক্তির কারণেই অভয়চরণের অন্তরে হঠাৎ ভয়ের উদয় হলো। স্বল্প মাত্রায় হলেও মুসলমানদের প্রত্যাঘাতের খবর মাঝে মধ্যেই রাজ প্রাসাদে আসছে। এর দু'একটি অত্যন্ত আতংকজনকও বটে। বলা যায়না, কখন আবার কোনদিক থেকে আঘাত আসে তাঁর ওপরও। বিশেষ করে, কয়েকটি ঘটনার পর এখন তৌহিদবেগকে ভয় করেনা, এমন কোন বাহাদুর সেনাপতি একজনও রাজার ফৌজে ছিলনা।

অতএব দিনদুপুরে এতটা বাড়াবাড়ি করতে যাওয়া সমীচিন মনে না করে, অভয়চরণ সেইদিনই বাদমাগরিব আচানক ভাবে দলবল নিয়ে বাঁশবাড়ির দিকে রওনা হলেন। তটিনী বিশ্বাস কোন বাড়িতে থাকে এখন, কোন ঘরে সে থাকে, এসব খবর অভয়চরণের আগেই নেয়া ছিল। সংবাদ দাতারাই এ পয়গাম পরিবেশন করে গিয়েছে।

কেদারনাথের কাছে যখন শেষ খবরটি পৌঁছলো, তখন বেরিয়ে পড়েছেন অভয়চরণ। এটা জানতে পেরেই চমকে উঠলো কেদারনাথ। সে পড়িমরি ছুটে গেল তাজউদ্দীনের সন্ধানে।



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন ঘরে বসে জালালউদ্দীনের পত্রের জবাব লিখছিলো। কেদার নাথের আগমন বার্তা পেয়েই সে দ্রুত পদে বাইরে এলো। তাজউদ্দীনকে দেখেই কেদারনাথ পেরেশানদিলে বললো– হুজুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

তাজউদ্দীন চমকে উঠলো। কেদারনাথকে আড়ালে এনে প্রশ্ন করলো– সর্বনাশ মানে!

কেদারনাথ বললো, অভয়চরণ আপনার বাঁশবাড়িতে লোকজন নিয়ে ছুটে গেছে।

তাজউদ্দীনের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা দেখা দিলো। বললো মানে?

তারা আপনার আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে গেছে।

সে কি!

কেদারনাথ অতি সংক্ষেপে তটিনীর ইসলাম গ্রহণ থেকে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে বললো– আজ বিকালেই এ খবর এসে রাজার কানে পড়েছে এবং অভয়চরণ সেধে তাদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেছে।

বলো কি!

কেদারনাথ অপরাধীর মতো বললো অল্প সময়ের ব্যাপার হুজুর। খবরাদি সঠিকভাবে যোগাড় করতেই ঘটে গেল এই ঘটনা।

তাজউদ্দীন স্বগতোক্তি করলেন–উঃ! মুসিবত যখন আসতে থাকে, তখন চারদিক থেকে ঝড়ের বেগে আসতে থাকে! অতপর সে কেদার নাথকে বললো–আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও–।

কেদারনাথ চলে গেল। তাজউদ্দীন দ্রুত পদে ঘরে ঢুকে কয়েক পলকের মধ্যেই তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলো। তার হাতের কাছের সেপাইদের তৈরী হয়ে ডেরায় আসার নির্দেশ দিয়ে সে তখনই ডেরার দিকে ছুটলো। সেখানে গিয়ে উপস্থিত যে কয়জন সেপাইকে সে হাতের কাছে পেলো, তাদেরকে নির্দেশ দিলো তৈরী হওয়ার।

এরা সবাই তৈরী হতেই গুদাম বাড়ির সেপাইরা ডেরায় এসে জমায়েত হলো। সবাই মিলে সেপাই সংখ্যা প্রায় শ'এর কোঠায় ঠেকলো। তা দেখে তাজউদ্দীনের এক বিশিষ্ট সহকারী সবিস্ময়ে বললো–এত ফৌজের জরুরত কি উস্তাদ? দুশমন যেখানে নিতান্তই কমজোর আর নগণ্য–

জবাবে তাজউদ্দীন বললো–জরুরত আছে জরুর। লহমার মধ্যে সারতে হবে কাজ। প্রহর ধরে লড়াই করার ফুরসুত আমার নেই।

উস্তাদ!

গিয়েই ওদের তুলে নিয়ে নিমেষের মধ্যেই ওয়াপস্ আসতে হবে। চলে এসো শিগগির।

সেপাইদের দ্রুত বেগে বাঁশবাড়িতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দুইজন অশ্বারোহী সেপাই নিয়ে তাজউদ্দীন তৎক্ষণাৎ বাঁশবাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

তাজউদ্দীনের পেছনেই পায়ে হেঁটে রওনা হলো তাজউদ্দীনের সেপাইরা। অভয়চরণও পথ ধরেছে পদব্রজে। এক এক দল এক এক পথে যাচ্ছে। অভয়চরণের চিন্তাভাবনা,বাঁশবাড়িতে



www.pathagar.com

পৌঁছে কাজের সময় রাতটা একটু থাকলেই তাঁর হলো। কাজেই কোন ব্যস্ত হয়ে ছোটার আর তাকিদ নেই।

কিন্তু তাজউদ্দীনের ফৌজ ছুটছে প্রাণপণে। তাদের লক্ষ্য–অভয়চরণের দল গিয়ে বাঁশবাড়িতে পৌঁছার আগেই, কিংবা নিদেন পক্ষে, তারা গিয়ে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই বাঁশবাড়িতে হাজির তাদের হতেই হবে এবং অভয়চরণদের অপকর্ম রোধ করতে হবে। কাজেই তাদের বেগ দুর্বার। এতে করে অভয়চরণের অনেক পরে রওনা দেয়া সত্ত্বেও, তাজউদ্দীনের সেপাইরা অল্পক্ষণের মধ্যেই অভয়চরণদের সমপরিমাণ পথ পেরিয়ে এলো।

তাজউদ্দীন আর তার অশ্বারোহী সঙ্গীদ্বয়ের তো কথাই নেই। অভয়চরণ অর্ধপথ না এগুতেই তারা তিনজন হাজির হলো বাঁশবাড়িতে। বাড়ির নিচে এক গোপন স্থানে তাদের আগমনকারী ফৌজের এন্তেজারে সঙ্গীদ্বয়কে রেখে এবং নিজের অশ্ব গোপন স্থানে বেঁধে তাজউদ্দীন উঠে এলো বাড়ির ওপর।

তাজউদ্দীন ভাবতে লাগলো–এবার কি করবে সে। কাউকে ডাক দিলে তো শুরু হবে হুলুস্থুল কান্ড। অভয়চরণ এসে এ অবস্থা দেখলে, বিশেষ করে বিপক্ষ দলের সেপাই এখানে উপস্থিত এ সন্ধান পেলেতো আর কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে উল্টা মুখে দৌড় দেবে অভয়চরণ।

কিন্তু এ অবস্থা হতে দেয়া যাবে না। অভয়চরণকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। বেকায়দা দেখে এখন সরে পড়লেও কায়দা মতো আবার এসে হামলা করবে বদমায়েশ। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ওকে পাহারা দিয়ে রাখবে কে? ওর ফায়সালা করতে হবে আজকেই।

তাজউদ্দীন সন্তর্পণে গিয়ে তার ঘরের বাইরের দিকের বারান্দার ওপর উঠলো। ঘরটা ফাঁকা আছে না আছে কে জানে। দরজায় হাত রাখতেই হাতে লাগলো মাকড়সার জাল। তাজউদ্দীন বুঝলো, বেশ কিছুদিন যাবত খোলা হয়নি দরজা এবং এ ঘরে কেউ এখন থাকে না।

তটিনী ঠাঁই পায়নি বাড়িতে। সে তাদের বাড়িতেই আছে। কিন্তু কোন ঘরে সে আছে? পা টিপে তাজউদ্দীন বাড়ির ভেতর ঢুকলো। এদিক ওদিক চাইতেই তার নজরে পড়লো–এযাবত যে ঘরটা তালাবদ্ধ ছিল, রোকেয়া ওরফে রুক্মিনী মাঝে–মধ্যে এলে যে ঘরটায় থাকে, সে ঘরে তালা নেই। ভেতর থেকে বন্ধ করা। তবে কি রোকেয়াই ফের এসেছে, না তটিনী আছে এখানে? ঘরের কাছে এগিয়ে এলো তাজউদ্দীন। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘোর অন্ধকার। লোকই দেখা যাচ্ছে না, কে না কে নির্ণয় করার প্রশ্নই কিছু ওঠেনা।

ইতিমধ্যেই সশব্দে কেশে উঠলো তটিনী। কাশির শব্দেই নিশ্চিত হলো তাজউদ্দীন। তটিনীই আছে এ ঘরে।

অভয়চরণের মূল লক্ষ্য তটিনী। তটিনীর ঘরই হবে তার আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই তাজউদ্দীনকে এখানেই অবস্থান নিতে হবে। সে সন্তর্পণে বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গীদ্বয়কে এই মর্মে নির্দেশ দিলো যে, তাদের সেপাই আগে এসে পৌঁছলে,তাদের আড়ালে নিয়ে অপেক্ষা করবে তারা। অভয়চরণের লোকজন এসে বাড়ির ওপর একত্র হওয়ার পর পেছন থেকে অতর্কিতে ঘিরে ফেলতে হবে তাদের যাতে করে একজনও পালিয়ে যেতে না পারে। যথাসম্ভব



www.pathagar.com

এখানে কাউকে নিহত না করে বেঁধে ফেলতে হবে। অপর পক্ষে অভয়চরণের ফৌজই যদি আগে এসে পৌঁছে আর হামলা শুরু করে, তাহলে দুশমনদের ওপর অশ্ব ছুটিয়ে দিয়ে লড়তে হবে তাদের এই তিনজনকেই।

নির্দেশ দিয়ে তাজউদ্দীন ফের বাড়ির ভেতরে চলে এলো। তটিনীর ঘরের দরজার পাশে কিছু আসবাবপত্র গাদা করা ছিল। তাজউদ্দীন এসে তার আড়ালেই অবস্থান নিয়ে রইলো।

তাজউদ্দীনের সেপাইরাই আগে এলো। অনেক দূরের পাল্লা। সাঁঝ রাতে যাত্রা শুরু করলেও বাঁশবাড়িতে আসতে তাদের দুপুর রাত হয়ে গেল। অভয়চরণের দল এলো তারও পরে। বিশ্বাস বাড়ির প্রতিটি ঘর অভয়চরণের চেনা। বেশ কিছুদিন এখানে তিনি থেকে গেছেন। মরিয়ম বিশ্বাসের বাড়িতে কোন ঘরে তটিনী এখন থাকে, এ সংবাদ অগেই তাঁর যোগাড় করা ছিল। তিনি দল নিয়ে সরাসরি বাড়ির ওপরে উঠে এলেন। সুরেশ্বর বিশ্বাসের অংশ বাদে বিশ্বাস বাড়ির অবশিষ্ট অংশটা তার লোকজনদের দেখিয়ে দিয়ে বললেন–ঘেরাও করো গোটা এ বাড়ির এদিকটা। এক এক ঘরে ঢুকে যাকে পাও হত্যা করো এক ধারছে।

এরপর দুই তিন জনকে বললেন–এসো তোমরা আমার সাথে।

বলেই তিনি মরিয়ম বিশ্বাসের বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। অভয়চরণের লোকেরা আতংক সৃষ্টি করার জন্যে 'হা–রা–রা'–বলে সশব্দে আওয়াজ দিয়ে সামনের দিকে পা তুলতেই তাজউদ্দীনের ফৌজ এসে ঘিরে ফেললো তাদের। অভয়চরণের এই লোকের সংখ্যা পঁচিশের মতো এখন। তাজউদ্দীনের ফৌজের সংখ্যা তার চারগুণ। তার ওপর তাজউদ্দীনের লোকেরা সৈনিকই শুধু নয়, এক একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক। অভয়চরণের লোকেরা আওয়াজ দিয়ে উঠতেই অন্ধকারের মধ্যে বিড়ালে ইঁদুর ধরার মতো তাজউদ্দীনের তিন চারজন সেপাই এসে অভয়চরণের এক একটা লোককে খপ্ করে ধরে হাত পা গুলো বেঁধে ফেললো এবং বস্তার মত একটার ওপর একটা মানুষ বিশ্বাস বাড়ির বাহির আঙ্গিনায় গাদা দিতে লাগলো। অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা অভয় চরণের লোকজন এবার হা–রা–রা এর বদলে হাহুতাশ আর আর্তনাদ করতে লাগলো।

আকস্মিক এই হুট্পাটে বিশ্বাস বাড়ির তামাম লোক ঘুম থেকে জেগে গেল। বাড়িতে তাদের রাজার ফৌজের হামলা হয়েছে বুঝতে পেরে আতংক গ্রস্ত ভাবে, বাঁচাও–বাঁচও রবে সবাই নিজ নিজ ঘরের মধ্যে চীৎকার জুড়ে দিলো। কেউ কেউ আবার কলেমা পাঠ করতে লাগলো। ভেতরে ও বাইরের এই দুই আর্তনাদ মিলে বিশ্বাস বাড়িতে তুমুল এক মাতম শুরু হলো।

মরিয়ম বিশ্বাসের বাড়ির ভেতরে অবস্থিত তটিনীর খোয়াবে বিভোর অভয়চরণ ভাবলেন–তার লোকজনেরা শুরুকরেছেআঘাত। এসব সেই আঘাতেরই প্রতিক্রিয়া।

ভেতরে ঢুকেই অভয়চরণ সরাসরি তটিনীর ঘরের বারান্দার ওপর উঠলেন। ঘরের দুয়ার ভেতর থেকে বন্ধ দেখে তিনি তার সঙ্গীদের হুকুম দিলেন–ভেংগে ফেলো এই দরজা।



www.pathagar.com

তিন চারজন লোক মিলে দরজার ওপর সমবেত আঘাত হানায় খিল ভেঙ্গে খুলে গেল তটিনীর ঘরের দুয়ার। দুয়ার মুক্ত হতেই অভয়চরণ তাঁর সঙ্গীদের মরিয়ম বিশ্বাসের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন–ঐ ঘরে যাও এবার।

তাঁর সঙ্গীত্রয় মরিয়ম বিশ্বাসের ঘরের দিকে এগুতেই তাজউদ্দীনের সেপাইরা ইতিমধ্যেই সেখানে এসে বেঁধে ফেললো তাদের এবং তাদের আওয়াজ দেয়ার সুযোগটুকুও না দিয়ে বস্তার মতো তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। তাজউদ্দীনের কিছু সেপাই বাড়ির ভেতরে রয়ে গেল। আর কেউ কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে কিনা খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলো।

দুয়ার ভাঙ্গার পরই অভয়চরণ তার সঙ্গীদের সরিয়ে দিয়ে তটিনী বিশ্বাসের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। তটিনী তখন আর্তকণ্ঠে কলেমা পাঠে রত। অন্ধকারে অভয়চরণ তটিনীর দিকে এগুতেই তটিনী বিশ্বাস চমকে উঠে বললো–কে?

অভয়চরণ বললো ভয় নেই, আমি অভয়চরণ।

তটিনী বিশ্বাস বিস্মিত কণ্ঠে বললো, সেকি! আপনি! আপনি দিয়েছেন আমাদের বাড়িতে হানা?

তটিনী তখন থর থর করে কাঁপছে। এর জবাবে অভয়চরণ কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করে বললো– অবাক হবার কি আছে? তুমি যবনের প্রেমে উম্মাদ, আমি তোমার প্রেমে উম্মাদ। সোজা পথে আসতে যখন দিলে না, তখন বাঁকা পথই ধরতে হলো।

আপনি–

আর আপনি! হৈ চৈ না করে এবার তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পন করো, তোমাকে আর হত্যা করা হবেনা। এসো–

আরো এগুলো অভয়চরণ। তটিনী বিশ্বাস লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে সরতে সরতে বললো– দোহাই আপনার, আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন না। দয়া করে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

অভয়চরণ তটিনীর দিকে এগুতে এগুতে বললো–দয়া আমার তখনই করা সম্ভব, যদি আমাকে উত্যক্ত না করে তুমি স্বেচ্ছায় আমার বুকে এসে স্থান নাও। এসো–এসো বলছি।

না, কখখনো না–

বলতে বলতে তটিনী বিশ্বাস দ্রুতপদে সরতে গিয়ে দেয়ালের সাথে আটকে গেল।

তবে রে –

–বলে অভয়চরণ তটিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই অভয়চরণের মনে হলো একটা লোহার সাঁড়াশী পেছন থেকে এসে তার গলাটাকে সবলে দুই পাশ থেকে চেপে ধরেছে।

অভয়চরণ মরিয়ম বিশ্বাসের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার পর থেকেই কিছুটা দূর থেকে হলেও অন্ধকারের আড়ালে তাজউদ্দীন অভয়চরণের পিছে পিছেই ছিলো। অভয়চরণ তটিনীর ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাজউদ্দীনও অন্ধকারে এসে তার পেছনেই তটিনীর ঘরে ঢুকে অভয়চরণের চরিত্রের আসল রূপ অনুধাবন করার ইরাদায় এক পাশে চুপটি করে



www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছিলো। অভয়চরণ তটিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই তাজউদ্দীন পেছন থেকে দুই হাতে অভয়চরণের গলাা চেপে ধরলো। অভয়চরণ চমকে উঠে আওয়াজ দিলো কে?

টুঁটি ধরে অভয়চরণকে দুয়ারের দিকে সশব্দে ফেলে দিয়ে তাজউদ্দীন তার তলোয়ার কোষমুক্ত করলো এবং এক পলকে তলোয়ার খানা অভয়চরণের পিঠের ওপর খাড়া করে ধরে বললো–তোর মওত।

অভয়চরণ উপুড় হয়ে ষাষ্টাঙ্গে দুয়ারের কাছে পড়েছিল। সে আতংকের সাথে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই তাজউদ্দীনের খাড়া করে ধরা তলোয়ারের অগ্রভাগ খ্যাঁচ্ করে অনেকটা অভয়চরণের পিঠের মধ্যে ঢুকে গেল। সে আর্তনাদ করে উঠে যেভাবে পড়েছিল ঐ ভাবেই ফের ষাষ্টাঙ্গে পড়ে রইলো এবং আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে বলতে লাগলো–বাঁচাও–বাঁচাও।

তাজউদ্দীন তার তলোয়ার খানায় ঈষৎ চাপ দিয়ে ধরে রেখে বললো–হারামজাদা, এই জঘণ্য চরিত্র নিয়ে বেঁচে থাকার আরো সাধ আছে তোর?

কণ্ঠস্বর চেনা চেনা মনে হওয়ায় অভয়চরণ ব্যস্তকণ্ঠে বললো–কে, কে আপনি?

বলেছিই তো তোর মওত। তোর মওত তাজউদ্দীন।

এ্যা!!

ইতিমধ্যেই তাজউদ্দীনের কয়েকজন সেপাই এসে "উস্তাদ" বলে আওয়াজ দিয়ে তটিনীর ঘরের দুয়ারের সামনে দাঁড়াতেই, তাজউদ্দীন তাদের বললো–বেঁধে ফেলো এই শয়তানকেও।

তাজউদ্দীনের সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে অভয়চরণকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো। তাজউদ্দীন এবার তাদের উদ্দেশ্যে বললো –সবাইকে বাঁধা হয়েছে?

তাদের একজন উত্তর দিলো–জি, হ্যাঁ উস্তাদ।

কেউ কোথাও ছাড়া পড়ে নেই তো?

না উস্তাদ। সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা হয়েছে। হিসেব মতো এই একটাই কেবল বাকী ছিলো।

তো যাও। এটাসহ সবাইকে তুলে নিয়ে এবার তোমরা রাজধানীর দিকে রওনা হও। আমি এক্ষুণি আসছি।

এদেরকে ফের রাজধানীতেই নিয়ে যাবেন উস্তাদ?

তাজউদ্দীন শক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো– না। এদের ব্যবস্থা পথের মাঝেই করা হবে।

তাজউদ্দীনের সেপাইরা অভয়চরণকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে এলো এবং তাজউদ্দীনের নির্দেশের কথা অবশিষ্ট সঙ্গীদের জানিয়ে দিয়ে তামাম কয়েদীদের তুলে নিয়ে তারা ফেরত রাস্তা ধরলো।

তাজউদ্দীনের প্রথম কথাতেই তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারে তটিনী। এরপর আর দু'এক কথার মাঝেই সে নিশ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু তটিনী তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ত্রাশে আতংকে তার তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা। ইযযত এবং জীবন দুটিই এমন আচানক ভাবে রক্ষা পাবে, এটা তার



www.pathagar.com

চিন্তার মধ্যেও ছিল না। এছাড়া তার সামনে যা সব ঘটতে লাগলো তা দেখেও সে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু থর থর করে কাঁপছিলো।

হুটাপাটা থেমে যেতেই তার পুরোপুরি সংজ্ঞা ফিরে এলো। সে 'তাজউদ্দীন' বলে চীৎকার দিয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাজউদ্দীনের বুকের ওপর।

তাজউদ্দীন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খানিকটা আশ্বস্ত করে বললো–চুপ–চুপ ! আমার নাম কিছুতেই উচারণ করা চলবেনা। আমি গোপনে এসেছি, গোপনেই আবার চলে যাবো।

তটিনী বিশ্বাস তাজউদ্দীনকে আকড়ে ধরে কাঁপত কাঁকতে বললো। সে কি?

তাজউদ্দীন আশ্বাস দিয়ে বললো, আর ভয়ের কোন কারণ নেই। এ ছাড়া আমার চোখ এরপর থেকে আরো তীক্ষ্ম থাকবে তোমাদের ওপর। আমি অত্যন্ত এক জরুরী কাজে আটকে আছি। আর কয়টা মাত্র দিন। এর পরেই হয়তো চিরদিনের মতো এ দেশের মুসলমানদের তামাম মুসিবত কেটে যাবে। আমাকে ছাড়ো, আমি যাই।

আরো সবলে আঁকড়ে ধরে তটিনী বললো–না–না –না --------

তাজউদ্দীন ফের সান্ত্বনা দিয়ে বললো–ছিঃ! অবুঝ হচ্ছো কেন? তুমি তাজউদ্দীনের স্ত্রী বলে ঘোষণা করেছো নিজেকে। তাজউদ্দীনের স্ত্রীর এত ভীরু বা স্বার্থপর হলে চলবে কেন? তোমার স্বামী এক বিরাট কাজে লিপ্ত আছে। তোমাকে শক্ত হতে হবে এবং স্বামীকে উৎসাহ দিতে হবে। মুসিবতে তোমাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা।

তটিনী এবার বাহুর বাঁধন শিথিল করে বললো–কিন্তু ---------

আর ক'টা মাত্র দিন। যদি বেঁচে থাকি, আর ক'টা দিন পরেই ফিরে এসে নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধতে পারবো আমরা। সে চেষ্টা এখন করলে, ঘর বাঁধাতো দূরের কথা, তোমার আমার জানটাই যে কোন মুহূর্তে দুশমনদের কব্জাগত হবে। কাজেই মনটা শক্ত করে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে থাকো। আমার আর দেরী করার উপায় নেই।

চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় মুহসীন বিশ্বাস এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এলেন। কাউকে কোথাও না দেখে তিনি তটিনীদের খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে এক পা দু'পা করে ভয়ে ভয়ে মরিয়ম বিশ্বাসের বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন।

কোলাহল থেমে যাওয়ায় মরিয়ম বিশ্বাসও ওদিকে জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালেন। কোন লোকজন কোথাও না দেখে, মুহসীন বিশ্বাস তাঁর বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময়, কুপী জ্বেলে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এলেন এবং তটিনীর খবর নেয়ার জন্যে তার ঘরের দিকে এগুলেন।

তাজউদ্দীনের গলা শুনে সাহস ভরে মুহসীন আর মরিয়ম, দুইজনই তটিনীর ঘরে ছুটে এলেন। তটিনী তখন তাজউদ্দীনকে ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়ালো। হাতে ধরা বাতির আলোতে তাজউদ্দীনকে দেখতে পেয়েই মরিয়ম ও মুহসীন বিশ্বাস চীৎকার করে আওয়াজ দিতে গেলেন। তাজউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে তাঁদের থামিয়ে দিয়ে এই হামলার ঘটনা সংক্ষেপে ব্যক্ত করলো এবং বললো–চড়াও হওয়ার সাথে সাথেই আমরা বেঁধে ফেলেছি জালিমদের। আর কোন ভয় নেই।



www.pathagar.com

এরপর তাজউদ্দীন তার নাম এবং আসল ঘটনা প্রকাশ করতে নিষেধ করে সবার কাছে বিদায় চাইলো।

বিষয়টির গুরুত্ব মুহসীন বিশ্বাস সহজেই বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, না, ওসব আমরা কিছুতেই প্রকাশ করবো না। কিন্তু মুশকিল হলো লোকজন এসে ব্যাপারটা জানতে চাইলে বলবো কি?

তাজউদ্দীন সংগে সংগে বললো–বলবেন, রাজার ফৌজ হামলা করার সাথে সাথেই কোথা থেকে এক মুসলমান বাহিনী এসে তাদের পাল্টা হামলা করে এবং রাজার ফৌজকে মারতে মারতে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কে কোনদিক দিয়ে এলো কে কোন দিকে গেল, কিছুই আমরা জানিনে। ব্যস।

মুহসীন বিশ্বাস বললেন–হ্যাঁ–হ্যাঁ, এইটেই ঠিক জবাব। এই বললেই চলবে। কেউ জিজ্ঞেস্ করলে এই জবাবই দেবো আমরা।

বিপদের মধ্যেও মরিয়ম বিশ্বাস খুশী প্রকাশ করে বললেন–আল্লাহ্‌র কি অশেষ মেহেরবানি দেখো, তোমার জন্যেই মেয়েটা এতবড় ঝুঁকি নিলো। আর সে জন্যে মুসিবত যা এলো, আল্লাহপাক তোমার দ্বারাই তা মুক্ত করে দিলেন। মা আমার সত্যিই বড় নেকমন্দ।

বলে তিনি তটিনীর দিকে তাকালেন। তটিনী বিশ্বাসের মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়লো।

তাজউদ্দীন ব্যস্তকণ্ঠে বললো ইশ্! অনেক দেরী হয়ে গেল। এদিকে আবার বাইরের লোকজন এসেও জুটে যাবে এখনই। আমি চললাম। আমার জন্যে সবাই আপনারা দোওয়া রাখবেন।

পা তুলতে গিয়েই তাজউদ্দীন একবার তটিনীর দিকে তাকালো। তটিনী মুখ তুললো তাজউদ্দীনের দিকে। তটিনী আর বাধা দিলো না ঠিকই, কিন্তু বুকতার নয়ন ধারায় ভিজে যেতে লাগলো।

করুণ নয়নে এ দৃশ্য লক্ষ্য করে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো তাজউদ্দীন। এরপর সে দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তাজউদ্দীনের অশ্বারোহী সঙ্গীদ্বয় তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল বাড়ির নিচে। তাজউদ্দীন তার ঘোড়া নিয়ে তাদের কাছে এলেই তারা এক সাথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাজউদ্দীন ও তার সঙ্গীদ্বয় তাদের সেপাইদের সাথে একত্রিত হলো। এরপর মাঝরাস্তায় এসে এক নর্দ্দমায় অভয়চরণ ও তার সঙ্গীদের প্রাণহীন দেহ শেয়াল শকুনের ভোক্ষ্য রূপে ফেঁকে দিয়ে সুবেহ সাদিকের মধ্যেই সবাই নিজ আস্তানায় ফিরে এলো।



www.pathagar.com

# ১৯

দনুজমর্দন গণেশের মুসলমান নিপীড়ন ও মুসলমান নিধন তৎপরতা যতই প্রকট আকার ধারণ করতে লাগলো, সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের ধ্যান অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কাছে জালিমের জুলুম থেকে নাজাত প্রাপ্তির প্রার্থনা ততই গভীর হতে লাগলো। ক্রমেই তিনি আহার-নিদ্রা ও বাক্যালাপ ত্যাগ করে আরাধনায় এমন ভাবে নিমগ্ন হয়ে গেলেন যে ইহ দুনিয়ার সাথে তাঁর আর কোন সম্পর্কই রইলো না।

সূফী সাহেবের খানকা শরীফও ক্রমেই আফসোস্ আর আহাজারীর এক ভয়াবহ আবর্তে তলিয়ে যেতে লাগলো। লোমহর্ষক অঘটন ক্রমেই এত ব্যাপক হয়ে উঠতে লাগলো যে, এমন মুহূর্ত রইলো না যখন দু'পাঁচটা মর্মান্তিক অঘটনের বার্তা এসে খানকা শরীফে আছড়ে পড়তে না লাগলো। রাজা গণেশের এই হিংসাত্মক কর্মকান্ড তীব্রতর হওয়ায় মুসলমান জ্ঞানী, গুণী ও আলেম ওলামাগণ বাংলা মুলুকের মাটি থেকে বিরাণ হয়ে যেতে লাগলো ব্যাপকভাবে, হ্রাস পেতে লাগলো সাধারণ মুসলমানদেরও সংখ্যা। সেই সাথে গণেশের নিধন-প্রক্রিয়াটাও এত নির্মম হয়ে উঠতে লাগলো যে, তা শ্রবণ করাও শেষ পর্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে উঠলো।

খবর এলো দনুজমর্দন রাজা গণেশের ফৌজ বিভিন্ন এলাকা থেকে আলেম ওলামা আর মুসল্লীদের ধরে এনে এখন সরাসরি মারছেনা, নির্মমভাবে ডুবিয়ে মারছে তাদের। তারা তাঁদের ধরে এনে নৌকা বোঝাই করছে এবং সেই নৌকাগুলো মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে। ডুবন্ত মুসল্লীরা বাঁচার জন্যে পানির ওপর হাত-পা ছুড়ে অন্তিম চেষ্টায় আকুলী বিকুলী করছে,আর দনুজ মর্দনের সেপাইরা তীরে দাঁড়িয়ে কৌতুক ভরে তা দেখছে এবং হাততালি দিয়ে হাসাহাসি আর নাচানাচি করছে। ঘটনার সত্যতা যাচাই এর জন্যে শায়খ হোসেন সাহেবও ছদ্মবেশে গিয়ে আড়াল থেকে এমন ঘটনা নিজ চোখে দেখেছেন এবং শোকে দুঃখে অসহায়ভাবে নিজের বুক চাপড়িয়েছেন।

খবর এলো-নানা গাঁ থেকে বুজুর্গান ব্যক্তিদের ধরে এনে ঘরের মধ্যে তুলে তালাবন্ধ করা হচ্ছে এবং সেই ঘরে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে তাদের। এমনই আরো হরেক রকম নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে গণেশের মুসলমান নির্যাতনের খবর অবিরাম আসতে লাগলো। উদ্দেশ্য, আতংকগ্রস্ত হয়ে বাদ বাকী মুসলমানরা বাংলা থেকে পালিয়ে যাক এবং বাংলাদেশ মুসলমান মুক্ত হোক।

ঠিক এই সময়ই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজার ফৌজ চড়াও হলো সুফী সাহেবের খানকা শরীফের ওপর। গভীর রাত্রি পর্যন্ত অভিযোগ শুনে আর আফসোস্ ও আহাজারী করে



www.pathagar.com

খানকা শরীফে অবস্থান রত বিভিন্ন কিসিমের লোকেরা সবে মাত্র ঢলে পড়েছে নিদ্রার কোলে, আর তখনই মার মার রবে সশস্ত্র রাজার ফৌজ হানা দিলো খানকা শরীফে। আলো মশাল জ্বালিয়ে, লাঠিসোটা হাঁকিয়ে তারা সুফী সাহেবের প্রতিপাল্য ও অনুকূলগত লোকদের সর্বস্ব লুন্ঠন করতে লাগলো। অনেকক্ষণ হুটপাট করে লুন্ঠন করার পর সরে পড়লো রাজার ফৌজ। দুশমনেরা বিদায় হওয়ার পর প্রাণ ভয়ে আত্মগোপনকারী খানকাবাসীরা ফিরে এসে দেখলো খানকাশরীফের মেহমানদের, তাল্‌ব্‌-এ-এলেমদের যথা সর্বস্ব নিয়ে গেছে রাজার ফৌজ। যাবতীয় মালামালের সাথে তাদের পরিধানের এক খন্ড বস্ত্র বা আহার্যের এক কনা দানাও রেখে যায়নি পাষন্ডরা।

সুফী সাহেব তার নিজ কক্ষে আসনের ওপর বসে ঐ একই ভাবে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার সুফী সাহেবের সামনে এসে পেশ করা হলে, তিনি চক্ষু উন্মোচন করে সব কথা শুনলেন এবং পরক্ষণেই আবার চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলেন। কারো কোন কথার বা প্রশ্নের কোন জবাবই তিনি দিলেন না। অগত্যা ক্ষুন্নমনে বিদেয় হলেন সকলে।

একদিন পরই রাজার ফৌজ আবার এলো খানকা শরীফে। এবার তারা হামলা করে ঐ সর্বস্ব হারা লোকদের সবাইকে খুঁজ খুঁজে বাঁধলো। তারপর নির্মমভাবে প্রহার করে অর্ধমৃত অবস্থায় তাদের বেঁধে রেখে চলে গেল।

এখবরও সুফী সাহেবের কানে দেয়া হলো। এবারও তিনি ক্ষণিকের জন্যে চোখ খুলে আবার পরক্ষণেই ধ্যানমগ্ন হলেন।

অতপর শুধু দেশব্যাপীই নয়, খোদ খানকা শরীফেও চরম আতংক নেমে এলো। প্রতিবারই রাজার ফৌজ সংখ্যায় এত অধিক পরিমাণে আসতে লাগলো এবং এমন অনিয়মিতভাবে আসতে লাগলো যে, মুসলমানদের পক্ষের সীমিত শক্তি এর হদিস সংগ্রহে আর মোকাবেলায় একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়লো। ফলে, খানকাবাসীরা প্রাণভয়ে খানকা থেকে পালিয়ে বনজঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। পালাতে লাগলো সুফী সাহেবের চাকর বাকর ও অনুচরেরাও।

কয়েকদিন পর আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। পূর্বের চেয়েও বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র ফৌজ এসে অতর্কিতে চড়াও হলো সুফী সাহেবের আত্মীয় স্বজনের বাসভবনে। সুফী সাহেবের নিকটতম আত্মীয় স্বজন ও একান্ত আপন লোকদের সর্বস্ব লুন্ঠন করে তাদের এমনভাবে নির্যাতন আর লাঞ্ছিত করলো যে, তা দেখে শায়খ আনোয়ার সাহেবের মাথায় তামাম শরীরের রক্ত এসে জমা হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে তাঁর পিতার কাছে এলেন এবং সবিনয়ে ও কাতর কন্ঠে এ কাহিনী বয়ান করলেন।

কিন্তু সুফী সাহেব তখন ধ্যানের মধ্যে এমন ভাবে তলিয়ে গেছেন যে, তাঁর ঠোঁট নড়ানোও তখন স্তিমিত হয়ে গেছে, শ্লথ হয়েছে তসবিহ্‌ টেপার গতি, ক্লেদ জমে রুদ্ধ হয়েছে দুই চোখের পাতা। কিসের যেন দীদার তিনি পাবেন পাচ্ছেন এই মতো অবস্থা।

পিতাকে নীরব দেখে শায়খ আনোয়ার সাহেব অধিকতর উচ্চকন্ঠে এ কাহিনী শোনালেন। সুফী সাহেবের তরফ থেকে তবু কোন সাড়াশব্দ বা জবাব বার্তা এলো না।



www.pathagar.com

শায়খ আনোয়ার সাহেব এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রচন্ড ক্রোধের সাথে প্রমত্ত কণ্ঠে তিনি চীৎকার শুরু করলেন। তিনি উন্মত্ত কণ্ঠে অভিযোগ করে বললেন–এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আপনার মতো দরবেশ থাকা সত্বেও এই বিধর্মীর হাতে মুসলমানেরা এমন নিদারুণভাবে উৎপীড়িত ও নিপীড়িত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আপনার কি কিছুই করার নেই। আপনি এমন নীরব হয়ে থেকেই কি সব দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান? আজ অপনাকে বলতেই হবে, আপনার মতলব কি? এমুলুকের মুসলমানেরা কি ধ্বংস হয়েই যাবে? ঐ পাপিষ্ঠ গণেশের পতন কি ঘটবেই না? বা এই পতন ঘটানোর ব্যাপারে আপনার কি নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই? কিছুই কি করবেন না আপনি?

শায়খ আনোয়ার সাহেবের চীৎকারে ধ্যান ভ্রষ্ট হয়ে সুফী সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল তাঁর চোখ দুটি। সে চোখে তখন সর্বগ্রাসী দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। আনোয়ার সাহেবের প্রশ্নের জবাবে তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন–ঘটবে। পতন ঘটবে ঐ দুর্বৃত্ত গণেশের। কিন্তু তার আগে পতন ঘটবে তোমার। সবুর যার নেই, ঈমান যার কমজোর, আমার পুত্র হবার যে অযোগ্য, আগে পতন ঘটবে তার।

চমকে উঠে শায়খ আনোয়ার সাহেব বললেন, আব্বা হুজুর!

সুফী সাহেব বললেন যে মুহূর্তে তোমার রক্তে সিক্ত হবে মাটি, ঠিক সেই মুহূর্তেই পতন ঘটবে গণেশের।

থর থর করে কেঁপে উঠলেন শায়খ আনোয়ার সাহেব। তিনি ভাল করেই জানতেন, তার পূন্যাত্মা পিতার মুখ থেকে যা বেরিয়েছে তা কখনও মিথ্যা হবার নয়। মিথ্যা কখনো হয়ওনি। তাঁর জিন্দেগীর এই পরিণতির আভাস পেয়ে শায়খ আনোয়ার সাহেব কিয়ৎকাল পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অতপর আর একটা দিক খেয়াল হতেই তিনি আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। জালিম গণেশের পতনও তাহলে অনিবার্য। পতন ঘটবে গণেশেরও। এ কথা খেয়াল হতেই নিজের মৃত্যু নিয়ে শায়খ আনোয়ার সাহেবের দিলে আর কোন তক্‌লীফই রইলো না। তাঁর এই একটা জানের বদলে বাংলা মুলুকের তামাম মুসলমান নাজাত পাবে গণেশের এই জুলুম থেকে। একি কম সৌভাগ্যের কথা। একি কম আনন্দের ব্যাপার? তাঁর এই তুচ্ছ জানের এক নগণ্য কোরবানি এমন একটা মহৎ কাজে লাগবে–এটা ভাবতেও এই মুহূর্তে দিলে তাঁর আসমানী তৃপ্তির এক পরশ এসে লাগলো।

এটা তাঁর খাহেশ হলো, তাঁর প্রিয় ভাতিজা শায়খ জাহিদের ব্যাপারে কোন মন্তব্য আছে কিনা তাঁর ওয়ালেদের –এটা জানার। তিনি অত্যন্ত সংযত ও বিনীত কণ্ঠে এবার তাঁর দরবেশ পিতাকে বললেন–আপনি আমার সম্বন্ধে যা বললেন, তা অত্যন্ত উপযুক্ত ও সংগত। আমি এতে খুশী। এমনটি ঘটুক এটা আমারও কাম্য। এখন আমার আরজ এই সাথে মেহেরবানি করে আমার ভাতিজা শায়খ জাহিদ সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা ব্যক্ত করলে বড়ই বাধিত হতাম।



www.pathagar.com

দরবেশ সাহেব ঐ একই রকম অটল কণ্ঠে বললেন, জাহিদের গুণাবলীর ডংকা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বাজতে থাকবে।

তৃপ্তদিলে নীরব হলেন শায়খ আনোয়ার সাহেব। এই সময় তাঁর পাশে আরো কিছু লোকজন এসে জুটেছিল। আনোয়ার সাহেব সহ আর কারো মুখে কোন কথা যোগালো না। বা আর কিছু বলার সাহসও কারো ছিল না। সকলেই সেখান থেকে আস্তে আস্তে বিদেয় হলেন।

সুফী সাহেবের লোকদের ওপর হামলা চালানোর দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাপতিদের একজন এসে রাজা গণেশকে বললেন মহারাজ, একে একে তিনটি হামলা আমরা দরবেশ নূর কুতুব-ই-আলমের লোকদের ওপর চালিয়েছি। এবার কি শায়খ আনোয়ার আর শায়খ জাহিদকে বাঁধবো?

শুনে রাজা গণেশ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বললেন-বলো কি! তিন তিনটি হামলা চালিয়েছো তোমরা? কোন বিপদ হয়নি এর মধ্যে? কোন ঝড় ঝাপটা আসেনি?

না মহারাজ, কোনই বিপদ হয়নি। একটা সেপাইও আহত হয়নি এতটুকু।

কোন প্রতিরোধ আসেনি তোমাদের বিরুদ্ধে?

গাছের একটা পাতাও উড়ে পড়েনি আমাদের সামনে। হামলা করার সাথে সাথেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কে কোথায় আত্মগোপন করেছে, খুঁজেই পাওয়া যায়নি।

বলো কি!

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। যাদের আমরা ধরার জন্যে গিয়েছি, খুঁজে খুঁজে ধরতে হয়েছে তাদেরকে। অনেককেই আবার তাড়িয়েও ধরতে হয়েছে।

রাজা গণেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। চিন্তিতও হলেন। এতটা নীরবতার অর্থ কি! তবে কি ঝড় উঠার পূর্বলক্ষণ? দেশের মধ্যে কোন স্থানে হামলা হলেই কমবেশী তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। অথচ মুসলমানদের একেবারেই এই কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাতের কোন প্রতিক্রিয়া নেই, এখানে কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও নেই। কারণ কি? এটাকে তো সহজ আর স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। কিসের বলে এ উদাসীনতা তাদের?

অনেকক্ষণ চিন্তার পর রাজা গণেশ প্রশ্ন করলেন-দরবেশের সামনে গিয়েছো কেউ তোমরা কখনও?

আজ্ঞে না মহারাজ। সে নির্দেশ তো আপনার ছিল না।

শুনোওনি কি কিছু? খোঁজ নিয়েও দেখোনি, এই হামলার সময়ে বা পরে কি করেছে সে? কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে?

সেনাপতিটি খামুশ হয়ে গেলেন। পরে তিনি নত শিরে বললেন-দরবেশের খাস কামরার দিকে আমরা কেউ যাইনি মহারাজ। সত্যি কথা বলতে কি, একে মহারাজের হুকুমও ছিল না, তার ওপর আবার কিসে কি হয় ভেবে, যেতে আমরা সাহসও কেউ করিনি। তবে শুনেছি, হল্লা-হামলার আগে-পরে সব সময়ই দরবেশ ধ্যান মগ্ন ছিলো এবং এখনও আছে। কোন কিছুতেই নড়েওনি, টলেওনি।

বলো কি! সব সময়ই ধ্যানমগ্ন আছে?



www.pathagar.com

হ্যাঁ মহারাজ, প্রত্যক্ষদর্শীরা তাই বলছে।

উঠেওনি, পালায়ওনি?

না মহারজা।

আশ্চর্য!

রাজা গণেশ হঠাৎ মনমরা হয়ে গেলেন। তাঁকে খুবই উদাসীন দেখাতে লাগলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেনাপতিটি ফের বললেন–তাহলে দরবেশের ঐ বেটা আর নাতিটাকে এখন বাঁধবো মহারাজ?

কিছু অন্যমনস্ক ভাবেই রাজা গণেশ এর জবাবে বললেন হ্যাঁ, বাঁধো। খুব সাবধানে বেধে নিয়ে সোনার গাঁয়ে চলে যাও। এ নিয়ে কোন হৈ চৈ করতে যেয়োনা।

তথাস্তু মহারাজ।

সেনাপতিটি বিদায় হলেন। তিনি গিয়ে শায়খ আনোয়ার আর শায়খ জাহিদকে বাঁধার আয়োজন করতে লাগলেন। রাজা গণেশ কিছুক্ষণ ঐভাবেই বসে রইলেন ওখানে।

দরবেশ পিতার চরম জবাব শোনার পর শায়খ আনোয়ার সাহেব এসে শায়খ জাহিদ সাহেবকে ডেকে বললেন ভাতিজা, প্রতিরোধ সম্বন্ধে আব্বা হুজুরের নির্দেশ কিছু না থাকলেও, আমাদের তো এভাবে সেরেফ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করলে আর চলছে না। এই খানকা শরীফেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় আমাদের। সারা দেশের আগুন নেভানো সম্ভব যখন হচ্ছে না, তখন খামোকা আর এদিকে ওদিকে শক্তিক্ষয় না করে খানকা শরীফটা যেভাবেই হোক, হেফাজত করতে হয় আমাদের। গতিবিধি যা লক্ষ্য করছি তাতে, আমাদের যা হয় হোকগে, আমার পূণ্যাত্মা ওয়ালেদকেও বেইযযত করতে পারে ঐ নির্বোধ কাফেররা।

শায়খ জাহিদ সাহেব এর জবাবে সোচ্চার কণ্ঠে বললেন, কি তাজ্জব ব্যাপার চাচা! একদম আমার দিলের কথাই তুলে ধরেছেন আপনি। এতক্ষণ আমিও বসে বসে এই কথাই ভাবছি। মনে করছি, এ নিয়ে এক্ষুণি আমি আপনার কাছে যাবো। অপনার ধারণা খুবই যুক্তি সঙ্গত। যা স্পর্দ্ধা বেড়েছে জালিমদের, তাতে ওরা যে কোন মুহূর্তে ঠিকই দাদুকেও বেইযযত করতে পারে। আমাদের সমুদয় শক্তি এই খানকা শরীফে মোতায়েন রাখা খুবই উচিত বলে আমিও মনে করি। অন্তত এই খানকা শরীফের ওপর হামলা চালানোর মতো দুর্মতি ঐ কাফেরদের হবে না, এ বিশ্বাস তো আর রইলো না। দেখি–দেখি করতে করতে তিন তিনবার হামলা করে ওরা আমাদের যারপরনাই দুর্ভোগ ঘটিয়ে গেল।

এই জন্যেই তো বলছি আর চুপ থাকলে চলছে না। ভুলু খাঁ সাহেব কোথায়? তাঁর সমুদয় শক্তি নিয়ে এখন থেকে তাঁকে অহরহ এই খানকা শরীফেই মোতায়েন থাকার খবর পাঠাও। বুঝেছো?

জি চাচা।



www.pathagar.com

খাঁ সাহেব অনেক আগে থেকেই এ প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। কিন্তু আব্বা হুজুর অসন্তুষ্ট হবেন ভেবে, তাঁর আস্তানায় ফৌজ মোতায়েন রাখার কোন সাহস আমি পাইনি। কিন্তু আর দ্বিমত করলে চলছে না।

ভূলু খাঁ সাহেব ধুমা দিঘিতে আছেন। আজকেই আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি সবাইকে গুছিয়ে নিয়ে আগামীকাল সকালের মধ্যেই ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাবেন খাঁ সাহেব।

হ্যাঁ, তাই পাঠাও। আমি আমাদের জঙ্গী মুসল্লীদের খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আগামীকালের মধ্যেই সবাইকে এনে হাজির করবো এখানে। খানকা শরীফ আর অরক্ষিত রাখা যাবে না।

আলাপ আলোচনান্তে দুই চাচা ভাস্তে দুইদিকে লোক পাঠানোর ইরাদায় উঠে গেলেন।

তবু সে রাতটা খানকা শরীফ অরক্ষিতই রইলো। আর ঐ একটা রাতই পার আর হলো না। ঐ রাতেই আবার এলো রাজার ফৌজ। বিপুল সংখ্যায় নয়। বাছাই বাছাই কিছু সংখ্যক দক্ষ ফৌজ নিয়ে দুই তিনজন সৈন্যাধক্ষ্য এলেন এবার। চোরের মতো চুপি চুপি শায়খ আনোয়ার ও শায়খ জাহিদ সাহেবের শয়ন কক্ষে তাঁরা ফৌজ নিয়ে ঢুকলেন এবং অতর্কিত আক্রমণে ঘুমন্ত অবস্থাতেই বেঁধে ফেলেন তাঁদের। শুধু হাতগুলোই সেনাপতিরা বাঁধলেন না। আওয়াজ দেয়ার আগেই এই শায়খদ্বয়ের মুখও তাঁরা বেঁধে ফেললেন শক্ত করে এবং কেউ কিছু জানার আগেই তাঁদের নিয়ে রওনা হলেন সোনার গাঁয়ের দিকে।

## ২০

প্রস্তুতিটা পোক্ত হয়ে উঠেছে। রাজ প্রাসাদের দাস-দাসী, সেপাই-শান্ত্রী এখন প্রায় সকলেই জালালউদ্দীনের পক্ষ হয়ে তাজউদ্দীনের ঝান্ডা তলে এসেছে। আগের চেয়ে রাজা গণেশের আরো অনেক বেশী ফৌজ তাজউদ্দীনের মাধ্যমে জালালউদ্দীনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। বাহিনীতে যোগদানকারী নব নিযুক্ত লোকদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাজউদ্দীন দক্ষ করে তুলেছে। সম্মুখ জেহাদে নামার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তাজউদ্দীনের হাতে না থাকলেও, তাজউদ্দীন এটা বুঝে নিয়েছে, সম্মুখ লড়াই এড়াতে কিছুতেই সে পারবে না। শেষ মুহূর্তে সম্মুখ লড়াই লড়তেই হবে একটা। রাজা গণেশ দৃশ্য থেকে অপসারিত হলেও বিরাট এই প্রতিকূল পরিবেশে এবং রাজশক্তির বিপুল এই অস্তিত্বের সামনে মুসলমান জালালউদ্দীন কুসুমাস্তীর্ণ পথে গিয়ে মসনদে উঠতে পারবে না। বিপত্তি একটা আসবেই অতি ভয়ংকর। সেই বিপত্তি উত্তীর্ণ হতে পারলেই আসবে সত্যিকারের কামিয়াবী। তার আগে নয়।



www.pathagar.com

এসব বিষয় তাজউদ্দীনের নখদর্পণে। কখন কি ঘটবে, কোন পথে কোন বাধা আসবে– অনেক আগেই তাজউদ্দীন তার নকসা এঁকে নিয়েছে।

সংগ্রামেরও নকসা একটা খাড়া করেছে তাজউদ্দীন। কোথা থেকে সংগ্রামটা শুরু করা সম্ভব, কোথা থেকে শুরু করলে অভীষ্টে এগুতে পারবে তারা–এ নকসা তার তৈয়ার। এ জেহাদের শুরুটাই বড় মারাত্মক। শুরুটাকে সাফল্য মন্ডিত করা গেলে, জেহাদের প্রায় সিংহভাগই খতম হবে সাথে সাথেই।

সেই শুরুটা হলো কাল কেউটে ধরার মতো শুরু। আকস্মিক ভাবে সরাসরি মাথা চেপে না ধরে লেজ চেপে ধরলে মৃত্যু, একদম মৃত্যুর চেয়েও সুনিশ্চিত। আর শুধু তাই–ই নয়। চরম আঘাত হানার আগে আঘাত হানার তিল পরিমাণ আভাসটুকু ছড়িয়ে পড়লেও, ফল হবে মারাত্মক। তাতে শিকারই শুধু হাতছাড়া হবে না, উল্টো শিকারই এসে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে মট্‌কে দেবে ঘাড়।

কারাগার থেকে তাকিদ দিচ্ছে জালালউদ্দীন "দোস্ত, আর কতদিন? অধিক দেরী এখন আমার মউতেরই আলামত। আমার পরিবর্তনের আশা আমার পিতা এখন ছেড়ে দিয়েছেন একদম। আমার মতো বিষাক্ত অঙ্গ বাতিল করার কল্পনাই উনি গ্রহণ করেছেন এখন। রাজবংশের কলংক আর হিন্দু শাসনের সম্ভাব্য অন্তরায় আমাকে হত্যা করার মধ্য দিয়েই মুক্ত করতে চান তিনি। অতএব, আর কালক্ষয় না করে, অতি সত্বর শুরু করুন আপনার করণীয়।

করণীয়টা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে জালালউদ্দীন। কিন্তু তাজউদ্দীন ভেবে পেরেশান, যা করণীয় তা জালালউদ্দীনই শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারবে কিনা।

কিভাবে এবং কোথা থেকে শুরু করা যায় করণীয়, পত্রের মাধ্যমে তাজউদ্দীন জালালউদ্দীনের মতামত চেয়ে পাঠালো। জবাবে জালালউদ্দীন সুস্পষ্ট ভাবে জানালো–"আমার বাপকে অতর্কিতে হত্যা করে মসনদ দখল করা ছাড়া, দ্বিতীয় কোন পন্থাই মাথায় আমার খেলছে না। আপনার মাথায় খেললে তা জানান।"

জবাব পেয়ে হাঁফ ছাড়লো তাজউদ্দীন। এই একটি মাত্র পন্থা ছাড়া অর্থাৎ রাজা গণেশকে অতর্কিতে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে জেহাদ শুরু করা ছাড়া দুসরা কোন পথ তাজউদ্দীনও যথাসাধ্য হাতড়িয়ে পায়নি। সে খুশী হয়ে জালালউদ্দীনকে লিখলো–"দোস্ত, ঐ একটি মাত্র পথ ছাড়া, দ্বিতীয় কোন গ্রহণযোগ্য পথই আমি পাইনি। এ ব্যাপারে এখন আপনার এজাযত টুকু পেলেই এগুতে পারি আমরা।"

তাজউদ্দীনের এই এজাযত চাওয়া অযৌক্তিক কিছু নয়। হাজার হোক, গণেশ তার বাপ। কিন্তু জালালউদ্দীনের মাথা এতে বিগড়ে গেল বিলকুলই। সে অত্যন্ত আক্ষেপ করে লিখলো–

"দোস্ত, মাছ ধরবেন পানি ছোবেন না, তা কখনও হয়? এই অবশ্য করণীয় কাজের যদি আমার এজাযত খুঁজতে আসেন, তাহলে আমাকে আপনি মুক্ত করতে পারবেন–এটা বিশ্বাস করতে এখন আমার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। যদি আপনারও পরিকল্পনায় ঐ একই চিন্তা খেলে থাকে, তাহলে এতদিন তা না করে কাল হরণ করেছেন কেন–এর কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনে।



www.pathagar.com

আমার পিতা বলে যদি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন আপনি, আর আপনার এই ইতস্ততের জন্যে যদি মরতে হয় আমাকে, তাহলে বলতে আমার কষ্ট হলেও বলবো, আপনার মদদ আমার দরকার নেই। আমি আমার চাকর দিয়েই রাজাকে তার শয়নকক্ষে গুপ্ত হত্যা করে বাঁচার চেষ্টা করবো। আপনি বরং আপনার জান বিপন্ন না করে নিরাপদ স্থানে ওয়াপস্ যেতে পারেন।

জালালউদ্দীনের জবাব পেয়ে তাজউদ্দীন শরমিন্দা বোধ করলো এবং সেই সাথে বুঝলো– হতাশায় জালালউদ্দীন এখন মস্তিস্ক বিকৃতির পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ক্ষমা প্রার্থনা করে তাজউদ্দীন তৎক্ষণাৎ জালালউদ্দীনকে আশ্বাস দিয়ে লিখলো–"দোস্ত, যেটুকু আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তা কেটে গেছে। আমি এখন তৈয়ার। মেহেরবানি করে আপনি কিছু করতে গিয়ে সব বানচাল করে দেবেন না। আর সামান্য একটু ধৈর্য ধরুন। গুপ্ত হত্যাই করা হবে। আমি এখন সুযোগের অপেক্ষায় আছি মাত্র।"

কিন্তু এই সুযোগ পাওয়াই তাজউদ্দীনের দুরূহ হয়ে পড়েছে। সুযোগ সে কিছুতেই আর পাচ্ছে না। রাজাকে হত্যা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয় এখন। যখন তখন তা সম্ভব। কঠিন হলো–হত্যার পরেই যা ঘটবে তা সামাল দেয়া। দেশে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ নেই। মুসলমান নিধন করার কাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাপতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীই যথেষ্ট। বড় বড় বাহিনী নিয়ে বড় বড় সেনাপতিরা গাঁটি হয়ে বসে আছে রাজধানীতেই। অন্য কথায়, পান্ডুয়ারাজের সমুদয় শক্তি এখন সদরেই মোতায়েন।

কাজেই রাজা গণেশের হত্যার খবর দেয়ালের বাইরে না আসতেই গর্জে উঠবে রাজ শক্তি। তাজউদ্দীনের বাহিনী এত বৃহৎ নয় যে, এই শক্তির সমবেত আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। অন্তত এর অর্দ্ধেকটা কোন কাজে রাজধানী থেকে ক্ষণিকের জন্যে স্থানান্তরিত হলেও একটা সুযোগ আসে তাজউদ্দীনের। সে মাঠে নামতে পারে। কিন্তু কোথায় সে সুযোগ।

তাজউদ্দীন শংকিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যেই যদি জালালউদ্দীনের চরম সর্বনাশ ঘটে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে খুব শিগগির সেই সুযোগের একটা আভাস পেলো তাজউদ্দীন। হঠাৎ করেই তাজউদ্দীন একদিন শুনলো–বাংলা মুলুকের পশ্চিম সীমান্তে ফৌজ মোতায়েন করার অত্যন্ত জরুরত দেখা দিয়েছে। ত্রিহুতরাজ দেব সিংহ বাংলা মুলুকের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর পর পর কয়েকটি কেল্লা নির্মাণ কাজে জোরদার ভাবে মনোনিবেশ করেছেন। উদ্দেশ্য তার নিঃসন্দেহে মহৎ নয়–বিবেচনায় দেবসিংহের এ প্রচেষ্টা বানচাল করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম সীমান্তে অতিশয় বড় ধরনের বাহিনী পাঠানো জরুরী হয়ে পড়েছে। তাজউদ্দীন শুনলো– চার পাঁচ দিনের মধ্যেই রাজশক্তির প্রায় অর্দ্ধেকটাই শ্রীমাধব রায় রাজ্যধর ও অন্য কয়জন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে সীমান্তের দিকে রওনা হবে।

এখনই–নয়, কখনও নয়। তাজউদ্দীন বুঝলো, এই সেই সুযোগ। নিখুঁত ভাবে সংবাদ নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর তাজউদ্দীন তার সেপাই–সঙ্গীদের সতর্ক করে দিয়ে বিপুল উৎসাহ ভরে দিন গুনতে লাগলো।



www.pathagar.com

শায়খ আনোয়ার আর শায়খ জাহিদ সাহেবদের বেঁধে নিয়ে যে তিনজন সেনাপতি সোনার গাঁয়ে এলো, তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম চরিত্র যার তার নাম ভীমসেন। ভীমসেন মেজাজে অধিক উগ্র মগজে অধিক মোটা এবং মুসলিম বিদ্বেষের ব্যাপারে অধিকতর অগ্রগামী। সহানুভূতি, সমবেদনা, সম্মান বোধ–এসব ব্যাপারে তার উপলব্ধি ক্ষীণতম। অন্যদিকে, রাজার মনোরঞ্জনে ও স্বার্থের খাতিরে যে কোন জনের পদ লেহনে তার জুটিও তেমন ছিল না। আর সেটাও আবার পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। কায়দা পেলেই বাঘ, বেকায়দা হলেই ফেউ। এই ভীমসেনই সেনাপতিদের প্রধান।

সোনার গাঁয়ে পৌঁছে শায়খদ্বয়কে কারারুদ্ধ করার পরই ভীমসেন ছুটে এলো পান্ডুয়ায়। সে এসে রাজার সামনে বীরদর্পে দাঁড়ালো। বললো–মহারাজ, বাজীমাৎ। বেঁধে ফেলেছি ব্যাটাদের। এখন আপনার আদেশ কি বলুন?

রাজা তখন পুত্র যদু নারায়ণের ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে অবনীনাথ, নরসিং পীতাম্বর ও আরো কয়জনকে নিয়ে আলোচনায় রত ছিলেন। সকলেরই অভিমত–যদু নারায়ণের সুমতি আর ফিরবে না। ফেরার কোন লক্ষণও আর নেই। কাজেই দুষ্ট অঙ্গ যথা শিগগির ছেদন করা নিরাপদ। বিলম্বে স্রেফ বিপত্তিরই সম্ভাবনা। রাজারও ঐ একই মত। অল্পদিনের মধ্যেই এই দুষ্ট অঙ্গ ছেদন করবেন তিনি। এখন কিভাবে এই ছেদন পর্ব সম্পন্ন করা হবে–এ নিয়েই মতান্তর দেখা দিয়েছে। কেউ বলছেন গোপনে, প্রকাশ্যে বিপত্তি ঘটতে পারে। কেউ বলছেন প্রকাশ্যে। সবার মনে আতংক সৃষ্টি হলে বিদ্রোহের বীজ বিলীন হয়ে যাবে। ঠিক এই মুহূর্তে হাজির হলো ভীমসেন।

রাজা গণেশ জিজ্ঞাসুনেত্রে ভীমসেনের দিকে চেয়ে বললেন–কি বললে?

ভীমসেন বললো–ব্যাটাদের এখন কি করবো আমরা?

মানে?

মানে, দরবেশের ঐ বেটা আর নাতী এখন সোনার গাঁয়ে মহারাজ। ওখানে ওদের রেখে এসেছি। আমি জানতে এসেছি, ওদের ব্যাপারে মহারাজের কি আদেশ এখন?

খেয়াল হতেই রাজা গণেশ বললেন–এ্যাঁ! তাই নাকি। সাব্বাস। বেশ করেছ। বাহাদুরের মতো কাজ করেছো বটে। এখন চাবুক চালাও।

চাবুক চালাবো?

হ্যাঁ, চাবুক চালিয়ে ওদের গুপ্তধনের খবরটা আগে বের করে নাও।

গুপ্তধন!

ভীমসেন বিস্মিত হয়ে রাজার দিকে তাকালো। রাজা বললেন–বুঝলে না? দরবেশের গুপ্তধনটা কোথায় আছে, সে হদিস ওরা নিশ্চয়ই জানে। ওদের চাবুক লাগাও, ওরা গড় গড় করে সব বলে দেবে।

ওদের গুপ্তধন আছে নাকি মহারাজ? তাতো আমরা জানতাম না?

মূর্খ! গুপ্তধন না থাকলে এত অর্থ কোথা থেকে পায় ওরা? খানকা বাড়ির বিপুল ঐ খরচ কোথা থেকে চালায়? খানকা তো নয়, একটা ছোট খাটো রাজ্য।



www.pathagar.com

উপস্থিত পারিষদেরা রাজার কথায় সায় দিয়ে বললেন–ঠিক–ঠিক।

রাজা গণেশ বলেই চললেন–এই যে শত শত লোক খাচ্ছে, থাকছে, হাজার কাজে হাজার ভাবে গাদা গাদা অর্থ যোগান দিচ্ছে, এ সব কোথা থেকে আসে? আমাদের বিরুদ্ধে এই যে গুপ্তভাবে লড়ছে যারা, ওদের মদদ কে যোগায়? তৌহিদ বেগের বাহিনীর খরচটাও যে ঐ খানকা থেকে আসেনা, তা কে বলবে? যাদের খরচ করার পরিমাণ দেখলে রাজভান্ডারও লজ্জা পায়, গুপ্ত ধন না থাকলে এত অর্থ কোথায় পাবে তারা?

অবশ্য এমন ধারণার জন্যে রাজা গণেশকে দোষারোপ করা যায় না। সুফী হজরত নূর কুতুব–ই–আলম সাহেবের ব্যয়ের পরিমাণ দেখলে, যে কোন লোক এই ভাবনাই ভাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভূতপূর্ব সুলতান সিকান্দার শাহও সুফী সাহেবের ওয়ালেদ শায়খ আলাউল হক সাহেবকে পান্ডুয়া থেকে নির্বাসিত করেন। তিনি শায়খ আলাউল হককে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। অবশ্য পরে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন–এর বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস দেশ বিদেশের সংখ্যাহীন ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন। তারাই যোগায় এ অর্থ। সংসার ত্যাগী দরবেশগণের একান্ত অনিহা সত্বেও এই পরিমাণ অর্থ আসে খানকা শরীফে। দরবেশগণ মুখ ফুটে চাইতেন যদি, তাহলে পরিস্থিতি যা দাঁড়াতো, তা কল্পনারও বাইরে। সুলতান সিকান্দর শাহ একজন মুসলমান সুলতান হয়েও একজন সত্যিকারের দরবেশের কদর বুঝতে ভুল করতে পারেন যদি, বিধর্মী গণেশ এ ভুল করবে–এ আর বিচিত্র কি।

রাজার কথায় ভীমসেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললো–তাইতো মহারাজ। ব্যাপারটাতো, ঠিকই তাই। নইলে আয় নেই, উপায় নেই, বিষয় নেই, বিত্ত নেই, একজন গাছতলার ফকির এত অর্থ পায় কোথায়? অবশ্যই ওদের গুপ্তধন আছে।

রাজা বললেন–হ্যাঁ, সেই কথাইতো বলছি।

ভীমসেন বললো–ঠিক আছে মহারাজ। চাবকে আমি এ সন্ধান আদায় করে নেবো। কিন্তু তারপর? তারপর কি করবো?

রাজা বললেন–তারপর মানে?

মানে কি করবো বন্দীদের? ছেড়ে দেবো, না কারাগারেই ফেলে রাখবো?

হত্যা করবে।

খুশীতে লাফিয়ে উঠলো ভীমসেন। বললো–হত্যা করবো?

হ্যাঁ। হত্যা করবে। খোঁজটা আদায় করে নিয়ে দুইজনকেই হত্যা করবে। বাগে পেয়ে আপদ আর জিইয়ে কিছু রাখবো না।

রাজা গণেশ সরাসরি বলে ফেললেন এ কথা। কোন রকম ইতস্তত বা গড়িমসির মধ্যে আর গেলেন না। তিনি বুঝে নিয়েছেন তাঁর এ দ্বিধা অর্থহীন। মুসলমানদের উচ্ছেদ করে যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি কৈশোর থেকে প্রাণপাত করে আসছেন, দরবেশের আধ্যাত্মিক শক্তির ভয়ে এখন যদি এই শেষ মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়েন, তাহলে তো সবই তাঁর পন্ডশ্রম। এদের টিকিয়ে রাখার অর্থই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকা এবং মুসলমানদের কাছে



www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করা। এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। আর তা যখন পারেন না, নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে যখন বদ্ধপরিকর তিনি তখন এই সব সুফী দরবেশদের হত্যা তাঁকে করতেই হবে–পরিণতি যা আসে এতে আসুক।

অন্ধ জিদে উন্মত হয়ে , হয় এস্পার নয় ওস্পার –এমনই একটা মানসিকতার ওপর এক্ষণে অবস্থান নিয়েছে রাজা গণেশ।

হত্যা করার হুকুম পেয়ে নাচতে নাচতে বিদেয় হলো ভীমসেন। যাবার সময় সে বলে গেল, অতি সত্বরই রাজাদেশ পালন করবে সে এবং পালন করা শেষ হলেই রাজাকে তা জানাবে।

ভীমসেন বরাবরই প্রতি কাজে অতি উৎসাহী। এবারও তার উৎসাহের অভাব কিছু ঘটলো না। আরাম বিরাম ত্যাগ করে সে ঐ ভাবেই ছুটে গেল সোনার গাঁয়ে। রাজার আদেশ অন্যান্য সেপাই সেনাদের জানিয়ে দিয়ে সে এসে হাজির হলো বন্দীদ্বয়ের সামনে। তম্বির সাথে বললো–শুনো মিয়ারা, তোমাদেরকে হত্যা করার আদেশ আছে আমার ওপর। তবু তোমাদের হত্যা আমি করবো না, যদি একটা সঠিক খবর দাও আমাকে।

শায়খ সাহেবদের আদৌ কোন খাহেশ ছিলোনা এই বেইমানদের সাথে ব্যাক্যালাপে রত হতে। বদনসীবের দরুন দুর্বৃত্তের হাতে পড়েছেন যখন তাঁরা, তখন প্রাণ যে এদের যাবেই – এটা স্পষ্ট ভাবেই জানা আছে শায়খদ্বয়ের। শায়খ আনোয়ার সাহেব তো তাঁর ওয়ালেদের মন্তব্য জানেনই। এটা যে তারই আলামত এটাও তিনি বুঝে নিয়েছেন যথার্থই। তবু কিছুটা কৌতুহলের বশেই শায়খ আনোয়ার সাহেব ভীমসেনের কথার প্রেক্ষিতে বললেন কিসের খবর?

তোমাদের গুপধনের। কোথায় তোমাদের গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছো তোমরা? সে হদিস আমাকে দাও, আমি তোমাদের মুক্ত করে দেবো।

শায়খ আনোয়ার সাহেবের মুখমন্ডলে একটা অপরিসীম ঘৃণার অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। বেইমানের দল। এদের এই ওয়াদার মূল্য যে কত তুচ্ছ, তাতো জানাই আছে তাঁদের। জানে বাংলা মুলুকের সকলেই। গুপ্তধন যদি থাকতোও তাঁদের কিছু এবং সে খবর যদি দিতেনও তিনি এদের, তবু এরা যে এ ওয়াদা আদৌ রক্ষা করতো না তা তিনি ঠিকই বোঝেন। তাই অধিক কথায় না গিয়ে তিনি বললেন–আমাদের কোন গুপ্তধন নেই।

গর্জে উঠলো ভীমসেন। বললো–খবরদার মিথ্যা কথা বলবে না।

আনোয়ার সাহেব নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন–মিথ্যা বলে তোমদের মতো বেইমান আর কাফেরেরা। মিথ্যা বলাই তোমাদের তো মূলধন। কোন মুসলমান কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

ক্ষিপ্ত হয়ে ভীমসেন চাবুক হাতে নিলো। ক্রোধের বশে বন বন করে চাবুকখানা ঘুরাতে ঘুরাতে বললো–বল, বল্ শিগগির যবনের বাচ্চা যবন, গুপ্তধন কোথায় আছে শিগির বল্। নইলে নাম আমার ভীমসেন। আমার যে কি ভীম ভয়ংকর রূপ তা এখনই তোকে দেখাবো। বল্, কোথায় আছে গুপ্তধন?

কোন গুপ্তধন আমাদের নেই।



www.pathagar.com

ধমকে উঠলো ভীমসেন। বললো–ফের মিথ্যা কথা?

বলেছিই তো, ওটা তোমাদের পেশা, তোমাদের স্বভাব। আমরা মিথ্যা বলি না।

বটে। সোজা আঙ্গুলে ঘি তাহলে উঠবে না। দ্যাখ্ তাহলে বাঁকা আঙ্গুলে কি ভয়ংকর–

বলেই ভীমসেন উন্মত্তভাবে শায়খ আনোয়ার সাহেবের পিঠের ওপর চাবুক চালাতে লাগলো। চাবুক চালাতে লাগলো তার আজ্ঞাবাহী সেপাইরাও। চাবুকের পর চাবুকের নির্মম আঘাতে শায়খ আনোয়ার সাহেব খানিক পরেই সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন।

ভীমসেন এবার শায়খ জাহিদ সাহেবের সামনে এসে বললো–দেখতেই তো পাচ্ছো কি অবস্থা হয়েছে তোমার চাচার? সত্যি কথা না বললে ঐ একই দশা তোমারও এখনই হবে। বলো, কোথায় আছে তোমাদের গুপ্তধন?

প্রত্যুত্তরে শায়খ জাহিদ সাহেব একই কথা বললেন–আমাদের কোন গুপ্তধন কিছু নেই বা কখনও ছিল না।

বটে।

আরো বলে রাখি, গুপ্তধন কিছু থাকলেও, তোমাদের মতো বেইমানদের কাছে ঐ চাবুকের ভয়ে তা বলতাম না।

তবেরে নরাধম। এই দ্যাখো কি তোমরা? চালাও চাবুক।

সঙ্গীদের চাবুক চালানোর নির্দেশ দিয়ে নিজেও সে নির্মম ভাবে চাবুক মারতে লাগলো। সকলের সমবেত আঘাতে শায়খ জাহিদ সাহেবও অল্পক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

এরপর অন্য দুইজন সেনাপতিকে নিয়ে বসে ভীমসেন এই সিদ্ধান্তে এলো যে, পাশাপাশি থাকায় একে অন্যের মুখচেয়ে আসল কথা বলছে না। এদের সরিয়ে নেয়া হোক। লোকালয় থেকে দূরে পৃথক পৃথক অরণ্যের মধ্যে এক একজনকে নিয়ে যাওয়া হোক। গাছের ডালে ঝুলিয়ে এককভাবে চাবুক চালালে আসল কথা বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা অধিক।

এই সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হলো। শায়খ আনোয়ার আর শায়খ জাহিদ সাহেবকে ক্রোশ দুইয়েকের ব্যবধানে সোনার গাঁয়ের দুইদিকে দুই বনের মধ্যে নেয়া হলো। পৃথক করে নেয়ার পর গাছের ডালে ঝুলিয়ে কয়েকদিন অমানুষিক নির্যাতন করা হলো। কিন্তু গুপ্তধনের সন্ধান কিছু মিললো না।

শায়খ জাহিদের লোক ধুমাদীঘিতে গিয়ে ভুলু খাঁকে খানকা শরীফের নিরাপত্তার কথা জানাতেই লাফিয়ে উঠলো ভুলু খাঁ। খানকা শরীফের নিরাপত্তা বিধানে সে আগে থেকেই আগ্রহী ছিল। এবার সে তার সেপাইদের গুছিয়ে নিয়ে সকলেই ছদ্মবেশে পরের দিন সকালেই এসে হাজির হলো খানকা শরীফে

www.pathagar.com

কিন্তু খানকা শরীফে পৌঁছেই সে যা শুনলো–তাতে সে ক্ষণিকের জন্যে বজ্রাহতের মতো অসাড় হয়ে গেল। সবাই তাকে জানালো –শায়খ আনোয়ার সাহেব আর শায়খ জাহিদ সাহেব রাত্রি থেকেই নিরুদ্দেশ। তাদের ঘর দুয়ারের অবস্থা দেখেই বুঝা যায়, তাদের ঘরে দুশমণদের হামলা হয়েছিল। এছাড়া রাত্রিকালে অনেক লোকের আগমনের আভাসও খানকা শরীফের একজন পেয়েছে।

দুশমণেরাই যে নিয়ে গেছে তাঁদের, এ সম্বন্ধে ভুলু খাঁর চুল পরিমাণ সন্দেহও রইলো না। শুধু চিন্তা হলো–নিয়ে তারা কোন দিকে গেল। রাজধানীতে, না অন্যদিকে? রাজধানীতে গেলে তেমন চিন্তা নেই। তাজউদ্দীন আছে সেখানে। রাজ প্রাসাদে প্রজাদের পক্ষে অনেক লোক এখন। ওখানে তাঁদের নিয়ে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবেই। যদি হত্যা করে লাশ তাঁদের গোপন করে না থাকে, তাহলে তাঁদের অন্য দিকে নিয়ে গেছে। খুঁজতে হবে অন্যদিকে সর্বত্রই।

তার চেলাদের সে তলব দিলো। সাপুড়ে, বেদে, বাউল, বাজীকর, লাঠিয়াল, খেলোয়ার–সকলকেই। তাদের সে ছেড়ে দিলো দেশময়। তারা ছড়িয়ে পড়লো গোটা দেশের আনাচে কানাচে। কয়েকদিন পর খবর এলো–শায়খদ্বয় এখন সোনার গাঁয়ের জঙ্গলে। গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাজার লোকেরা তাঁদের ওপর যারপরনাই নির্যাতন চালাচ্ছে সেখানে।

কাল বিলম্ব না করে সেপাইদের নিয়ে ছদ্মবেশে তৎক্ষণাৎ সোনার গাঁয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ভুলু খাঁ। শায়খদ্বয়ের অবস্থা তখন শোচনীয়। কশাঘাতে আর প্রহারে একেবারেই অন্তিম অবস্থা তাঁদের। শায়খ জাহিদ সাহেবের জানামতে একটি স্বর্ণমুদ্রা এক জায়গায় পোঁতা ছিল। মালিক এখন মৃত। ভীমসেন জাহিদ সাহেবের গায়ের চামড়া কেটে লবন লাগিয়ে দেয়ার সময় আধা অজ্ঞান অবস্থায় জাহিদ সাহেব সেই জায়গার নিশানা দিয়ে ভীমসেনকে বলেছিল–ওখানে মাটির নীচে স্বর্ণমুদ্রা পোঁতা আছে।

অঢেল সম্পদ আছে ভেবে ভীমসেন একাই গেল সেখানে। কিন্তু মাটি খুঁড়ে একটিমাত্র স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার ফলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ভীমসেনের ধারণা হলো–একটি মাত্র মুদ্রা এখানে রেখে তামাম মুদ্রা শায়খ জাহিদই অন্যত্র সরিয়ে রেখে দিয়েছে। আসল ভান্ডারের খবর তাকে দেয়নি। ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এসে আসল ভান্ডারের সন্ধান নেয়ার উদ্দেশ্যে ভীমসেন সেদিন জাহিদ সাহেবের ওপর এমন নির্যাতন শুরু করলো যে, সত্যি খবর না বললে সে মেরেই ফেলবে জাহিদ সাহেবকে।

ঠিক ঐ দিনই সোনার গাঁয়ে ভুলু খাঁ এসে সসৈন্যে হাজির হলো। তার চেলা আর কিছু পথ প্রদর্শকের সাহায্যে নিদিষ্ট ঐ বনের মধ্যে এসে ভীমসেনকে সসৈন্যে ঘিরে ফেললো ভুলু খাঁ। কাউকে কোন পদক্ষেপ নেয়ার কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়ে অতর্কিত আঘাতে দুশমনদের সবাইকে হত্যা করতে এবং ভীমসেনকে জীবন্ত গ্রথিত করে শায়খ জাহিদ সাহেবকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলো ভুলু খাঁ। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও শায়খ আনোয়ার সাহেবকে সে অল্পের জন্যে রক্ষা করতে পারলো না।

স্থানীয় কিছু চেলা আর তাদের আত্মীয় স্বজনের পথনির্দেশনায় ভুলু খাঁ যখন শায়খ আনোয়ার সাহেবের উদ্ধার কল্পে এসে অতর্কিতে রাজার লোকদের ঘেরাও করলো, শায়খ



www.pathagar.com

অনোয়ার সাহেবকে তখন একটা গাছের সাথে ঝুলিয়ে প্রহার করা হচ্ছিল। রাজার ফৌজ সংখ্যায় এখানে অধিক ছিল। তাই সংগে সংগে ভুলু খাঁ এদের সবাইকে বাগে আনতে পারলো না। ভুলু খাঁর এই অতর্কিত হামলায় চমকে গিয়ে পলায়ণের ব্যর্থ চেষ্টা করে যখন সকলেই ভুলু খাঁর সেপাইদের হাতে মরতে লাগলো, তখন রাজার এক সেনাপতি মরতে হচ্ছেই দেখে, তলোয়ারের এক কোপ মারলো শায়খ আনোয়ার সাহেবের স্কন্ধে। সংগে সংগে শায়খ আনোয়ার সাহেবের পবিত্র শির ধড় থেকে ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হলো এবং ক্ষত থেকে ছুটতে লাগলো রক্তের প্লাবন। ক্ষোভে দুঃখে আক্রোশে উন্মত্ত ভুলু খাঁ দুশমণদের দ্বিখন্ডিত লাশগুলো শত খন্ডে খন্ডিত করতে লাগলো।

শেষ হয়েছে তাজউদ্দীনের দিনগনা। সকাল থেকেই পান্ডুয়ার সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বাংলা মুলুকের পশ্চিম সীমান্তে আজকেই রওনা হবে রাজা গণেশের বাহিনী। তাজউদ্দীন ও তার লোক লস্কর সবাই এখন মানসিক ভাবে তৈয়ার। দৈহিক ভাবে তৈয়ার হবে রাজার ফৌজ বিদায় হলেই।

দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়লো রাজার ফৌজ। বিপুল এক বাহিনী। নেতৃত্বে আছেন সেনাপতি শ্রীমাধব ও রায় রাজ্যধর রায়। অধীনস্থ সেনাপতি আছে আরো কয়েকজন। রাজফৌজের অর্ধেকটাই বেরিয়ে গেল সীমান্ত এলাকার উদ্দেশ্যে।

তাজউদ্দীনের পরিকল্পনা আগে থেকেই তৈরী ছিল। দুই দলে সে ভাগ করবে তার ফৌজকে। একদল একটু ছোট। এরা থাকবে জালালউদ্দীনকে কারাগার থেকে মুক্ত করার কাজে শাল্গী সেপাইদের সহায়তায়। আর একদল খুব বড়। এরা থাকবে আসল কাজে। রাজা গণেশকে হত্যা করার ও হামলা ঠেকানোর কাজে। সামরিক ঘাঁটি থেকে রাজ প্রাসাদে আগমন পথে রাজবাহিনীর গতি বিলম্বিত করার দায়িত্ব ভুলু খাঁর। গতকালই এই মর্মে খবর নিয়ে ভুলু খাঁর কাছে রওনা হয়েছে বিশেষ দূত।

কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে গেল তাজউদ্দীনের পরিকল্পনা। তার পরিকল্পনায় ছিল রাজ প্রাসাদেই গণেশকে গুপ্ত হত্যা করা হবে। কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় যখন এলো, তখন দেখা গেল, রাজা গণেশ রাজ প্রাসাদে নেই, আর ভুলু খাঁরও কোন সংবাদ নেই তখন পর্যন্ত।

ভুলু খাঁর কোন সংবাদ তখন থাকার কথাও নয়। তখন পর্যন্ত বার্তা বাহক ভুলু খাঁর পাত্তা লাগাতেই পারেনি। ভুলু খাঁ তখন সোনার গাঁয়ে শায়খদের নিয়ে ব্যস্ত। বার্তা বাহকের বার্তা তখন সবেমাত্র সোনার গাঁয়ের উপকণ্ঠে পৌছেছে।

এদিকে আবার রাজা গণেশের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার খবরটাই শুধু আছে, কিন্তু কোথায় গেল, কিভাবে গেল, কখন ফিরবে–এ সবের কোন মাথা মুন্ডুই নেই। অথচ এখনই



www.pathagar.com

আবার খরব যেটা এলো, সেটা আরো মারাত্মক। আজকেই জালালউদ্দীনের প্রাণদন্ড কার্যকর করা হবে। সেমর্মে আয়োজন সব প্রস্তুত। এই মাত্র এই পয়গাম পৌঁছে দিলো ভূতেশ্বর।

ক্ষণিকের তরে তাজউদ্দীন দিশেহারা হয়ে গেল। রাজা গণেশের ফায়সালা কিছু না হলেও জালালউদ্দীনকে এখনই কারাগার মুক্ত করা ছাড়া তাকে বাঁচাবার আর পথ নেই। কারাকক্ষে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে জালালউদ্দীনকে খুলে নিয়ে তাদের এখন রাজধানী থেকে বেরুতে হয় রাজা গণেশের উদ্দেশ্যে। পথে তাকে খতম করা সম্ভব হলে সুরাহা একটা হয়ে যাবে। আর তা না হলে, ভেস্তে যাবে সব আয়োজন। চূড়ান্ত ফয়সালাটা হাত থেকে বেরিয়ে ছিটকে যাবে অনেক যোজন দূরে।

তাজউদ্দীন যখন এই ভেবে অস্থির, ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে এল কেদারনাথ। সে এসে বললো–হুজুর, খবর পাওয়া গেছে। রাজা মহাশয় বেশী দূরে যাননি। রাজধানীর পাশেই কামার দীঘিতে একটা দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গেছেন। তাঁর ফেরার সময় হয়ে এলো।

তাজউদ্দীন উৎফুল্ল হয়ে বললো–এ্যাঁ! তাই নাকি? রাজার সাথে সেপাই আছে কত?

বেশী কিছু নয়। তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর সাথে নগরপাল পীতাম্বর ছোট্ট একটা বাহিনী নিয়ে আছেন।

রাজা কি হস্তি পৃষ্ঠে বেরিয়েছেন?

না হুজুর। তিনি পাল্‌কী নিয়ে বেরিয়েছেন। জনার্দন দেখেছে–সেপাই নিয়ে পীতাম্বর আগে আগে যাচ্ছেন, মাঝখানে রাজার পাল্‌কী, তার পেছেনে দেহরক্ষী বাহিনী।

কোন পথে গেছেন তাঁরা?

অবনীনাথ সান্যাল মহাশয়ের শিবতলার পথ দিয়ে গেছেন। ঐ পথেই ফিরবেন।

ঐ পথেই। তুমি কি করে জানলে?

আসার পথে মহারাজ শিবপূজা করে আসবেন যে। পূজোর আয়োজন নিয়ে জনার্দনেরা রাজার সাথেই বেরোয়। অন্যেরা সান্যালের ঐ শিব তলায় পূজোর আয়োজন করছে। ফাঁক পেয়ে জনার্দন ছুটে এসে খবরটা আমাকে দিয়েই ফের ছুটে গেছে শিব তলায়। পূজা সেরে তবেই এসে রাজা মহাশয় খাবেন। পূজোর সময়ের আর বেশী দেরী নেই।

তাজউদ্দীনের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো–বটে।

কেদারনাথ বললো–ঐ শিব তলার তিনপাশেই বন। এক পাশে অবনীনাথের বাড়ি। পথ ঐ বনের মধ্য দিয়েই।

লাফিয়ে উঠলো তাজউদ্দীন। বললো–উত্তম সুযোগ।

তাজউদ্দীন উঠে দাঁড়াতেই কেদারনাথ বললো–ঐ শিবতলার রাস্তা–পথ সবটুকুই কি জানা আছে হুজুরের?

তাজউদ্দীন বললো–না খুব একটা নেই। একদিনই তো যমুনার ডাকে গিয়েছি আমি ওদিকে। তাও আবার সাঁঝ ওয়াক্তে।

তবে?

চিন্তার কিছু নেই। খুঁজে নিতে কতক্ষণ।



www.pathagar.com

আমি যদি হুজুরের সাথে থাকি, অসুবিধা আছে?

কেন, অসুবিধা থাকবে কেন? বরং তাহলে তো খুব ভালই হয়।

কেদারনাথ বললো–আমি তৈয়ার হয়েই এসেছি হুজুর। আমি আপনার সাথেই থাকবো।

তাজউদ্দীন বললো–বেশ, এসো তাহলে–

অন্য একজন চর মারফত নওকর–নফর–শান্ত্রী–প্রহরীদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে কেদারনাথকে সাথে নিয়ে তাজউদ্দীন তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল ডেরায়। ডেরা তখন গমগম করছে বিপুল পরিমাণ সেপাই সৈন্যের অস্থির পদ চারণায়। মস্তবড় এক সেনা সমাবেশ। বিভিন্ন কাজের অজুহাতে বেরিয়ে রাজার ঘাঁটি থেকেও অনেক সেপাই এসে যোগ দিয়েছে তাজউদ্দীনের ঘাঁটিতে। সকাল থেকেই সবাই এসে প্রস্তুত হয়ে আছে। অধীর আগ্রহ নিয়ে তারা তাজউদ্দীনের আদেশের এন্তেজার করছে কিন্তু ভুলু খাঁর তখনও কোন খবর নেই।

ভুলু খাঁর অভাবে তাজউদ্দীন অনেক খানি দমে গেল। কিন্তু চিন্তা করার আর কোন অবকাশ নেই। তার এই এক বাহিনীকেই সামলাতে হবে দুই দিক।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করেই সে সমান দুই ভাগে ভাগ করলো তার বাহিনীকে। একভাগের দায়িত্ব হলো, জালালউদ্দীনকে মুক্ত করে মসনদে এনে বসানো। আর অন্য ভাগ নিয়ে সে নিজে যাবে গণেশের মোকাবেলায়। তার কয়েকজন সুদক্ষ সহকারীর ওপর বাহিনীর এই প্রথম অংশের দায়িত্ব অর্পণ করে তাজউদ্দীন বললো–এখনই তোমরা যথা সম্ভব সন্তর্পণে গিয়ে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী কুঞ্জবনে অবস্থান নিয়ে থাকো। এত লোক এক সঙ্গে এক দিক দিয়ে যাবে না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিক দিয়ে এখনই রওনা হও সেখানে। যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে কয়েকজন অশ্বারোহী সেপাই থাকছে আমার সাথে। যে মুহূর্তে রাজাকে আমরা আয়ত্বের মধ্যে পাবো, তখনই তারা সংবাদ নিয়ে ছুটে আসবে তোমাদের কাছে। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তোমরা সদলবলে ঘিরে ফেলবে রাজপ্রাসাদ আর কারাগার। জালালউদ্দীনকে মুক্ত করেই সুযোগ থাকলে তখনই তাকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে বাংলা মুলুকের সুলতান বলে ঘোষণা দেবে। বুঝেছো সব?

তাজউদ্দীনের সহকারীরা জবাব দিলো–জি উস্তাদ। খুব সুন্দর এ পরিকল্পনা। এর বাস্তবায়নে যথা সাধ্য সব কিছু করবো আমরা।

তাজউদ্দীন ফের বললো–এরই মধ্যে রাজার ফৌজ বেরিয়ে পড়বে নিশ্চয়ই। আমরা যতক্ষণ ফিরে না আসি, ততক্ষণ তাদের ঠেকিয়ে রাখার প্রাণপণ কোশেশ করবে তোমরা।

জি উস্তাদ, তাই হবে।

হুশিয়ার। আর কিছু না পারো, অন্তত জালালউদ্দীন সাহেবকে মুক্ত করে বের করে আনা চাইই।

সে জন্যে জান কবুল।

তাজউদ্দীন তখনই বেরিয়ে পড়লো দ্বিতীয় দল নিয়ে। কেদারনাথের পথ নির্দেশনায় শিবতলার নিকটবর্তী বনের মধ্যে ঐ বনের পথের দুই পার্শ্বে অবস্থান নিলো সসৈন্যে। আসার পথেই তাজউদ্দীন কয়েকজন গুপ্তচরকে রাজার খোঁজে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিল। একটু পরেই



www.pathagar.com

গুপ্তচরেরা ফিরে এসে জানালো, রাজার পালকী এই পথেই আসছে। আগে আছেন ফৌজ নিয়ে পীতাম্বর, মাঝখানে পাল্‌কী, দেহরক্ষী বাহিনী তার পেছনে।

শুনে কেদারনাথ বললো–যাবার সময়ও ঐ একই ভাবে গেছেন।

তাজউদ্দীন বললো বহুদর্শী লোক। আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাই তিনি নিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাই এ জিন্দেগীর শেষ ব্যবস্থা তাঁর।

কেদারনাথের চোখ দুটি দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। বললো–হ্যাঁ, হুজুর, হওয়াতেই হবে তাই।

তাজউদ্দীন এবার তার সেপাইদের তিন ভাগে ভাগ করলো। বড়–মাঝারী ছোট। বড় দলকে শিবতলার দিকে সামনে রেখে বললো–পীতাম্বর তার ফৌজ নিয়ে তোমাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর পেছন থেকে ঘিরে ফেলবে তাদের। তার যা সেপাই সংখ্যা তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী তোমরা। ওদের একজনও রেহাই পাওয়ার কথা নয়।

মাঝারী দলকে পাঠিয়ে দিলো অল্প একটু পেছনের দিকে। বললো–মহারাজের পাল্‌কী তোমাদের অতিক্রম করার সাথে সাথেই তোমরা সামনের দিক দিয়ে ঘিরে ফেলবে দেহরক্ষী সেপাইদের। পেছন দিকে তাড়িয়ে নিয়ে ফয়সালা করবে ওদের। ওদের সংখ্যাও তোমাদের চেয়ে অনেক কম। অসুবিধের কারণ কিছুই নেই।

ছোট দলে কেদারনাথ সহ দশ বার জন সেপাই নিয়ে দুইদলের মাঝখানে অবস্থান নিলো তাজউদ্দীন। তার লক্ষ্য–রাজার পাল্‌কী।

প্রস্তুতি নেয়া শেষ করে সবাইকে সে জানিয়ে দিলো তিন দলই হামলা করবে এক সাথে এবং ওদের দিলে আতংক পয়দা করার লক্ষ্যে সবাই এক সাথে আওয়াজ দেবে "তৌহিদ বেগ–জিন্দাবাদ"।

ঐ বনপথের দুইপার্শ্বে গাছপালার আড়ালে নিজ নিজ অবস্থানে প্রত্যেকেই তৈরী হয়ে রইলো। তৈরী রইলো বার্তা বাহক অশ্বারোহী সেপাই কয়জনও।

দেখতে দেখতে চলে এলো মহারাজের কাফেলা। পীতাম্বর তার ফৌজ নিয়ে আগে বেরিয়ে গেলেন। রাজা গণেশের পাল্‌কী তাজউদ্দীনের সামনে আসার সাথে সাথেই অরণ্য কম্পিত করে আওয়াজ উঠলো–"তৌহিদ বেগ–জিন্দাবাদ।"

মার মার কাট কাট রবে রাস্তার দুই পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাজউদ্দীনের সেপাইরা। হামলাকারীদের সংখ্যা দেখে পীতাম্বর সসৈন্যে সামনের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। পীতাম্বরের বাহিনীকে সামনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে ঘিরে ফেললো তাজউদ্দীনের সামনের দল। দেহরক্ষীদের পেছন দিকে তাড়িয়ে নিয়ে ঘিরে ফেললো পেছনের দল। রাজার পালকী ঘিরে ফেললো ঐ দশ বার জন সঙ্গী নিয়ে তাজউদ্দীন স্বয়ং।

তৌহিদবেগের নাম শুনেই রাজার ফৌজের মনোবল একেবারে শূণ্যের কোঠায় নেমে এলো। আগে পিছে সর্বত্রই তারা থর থর করে কাঁপতে লাগলো, আর মার খেয়ে মরতে লাগলো। পালকীর মধ্যে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন–প্রচন্ড প্রতাপশালী দনুজ মর্দন গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ী।



www.pathagar.com

তাজউদ্দীন তার দল নিয়ে পাল্‌কীর দিকে এগুতেই আঁতকে উঠে "ওরে-বাপ্‌রে!" বলে পাল্‌কী ফেলে দৌড় দিলো- পাল্‌কীর তামাম বাহকেরা। তাজউদ্দীনের নির্দেশে পাল্কী বাহকদের আঘাত করতে না গিয়ে পাল্কীটাকে গোলাকারে ঘিরে দাঁড়ালো সেপাইরা।

উপায়ান্তর না দেখে আতংকগ্রস্ত গণেশ পাল্‌কীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তলোয়ার হাতে। বাঁচার জন্যে লহমা কয়েক প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর বার্দ্ধক্যজনিত দুর্বল হাত থেকে মুহূর্তের মধ্যেই ছিট্‌কে গেল তলোয়ার। নিরস্ত্র হয়ে তিনি তখন এন্তার প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন এবং পলায়নের উদ্দেশ্যে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু চার দিকেই সেপাই মোতায়েন থাকায় এই ব্যূহ ভেদ করে তিনি কোন দিক দিয়েই বেরোনোর পথ পেলেন না। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো তাজউদ্দীনের ওপর। তাজউদ্দীনকে দেখেই তিনি দৌড়ে গেলেন তার কাছে এবং বিভ্রান্তের মতো বললেন-এই যে বাবা তাজউদ্দীন। তুমি এখানে আছো? বাঁচাও বাবা, তৌহিদবেগের সেপাইরা ঘিরে ফেলেছে আমাকে, তুমি আমাকে বাঁচাও।

তাজউদ্দীন কটাক্ষ করে বললো-কার সেপাই ঘিরে ফেলেছে আপনাকে?

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে রাজা গণেশ বললেন-তৌহিদ বেগের সেপাই। দোহাই বাবা, তৌহিদ বেগের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।

জবাবে তাজউদ্দীন ফের কটাক্ষ করে বললো-তৌহিদ বেগের হাত থেকে বাঁচতেই যদি চান, তাহলে আপনি তৌহিদ বেবগের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেন?

মানে?

মানে আমিই সেই তৌহিদ বেগ।

সেকি!!

যে তৌহিদ বেগের মাথার মূল্য লক্ষমুদ্রা ঘোষণা করেছেন আপনি, যার খোঁজে ঘুম ছিল না আপনাদের কারো চোখে, সেই তৌহিদ বেগ বরাবরই সামনেই ছিল আপনাদের এবং এখন একদম আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

অকল্পনীয় আতংকে লাফিয়ে উঠে রাজা গণেশ আর্তনাদ করে বললনে-ওরে বাপ্‌রে! সে কি! বাঁচাও- বাঁচাও-

তাজউদ্দীন ওরফে তৌহিদ বেগের সামনে থেকে পড়িমরি করে রাজা গণেশ ছুটে গেলেন অন্য দিকে এবং দিশেহারা অবস্থায় ছুটোছুটি করতে করতে সামনে পড়লেন কেদার নাথের।

হাতের খঞ্জর বাগিয়ে ধরে কেদারনাথ হুংকার দিয়ে উঠলো। বললো-শয়তান, আজ তোমাকে রক্ষে করে কে?

কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে মুখের দিকে তাকিয়েই রাজা গণেশ বজ্রাহতের মতো বললেন-কে? কেদারনাথ!

জবাবে কেদারনাথ বললো-হ্যাঁ, কেদারনাথ। তুমি তো ছিলে ভাতুড়িয়ার জমিদার। তিনগাছির কিশোরীনাথকে মনে পড়ে তোমার?

এ্যাঁ! কাকে?



www.pathagar.com

ঃ কিশোরী নাথ। ভাতুড়িয়ার পাশেরই এক গ্রাম তিনগাছি। আমি সেই কিশোরী নাথের ছেলে কেদার নাথ

বলেই কেদারনাথ তার হাতে ধরা খঞ্জরখানা আমূল বসিয়ে দিলো রাজা গণেশের উদরে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে গণেশের মাথর ওপর এক সাথে নেমে এলো কয়েক খানা তলোয়ার। বাংলা মুলুকের মুসলমান হুকুমাতের কুগ্রহ শ্রী গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ীর প্রাণহীন দেহ সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো বন বাদাড়ের আবর্জনায়।

পরবর্তীতে হিসেব মিলিয়ে দেখা গেল, যে মুহূর্তে শায়খ আনোয়ার সাহেবের রক্তে সিক্ত হলো সোনার গাঁয়ের মাটি, ঠিক ঐ মুহূর্তেই ইহজীবনের দেনা পাওনা শেষ হলো গণেশের।

## ২১

রাজা গণেশকে ঘেরাও করার এলান পাওয়ামাত্র তাজউদ্দীন ওরফে তৌহিদবেগের সহকারীরা সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজ প্রাসাদের ওপর। জালালউদ্দীনকে মুক্ত করে আনলো। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে এই কাজেই অনেক সময় ব্যয় করলো তারা। এছাড়া ঐ একই কারণে কয়েদ খানা, সদর ফটক, সামরিক ঘাঁটির নির্গমনপথ ইত্যাদি স্থানে সেপাই মোতায়েন করা নিয়েও স্থির সিদ্ধান্তের অভাবে সবাই এসে এক কয়েদ খানাতেই জমায়েত হলো। ফলে জালালউদ্দীনকে উদ্ধার করার পর তারা যখন মসনদের কথা ভাবতে গেল, তখন তারা দেখলো–মসনদ চুলোয় যাক, তাদের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্নই তখন প্রকট হয়ে উঠেছে। প্লাবনের বেগে প্রাসাদের দিকে ছুটে আসছে রাজা গণেশের তামাম ফৌজ। কিছু পরিমাণ সদর ফটকে পৌঁছে গেছে। বাদ বাকীরা আসছে। আর লহমা কয়েকের মধ্যেই সদর ফটক দুশমনদের হস্তগত হবে এবং জালালউদ্দীনকে নিয়ে বেরিয়ে আসার পথটাও রুদ্ধ হয়ে যাবে।

শিবতলার পূজারী আর অবনীনাথের লোকেরা বনের মধ্যে লড়াই শুরু হতে দেখেই দৌড়ে এসে সংবাদ দিলো রাজার ফৌজের ঘাঁটিতে। সংবাদ পেয়েই তড়িৎ বেগে তৈরী হলো রাজার ফৌজ। ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা গেল অবনীনাথের অরণ্যে। তামাম ফৌজ সংগে নিয়ে রাজা গণেশের সেনাপতিরা ক্ষণিকের মধ্যেই বেরিয়ে এলো ঘাঁটি থেকে। মহারাজকে উদ্ধার করার ইরাদায় প্রাসাদের এক পাশ দিয়ে ঘটনাস্থলে এগুতেই তারা দেখলো–অসংখ্য শত্রুসেনা ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ছে রাজ প্রাসাদে।



www.pathagar.com

কিছুক্ষণের মধ্যেই অরণ্য থেকে ফিরে এলো গোয়েন্দারা। তারা এসে বার্তা দিলো– মহারাজের জিন্দেগীর চরম ফয়সালা হয়ে গেছে। এখন প্রাসাদ আর মসনদ রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

শুনামাত্রই ঘুরে দাঁড়ালো রাজার বাহিনী। তারা দূরন্ত বেগে ছুটতে লাগলো রাজ প্রাসাদের দিকে। পথে কোথাও বাধা বিঘ্ন না ঘটায় তারা অবিলম্বে পৌঁছে গেল রাজ প্রাসাদের ফটকে।

সদর ফটকেই শুরু হলো সংঘর্ষ। তাজউদ্দীনের সহকারীদের কাজ তখন শুধু রাজার ফৌজকে ঠেকিয়ে রাখা নয়, জালালউদ্দীনকে জীবন্ত নিয়ে কোন মতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসা।

বেশ কয়েকজন সঙ্গীর কোরবানি দিয়ে তাজউদ্দীনের সেপাইরা জালালউদ্দীনকে নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো বটে, কিন্তু রাজার ফৌজকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। বিশাল আকার রাজার ফৌজ বিপুল বিক্রমে লড়ে রাজ প্রাসাদ মসনদ আর রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দখল করে নিলো।

তাজউদ্দীন যখন তার ফৌজ নিয়ে প্রাসাদের দিকে এলো, তখন সে দেখলো–তার সেপাইরা লড়তে লড়তে প্রাসাদ থেকে অনেক দূরে রাজধানীর এক প্রান্তের দিকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে। আর রাজা গণেশের বিপুল বাহিনী কৌশলগত স্থানগুলিতে অবস্থান নিয়ে তাজউদ্দীনের প্রাসাদের দিকে এগুনোর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। রাজার ফৌজের গতি যদি তাজউদ্দীনের সেপাইরা শুরুতেই পথের মধ্যে ব্যহত হরতে পারতো, অন্যকথায় এত অল্প সময়ের মধ্যে যদি রাজার ফৌজ রাজপ্রাসাদে হাজির হতে না পারতো, তাহলে ইতিমধ্যেই এসে যেতো তাজউদ্দীন এবং রাজার ফৌজ কোন স্থানেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারতোনা। নেতৃত্বের সামান্যতম বিচ্যুতির কারণে কামিয়াবীর তোরণ দ্বারে পৌঁছতে পৌঁছতে তাজউদ্দীনকে পেছন দিকে ছিটকে পড়তে হলো।

তাজউদ্দীন দেখলো রাজার ফৌজ এখন সম্পূর্ণ সংঘবদ্ধ আর তার নিজের ফৌজ বিচ্ছিন্ন। এক অংশ তার সাথে, অন্য অংশের অধিকাংশটাই লড়তে লড়তে ছিটকে গেছে এদিক ওদিক। তাছাড়া তাদের পক্ষের শান্ত্রী–প্রহরী, দাস–দাসীরাও এখন নির্দিষ্ট ঠাঁই মঞ্জিলের অভাবে এতিমের মতো অসহায় ভাবে দৌড়ে বেড়াচ্ছে নানা দিকে। বিচ্ছিন্নভাবে এখন আর পন্ডশ্রম না করে সকলকে একত্র করাই সমুচিত বলে মনে করলো তাজউদ্দীন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তাজউদ্দীন তার বিচ্ছিন্ন তামাম লোকদের রাজধানীর এক প্রান্তে একত্রিত করলো। সেপাই সেনা, শান্ত্রী প্রহরী, দাস–দাসী সবাইকে খুঁজে খুঁজে আনা হলো। সকলেই আবার একত্রিত হওয়ায় এবং রাজা গণেশের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ায়, তার সেপাইদের ভেঙ্গে পড়া মনোবল ফিরে এলো আবার। আবার তাদের সখ হলো–রাজার ফৌজকে এখন এখানে পেলে হয়। কিন্তু রাজার ফৌজ রাজপ্রাসাদ আর মসনদটা আগলে নিয়ে গ্যাট হয়ে বসে রইলো। রাজপ্রাসাদ আর রাজধানী অরক্ষিত রেখে রাত্রির অন্ধকারে শত্রু খুঁজতে বেরোনোর মতো বেয়াকুফী করতে গেল না।



www.pathagar.com

বহুৎদিন পর মিলন ঘটলো দুইদোস্তের। তাজউদ্দীন জালালউদ্দীনকে খোশ আমদেদ জানালো। তাজউদ্দীনকে দেখেই জালালউদীন তাকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করতে করতে বললো–আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ যে, সবটুকু না হলেও আমার এবং দেশ আর জাতির জন্যে এতখানি করতে পেরেছেন আপনারা।

জালালউদ্দীন হঠাৎ ব্যতিব্যস্তভাবে বললো–তৌহিদ বেগ সাহেব যোগ দেননি আমাদের সাথে?

তাজউদ্দীন হেসে বললো–হ্যাঁ দিয়েছে।

কৈ, কোথায় তিনি?

সেই তো আপনাকে তাজউদ্দীনের আগে খোশ আমদেদ জানালো।

মানে!

আমিই সেই তৌহিদ বেগ।

আপনিই!

একথায় শুধু জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ আর অন্যেরাই নয়, তাজউদ্দীনের নিজের দলেরও অনেকে বিপুল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এদেরও অনেকেই অদ্যাবধি তৌহিদ বেগকে দেখেনি। তাজউদ্দীন ওরফে তৌহিদ বেগ বললো শুধু নিরাপত্তার কারণেই আমাকে এই লুকোচুরি খেলতে হয়েছে এযাবত।

রাজধানীর একপ্রান্তে বসে তারা যখন এই সব আলাপ আলোচনায় রত। তখন তাদের কানে এলো রাজপক্ষের ঘোষণা। তাদের লোক রাজধানীতে ঘুরে ঘুরে এইমর্মে এলান দিচ্ছে যে, মহারাজ গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ী শত্রুর হাতে নিহত হওয়ায় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রদেব এখন বাংলার মসনদে উঠে বসেছেন। তিনিই এখন এ রাজ্যের রাজা।

এই ঘোষণা কানে আসতেই তৌহিদ বেগের সেপাইদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিলো। রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ পুনরাক্রমণের খাহেশ তাদের দিলে জোরদার হয়ে উঠলো। জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহও এখন তলোয়ার টেনে নিলো এবং ঐ একই খাহেশ প্রকাশ করলো।

তৌহিদ বেগ থামিয়ে দিলো সবাইকে। বললো–না। এটা কোন যুক্তির কথাই নয়। রাজার ফৌজের বিপুল একটা অংশ এখন বাইরে আছে। রাজা গণেশের মৃত্যু সংবাদ ইতিমধ্যেই পৌঁছে যাবে সেখানে। এখন ফের এখানে গিয়ে লড়াই করতে নামা মানেই নিশ্চিন্তে এবং নির্বিঘ্নে তাদের রাজধানীতে ফিরে এসে একত্রিত হওয়ার মওকা করে দেয়া। এটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না। সমুদয় রাজশক্তি একত্র হয়ে দাঁড়ালে আবার আমাদের এক দীর্ঘ মেয়াদী আর রক্তক্ষয়ী জেহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। তাতে কামিয়াবীও আসবে কিনা তা বিলকুল অনিশ্চিত।

জালালউদ্দীন বললো–তাহলে আমরা এখন–

তৌহিদ বেগ বললো–আমরা এখন রাজশক্তির ঐ অংশটার মোকাবেলায় বেরোবো। ভুলু খাঁ সাহেব ইতিমধ্যেই এসে গেলেতো কথাই নেই। আমরা সরাসরি হামলা চালাবো তাদের ওপর। রাজ ফৌজের এ অংশটা আহত অথবা ধ্বংস করতে পারলে, রাজধানী দখল করা অনেকখানি সহজ হয়ে দাঁড়াবে।



www.pathagar.com

জালালউদ্দীন উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলো–বাহিনীর এ অংশের সাথে কোন কোন সালার আছে, আপনার তা জানা আছে কিছু?

কেদারনাথ লাফিয়ে উঠে বললো–হুজুর, আমি জানি। ওখানে একজন আপনার নিজের লোকই আছেন।

এতক্ষণে জালালউদ্দীন বিশেষভাবে নজর দিলো কেদারনাথের ওপর। সে কেদারনাথকে জড়িয়ে ধরে বললো–আরে কেদার কাকা, তুমি এখনও আছো আমাদের সাথে? আহা, তোমার কাছে আমার ঋণ এ জিন্দেগীতে শোধ করার মতো নয়।

কেদারনাথ খুশী হয়ে বললো –ঋণ কোথায় বাবা! সন্তান জ্ঞানে জেনেছি যাকে, তার জন্যে যেটুকু আমি পেরেছি, দিলের দরদেই করেছি। ঋণদেনার কোন ফাঁকই নেই এখানে বাবা।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে তৌহিদবেগ প্রশ্ন করলো–কি একটা কথা যেন বললে তুমি? রাজার ফৌজের ও অংশে উনার লোকই আছেন মানে?

জালালউদ্দীন খেই ধরে বললো–হ্যাঁ–হ্যাঁ, কে আছেন ওখানে?

কেদারনাথ বললো–প্রধান দায়িত্বে সেনাপতি শ্রীমাধব থাকলেও, রায় বাজ্যধর রায় তাঁর সাথে আছেন। শ্রীমাধবের পত্রেই রায় মহাশয় ঐ বাহিনীর কর্তা।

খুশীতে জালালউদ্দীন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললো–বলো কি! রায় রাজ্যধর কাকা আছেন ওখানে?তা–মানে–তিনি–

জালালউদ্দীন পরক্ষণেই নিরুৎসাহ হয়ে গেলো। বললো–মানে–আমার এই দুর্দিনে তিনি ওদের সাথে গেলেন।

জালালউদ্দীনের মনের কথা আঁচ করে কেদারনাথ বললো–তিনি তো ইচ্ছে করে যাননি, তাঁকে পাঠানো হয়েছে ওখানে।

মানে?

আপনাকে নিয়ে আপনার পিতার এ খেলা তিনি আগাগোড়াই সমর্থন করতে পারেননি। যদিও আর পাঁচজনের মতো তাজউদ্দীন হুজুরের এই পরিকল্পনার সাথে তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেননি, মানে করার সুযোগ পায়নি, তবু তাঁর সম্বন্ধে মহারাজ খানিক সন্দিহান ছিলেন আগাগোড়াই। আপনাকে কোতল করতে দেখে উনি যদি বিগড়ে যান, এ সন্দেহে এই সময় তাঁকে দূরে রাখার মতলবেই সেনাপতি শ্রীমাধবের সাথে তিনি জুড়ে দিয়েছেন তাঁকে।

আমার ব্যাপারে আগাগোড়াই চুপচাপই ছিলেন তিনি।

হ্যাঁ, তাই ছিলেন। কারণ সবার নজর তার ওপর বরাবরই সজাগ ছিল। যখন দেখলাম, একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেই সন্দেহ কেউ করছে না, তখন ভাবলাম, তাঁকে নিয়ে আর টানা হেঁচড়া করা ঠিক নয়। বরং এই ফাঁকে এগিয়ে যাক অন্যেরা।

আমার এই দোস্তকেও তাঁর কথা বলোনি?

না। ঐ একই কারণে বলিনি।

মা'শা আল্লাহ। চিন্তার কিছু নেই আর। রাজার মৃত্যু আর আমার মুক্তির খবর পেলে নিশ্চয়ই বাজ্যধর কাকা আর নীরব হয়ে থাকবেন না। চলুন তাহলে আমরা আমাদের পশ্চিম সীমান্তে



www.pathagar.com

আজ রাতেই রওনা হই। নিজে আমি রাজ্যধর কাকার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। দেখি, আমাকে উনি ফেলে দেন কি করে।

সাব্যস্ত হলো এখান থেকে এখনই তৌহিদ বেগ ওরফে তাজউদ্দীনের সাবেক ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে সেপাইদের কিঞ্চিৎ আহার বিশ্রামের অবকাশ দেয়া হবে এবং এরপর শেষরাতেই তারা রওনা হবে পশ্চিম সীমান্তের দিকে। বিলম্ব করে রাজার ফৌজকে রাজধানীতে ওয়াপস্ আসার অবকাশ দেয়া যাবে না।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক তখনই তারা ফিরে এলো তৌহিদ বেগের ডেরায়। আহার বিশ্রামের এক ফাঁকে কেদারনাথকে সামনে পেয়ে তৌহিদবেগ উৎসুকভাবে বললো–সময় অভাবে একটা প্রশ্ন করাই হয়নি তোমাকে। রাজা গণেশের বিরুদ্ধে তোমার যে এত আক্রোশ জমা ছিল আগে কিছুই আঁচ করতে পারিনি। ব্যাপারটা কি বলোতো?

কেদার নাথের দৃষ্টিতে স্থবিরতা নেমে এলো। কালো মেঘের ছায়া পড়লো তার কর্মদীপ্ত মুখমন্ডলে। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে সে ভারী গলায় বললো–সে অনেক কথা হুজুর। করুণ এক দিকদারীর ইতিহাস।

তবু সংক্ষেপে কিছু বলো। না শুনলে তো দিলে আমার এক মস্তবড় অতৃপ্তি থেকে যাবে।

কেদারনাথ শুরু করলো তার কাহিনী। বললো– হুজুর, সে অনেক দিনের কথা। আমার বয়স তখন এগারো কি বার বছর। রাজা গণেশ তখন ভাতুরিয়ার তরুণ জমিদার। আমাদের বাড়ি ছিল ভাতুরিয়ার পাশেই তিনগাছী গাঁয়ে। গণেশ ভাদুড়ী বরাবরই এক কুটিল দিলের লোক ছিলেন। তৎকালীন মুসলমান সুলতানের কাছে রাজা উপাধি পেয়ে ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করতে লাগলেন। তা দেখে তার নায়েব গোমস্তা–পেয়াদাদের বাড়টাও ভয়ানক বেড়ে গেল। আমাদের তিনগাছীতেই জমিদারের এক কাছারী বাড়ি ছিল। কাছারীর গোমস্তা নলিনী কান্ত ছিল লম্পট চরিত্রের লোক। আমাদের গাঁয়ের, আমাদের পাড়ারই এক অসহায় বৃদ্ধার সুন্দরী এক বিধবা মেয়ের ওপর নজর পড়ে তার। ফুসলিয়ে না পেরে, পাইক পেয়াদা এনে নলিনী কান্ত মেয়েটাকে জোর করেই টেনে নিয়ে যেতে লাগে। মেয়ের বৃদ্ধা মা এসে বাধা দিতে লাগলে নলিনীকান্ত তাকে এমন জোরে লাথি মারে যে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে বৃদ্ধার।

মেয়েটির চীৎকারে পাড়ার লোক ছুটে যায়। আমার বাবা কিশোরী নাথ ছিলেন আমাদের পাড়ার মাতবর। তিনিও সেখানে ছুটে আসেন। মেয়েটাকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করা হলে নলিনী আরো ক্ষেপে যায় এবং পাইক পেয়াদার সাথে নিজেও গিয়ে মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে সজোরে টানতে থাকে। পাড়ার লোক এতটা আর সহ্য করতে পারে না। আমার পিতার হুকুম নিয়ে মেয়েটাকে খুলে আনতে গেলে, গোমস্তার পাইক পেয়াদা সবাই এসে এক জোটে চড়াও হয় এই লোকজনদের ওপর। শুরু হয় মারামারি আর দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় আহত হলো গ্রামবাসীরা অনেকেই এবং নিহত হলেন নলিনীর এক পেয়াদা।

কেদারনাথ একটু থামলো। তারপর ফের বললো–নলিনীর মুখে ঝাল খেয়ে বরকন্দাজ বাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন গণেশ ভাদুড়ী। জমিদারের লোককে খুন করে এতবড় স্পর্দ্ধা। জ্বালিয়ে দাও তিনগাছী গ্রাম। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো তিন গাছী। গ্রামবাসীরা জমিদারকে আসল



www.pathagar.com

ঘটনা বুঝানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত না করে গণেশ ভাদুড়ী গ্রামবাসীদের ধরে নির্মমভাবে মারধোর ও মেয়ে মানুষদের বেইযযত করতে লাগলো।

কেদারনাথ আবার থামলো। দম নিয়ে বললো–হুকুম দেয়ার অপরাধে রাজা গণেশের লোকেরা আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে আগেই। এরপর রাজা গণেশ নিজে এসে আমার বাবাকে ঘর থেকে টেনে বের করে এবং তাঁকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বর্শার ফলায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের উঠোনেই নির্মমভাবে হত্যা করে। বাবার উদ্ধারে আমার মা ছুটে এসে গণেশের পায়ের ওপর পড়লে তারও উদরে বর্শা দিয়ে আঘাত করে গণেশ। আর্তনাত করে উঠে আমার মাও পড়ে গেলেন উঠোনে। কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করে তিনিও মারা গেলেন তখনই।

এরপর একেবারেই নীরব হলো কেদারনাথ। তার কণ্ঠ তখন একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাকে আশ্বস্ত হওয়ার সময় দিয়ে তৌহিদবেগও নীরব রইলো কিছুক্ষণ। এরপর ফের বললো–তারপর?

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে কেদারনাথ আবার বলতে শুরু করলো –আমি আমার মাতা পিতার একমাত্র সন্তান। আড়াল থেকে নিজ চোখে পিতা মাতার এই নির্মম হত্যা দেখে উম্মাদ হয়ে গেলাম। আমার মনের মধ্যে এক দুর্বার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। প্রতিজ্ঞা করে বসলাম–যে ভাবেই হোক, এর প্রতিশোধ আমি নেবোই। বাড়ি আমাদের পুড়তে লাগলো। সেই যে আমি বেরিয়ে এলাম আমাদের ঘরের পাশের কলাঝাড় থেকে, আর বাড়িতে যাইনি।

তারপর?

সহায় সম্বল হীন এক অসহায় বালক আমি। আমার কি সাধ্য জমিদারকে আঘাত করি। বছর দুয়েক এখানে ওখানে কাটলো। তারপর একদিন শুনলাম গণেশ ভাদুড়ী পান্ডুয়ার শাহীদরবারে উমরাহ হয়ে ঢুকেছে। খেয়ালের বশে আমিও চলে এলাম পান্ডুয়ায়। কয়েকদিন অনর্থক এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লাম। প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, আমার নিজের জানটা বাঁচানোই তখন দুরূহ হয়ে পড়লো। আমি আশ্রয় খুঁজতে লাগলাম। করুণাময়ের কৃপায় আশ্রয়টাও শিগগিরই পেয়ে গেলাম। পান্ডুয়ার সুলতানের এক হিন্দুমালী আমাকে অনাহারে ধুঁকতে দেখে দয়া করে তাঁর নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং ত্রিভুবণে আমার কেউ নেই জেনে শাহীমহলের মালীর একজন সহকারী হিসাবে আমার একটা নকরীও জুটিয়ে দেন তিনি।

আবার একটু থামার পর কেদারনাথ ফের বললো–সেই থেকে আমি শাহী ভবনেই রয়ে গেলাম। এরপর শাহী ভবন রাজ প্রাসাদের রূপ নিলো। সুলতানের মসনদে গণেশ ভাদুড়ী রাজা হয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও পদোন্নতি হলো। ক্রমে ক্রমে রাজপ্রাসাদের খাশ বান্দার পদে এসে উপনীত হলাম। থাকতে লাগলাম গণেশ ভাদুড়ীর পাশে পাশেই।

তৌহিদবেগ এবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো–সেকি। এতদিন পাশে থেকেও করতে পারোনি কিছু?



www.pathagar.com

কেদারনাথ বললো–কি করে পারবো হুজুর। আমি একা লোক। মামুলী এক বান্দা। সুযোগের মতো সুযোগ না পেলে রাজার গায়ে হাত দিয়ে খামোকা নিজের জানটাও দেবো? একমাত্র বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু আমার জিদ, পারলে নিজের হাতে আঘাত হেনে মনের জ্বালা মেটাবো, না পারলে ভগবানের হাতেই দিয়ে রাখবো এর বিচার। ভগবান আমার সে আশা পূরণ করলেন এতদিনে।

কেদারনাথের কাহিনী শেষ হতেই অনেক রাত গড়িয়ে গেল। ওখানেই একটু গড়িয়ে নিয়ে পুনরুদ্দমে খাড়া হলো তৌহিদবেগ। সবাইকে জাগিয়ে নিয়ে ওখানেই জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহকে বাংলা মুলুকের সুলতান বলে ঘোষণা দিয়ে তারা সদল বলে সীমান্তের দিকে রওনা হলো।

রাজা গণেশের মৃত্যু আর জালালউদ্দীনের মুক্তির পয়গাম বায়ুর বেগে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। সেই সাথে এখবরও ছড়িয়ে পড়লো যে, মহেন্দ্র দেবের পাশাপাশি জালালউদ্দীনও নিজেকে বাংলার সুলতান রূপে ঘোষণা দিয়ে তৌহিদবেগের নেতৃত্বে মসনদ পুনরুদ্ধারের জেহাদে এখন লিপ্ত।

এতে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। পরের দিন সকাল থেকেই তৌহিদবেগের কাফেলার সাথে চারদিক থেকে সেপাই এসে সামিল হতে লাগলো। বাংলা মুলুকের চাকুরীচ্যুত অগণিত মুসলমান সেপাইদের কয়জন মাত্র তৌহিদ বেগ আর ভুলু খাঁর অধীনে গুপ্ত লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। বাদবাকী অসংখ্য সেপাই, সেরেফই একটা পণ্ডশ্রম মনে করে, এই গুপ্ত লড়াইয়ে যোগ না দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। রাজা গণেশের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা আশার আলো দেখতে পেলো এবং সংগে সংগে পুনরায় হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়ে তৌহিদবেগের বাহিনীর সাথে সামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগলো। ছুটে এলো বাংলার যত জঙ্গী আলেম উলেমা আর মুসল্লীরা। রাজার ফৌজে তখনও মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুসলমান সেপাই অবশিষ্ট ছিল, নানা দিক দিয়ে পালিয়ে এসে তৌহিদবেগের বাহিনীর সাথে সামিল হলো তারাও। সামিল হলো রাজবাহিনীর অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু সেপাই সেনারাও।

ফলশ্রুতিতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই তৌহিদবেগের অধীনে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্‌র বাহিনী বিশাল আকার ধারণ করলো। এর ওপর আবার সাঁঝের মধ্যে ভুলু খাঁ তার তামাম সেপাই নিয়ে এসে এদের সাথে সামিল হলো। ফলে শুধু আকারেই বিশাল নয়, জালালউদ্দীনের বাহিনী এখন এক দুর্জেয় বাহিনীতে পরিণত হলো।

রাজা গণেশের মৃত্যু সংবাদ সীমান্তেও পৌঁছেছিল। সংবাদ শুনে রায় রাজ্যধর রায় রাজধানীতে ফেরার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু শ্রীমাধব নীরব হয়ে রইলেন। রাজধানীর প্রকৃত অবস্থা যাচাই না করে তিনি এগুনোর সাহস করলেন না। চর পাঠিয়ে দিয়ে বসেই রইলেন চুপচাপ। তার যুক্তি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে তিনি বিপদে পড়তে চাননা। গণেশের মৃত্যু, জালালউদ্দীনের মুক্তি, তৌহিদবেগের আবির্ভাব সব কিছু এক সাথে মিলে তাঁর মানস চোখে এক ভয়ংকর অবস্থার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতে লাগলো।



www.pathagar.com

কিন্তু রাজধানী, রাজপ্রাসাদ, মসনদ–সব কিছু ফেলে তৌহিদবেগের অধীনে জালালউদ্দীনের বাহিনী যে সীমান্তে ছুটে আসবে, শ্রীমাধব এটা কল্পনাও করেননি। পরেরদিন ফজরেই যখন জালালউদ্দীনের বাহিনী এসে তাদের অবস্থান থেকে আধাক্রোশ দূরে তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে ছাউনি ফেলে বসলো, তখন শ্রীমাধব কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি রায় রাজ্যধরকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। বার্তা বাহকের মুখে জালালউদ্দীন যদু এই কাফেলার সাথেই আছে শুনে রায় রাজ্যধর রায় তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি এসে শ্রীমাধবকে সরাসরি বললেন–ভূতপূর্ব সুলতান জালালউদ্দীনই যখন আমাদের সামনে উপস্থিত, তখন তো চিন্তার কিছুই নেই। তার সাথেই এখন আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করা উচিত।

শুনে শ্রীমাধব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন–আমাদের স্বজাতি মহেন্দ্রদেবকে ত্যাগ করে একজন মুসলমানকে সুলতান বলে মেনে নিতে বলেন আপনি?

রাজ্যধর রায় বললেন–তাকেই তো আমরা অবনত মস্তকে সুলতান বলে মেনে নিয়েছি একদিন। মহারাজের অভাবে এ মসনদ তাকেই তো ফেরত দেয়ার কথাও ছিল। কাজেই ন্যায়ত ধর্মত এ মসনদ জালালউদ্দীনেরই প্রাপ্য।

গর্জে উঠলেন শ্রীমাধব। বললেন–খবরদার রায় বাবু। বেকায়দায় পড়ে যা একদিন করতে হয়েছে আমাদের, সেইটেকেই স্থায়ী বলে মেনে নেবো আমরা?

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আর বেঈমানী না করা মানুষেরই ধর্ম। আমাদের আচরণ আর আক্কেলগুণে যে অধিকার আমরা হারিয়ে ফেলেছি বিলকুল, জোর করে সে অধিকার বজায় রাখা যাবে না।

জোর যার মুল্লুক তার। জোর করেই বাংলাদেশের প্রভুত্ব মুঠোর মধ্যে রাখবো আমরা। যবনদের কিছুতেই মাথা তুলতে দেবোনা। আপনি বাহিনী প্রস্তুত করুন।

রায় রাজ্যধর রায় শক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন–না। শ্রীমাধব তাজ্জব হয়ে বললেন–মানে।

এক মুখে দুই কথা বলা আর অন্যায় পথে ব্যর্থ চেষ্টা করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

ব্যর্থ চেষ্টা!

একেবারেই ব্যর্থ চেষ্টা। প্রকৃতির গতি রোধ করার সাধ্য কারো নেই। আমি হিন্দু। আমারও কি সাধ হয়না দেশের সিংহাসনে হিন্দু রাজাই থাক? কিন্তু আমাদের মাত্রাহীন বাড়াবাড়ির কারণে, সারাদেশে যে প্রতিকূল ঝড়ের সৃষ্টি আমরা করেছি, তাতে পরিস্থিতি এখন আমাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ঐ যে বললেন, জোর যার মুল্লুক তার? আপনি আমি না চাইলেও এ মুল্লুক তাদেরই হবে, যার জোর এখন বেশী। আমাদের আর হবে না।

হবে না?

না। আমাদের এই মরা দেহে শত চেষ্টা করলেও আর প্রাণ সঞ্চার করতে আমরা পারবো না। বাতাস আর আমাদের পালে নেই।

রায় বাবু!



www.pathagar.com

তা ছাড়া, জালালউদ্দীন যদু আমার একান্ত স্নেহ ভাজন। তাকে আমি আজীবন পুত্রবৎ জেনেছি। অন্যায় ভাবে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিবেককে আমি একেবারেই বেচে খেতে পারবো না।

পুনরায় গর্জে উঠলেন শ্রীমাধব। বললেন–হুশিয়ার রায় রাজ্যধর রায়। আবার আপনাকে আদেশ দিচ্ছি–বাহিনী প্রস্তুত করুন।

রাজ্যধর রায়ও দীপ্তকণ্ঠে বললেন – যেদিন আপনারা অন্যায় ভাবে জালালউদ্দীনকে কারারুদ্ধ করলেন, সেদিন আমি নীরব থেকেছি। তাকে উদ্ধার করার কোন প্রক্রিয়াতেও সামিল হতে যাইনি। ভাবলাম, থাকে হিন্দুশাসন থাক। কিন্তু এমনই এক অবাস্তব নেশায় মেতে উঠলেন আপনারা, একটা জাতিকে হত্যা করেই নির্মূল করতে চাইলেন–যা নিতান্তই এক প্রচন্ড বাতুলতা। আর তার ফলে হিন্দু শাসনের স্থায়িত্ব পদ্মপত্রনীর বৎ অনিশ্চিত হতে দেখেও আমি উচ্চবাচ্য করিনি, একি যথেষ্ট নয়? যে আমার স্নেহভাজন। যে সৎ, যে ন্যায়নিষ্ঠ, সর্বোপরি, যার দাবী ন্যায্য তার উপকারে তো গেলামই না, উল্টা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রনিয়ে দাঁড়াবো আমি– এতবড় পাষন্ড আমাকে ভাবতে পারেন কি করে? আমি জালালউদ্দীনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তার সাথে সামিল হতে চললাম এবং আপনাকেও এই আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলাম।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন রাজ্যধর রায়। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শ্রীমাধব লাফিয়ে উঠে তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন–সে সুযোগ তুমি এ জীবনে পাবে না।

শ্রীমাধব ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজ্যধরের ওপর। রাজ্যধর রায়ও তরবারি বের করে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাদের গোটা বাহিনীটাই দুই দলে ভাগ হয়ে দুইজনের পক্ষে তুমুল এক আত্মঘাতি লড়াইয়ে লিপ্ত হলো।

রায় রাজ্যধর রায়ের এক বিশ্বস্ত সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে জালালউদ্দীনের শিবিরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। আধা ক্রোশ পথ মাত্র। ক্ষণিকের মধ্যেই সে জালালউদ্দীনের শিবিরে এসে হাজির হলো এবং জালালউদ্দীন ও তৌহিদ বেগের সামনে ঘটনাটি পেশ করলো।

জ্বলে উঠলো দাবানল। বাঘের মতো গর্জে উঠলো–তৌহিদ বেগ, ভুলু খাঁ, জালালউদ্দীন ও অন্যান্য সেনাপতিরা। নিজ নিজ ফৌজ নিয়ে তারা তৎক্ষণাৎ হাজির হলো শ্রীমাধবের শিবিরে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে তারা শ্রীমাধবকে বন্দী এবং হত্যা করলেন। শ্রীমাধবের পতন ঘটার সাথে সাথেই তাঁর সমর্থনকারী সেপাইরা জালালউদ্দীনের আনুগত্য স্বীকার করে সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহর নামে পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি দিতে লাগলো। জালালউদ্দীনকে সামনে পেয়ে রায় রাজ্যধর রায় তাকে জড়িয়ে ধরলেন আবেগে।

জালাল উদ্দীনের শক্তি এখন তামাম দ্বিধা দ্বন্দ্বের অতীত। মসনদ দখল করা এখন তাঁর পক্ষে আর দুরূহ কিছুই নয়। কিন্তু একটানা দীর্ঘ পরিশ্রমে তার সেনাপতি ও সেপাইরা অত্যন্ত ক্লান্ত তখন। এদের বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন। এ ছাড়া কৌশলগত দিকও একটু আছে। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই তার সেপাই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাইরে থেকে তো আসছেই। আসছে রাজপ্রাসাদ থেকেও। অন্যকথায়, জালালউদ্দীনের সেপাই যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মহেন্দ্র দেবের পক্ষ



www.pathagar.com

ত্যাগ করে জালালউদ্দীনের পক্ষে যোগ দেয়ার প্রবণতা রাজফৌজের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই।

তাই, তখনই তারা সরাসরি রাজধানীর দিকে না গিয়ে ছাউনী তুলে সদল বলে চলে এলো সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলমের খানকা শরীফে। জালালউদ্দীন সহকারে নেতৃস্থানীয় সকলেই এসে সুফী সাহেবের কদমবুসি করলো। পুত্রহারা দরবেশ তাদের প্রশান্ত দিলে দোওয়া খায়ের করলেন। বাংলা মুলুকের মুসলমানদের কায়েমী নাজাতি আর দূরে নয়। নূরানী আভায় সুফী সাহেবের চোখ মুখ জ্বল জ্বল করতে লাগলো।

অতপর তৌহিদবেগের পরামর্শক্রমে খানকা শরীফের পাশেই এক মুক্ত প্রান্তরে ছাউনি পড়লো জালালউদ্দীনের। এই বিপুল সংখ্যক লোক লস্কর কয়েক দিনের জন্যে এখানেই বিরামের ইন্তিজাম করে নিলো। তৌহিদবেগের মতোই সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে ভুলু খাঁর বাহালুল খাঁ পরিচয় সবার মধ্যে প্রকাশ পেলো এখানেই।

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যেই আরো অনেক সেপাই এসে শামিল হলো জালালউদ্দীনের ফৌজের সাথে। বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে তৌহিদবেগ আর বাহালুল খাঁ তালিম দিয়ে দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন সেপাইদের সুসংগঠিত ও দক্ষ করে তুললো।

এবার সবার দৃষ্টি রাজধানীর ওপর নিবদ্ধ হলো। জালালউদ্দীনের এজাযত নিয়ে তৌহিদ বেগ ছাউনী তোলার আওয়াজ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল সারি সারি ছাউনী। সামরিক বেসামরিক লোক লস্কর ও বেশুমার নওকর-নফর-সহযোগীদের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল আকার কাফেলা প্রমত্ত বেগে এগিয়ে চললো রাজধানী অভিমুখে। মুক্ত মাঠের মধ্যে দিয়ে ধাবমান এই কাফেলা ধূলিধুসর কাফনে ঢেকে ফেললো দিগন্ত।

রাজধানীর একেবারেই উপকণ্ঠে এসে আবার পড়লো জালালউদ্দীনের সারি সারি ছাউনি। এত নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিরোধ আসতে না দেখে, কারো আন্দাজ করতে তকলিফ পেতে হলো না যে, মহেন্দ্র দেবের শক্তি বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে ইতিমধ্যেই। বেসামরিক লোকদের ছাউনির মধ্যে রেখে তৌহিদবেগের নেতৃত্বে জালালউদ্দীনের বাহিনী অগ্রসর হয়েই বুঝলো-অনুমান তাদের মিথ্যে নয়। তাদের এই বিশাল বাহিনী রাজধানীতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই রাজার ফৌজের অধিক অংশই প্রাণভয়ে এসে তৎক্ষণাৎই আনুগত্য স্বীকার করলো। আর বাকী অংশ দুর্বল এক প্রতিরোধ গড়ে তুলে ক্ষণকালের মধ্যেই মহেন্দ্রদেব সহকারে রাজ প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে চির নিদ্রায় শায়িত হলো।

মুক্ত হলো জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহর তামাম বিপত্তি। বিপুল উল্লাস আর আনন্দধ্বনির মধ্য দিয়ে জালালউদ্দীন যদু সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ খলীফাতুল্লাহ্ নাম ধারণ করে পান্ডুয়ার মসনদে উঠে বসলেন আবার।



www.pathagar.com

# ২২

বাংলা মুলুকে পুনরায় ফিরে এলো শান্তি। নিশ্চিত হলো বাংলা মুলুকের মুসলমানদের হেফাজতি। সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের পাক মুখের এ উক্তিও মিথ্যা প্রমাণ হলো না। জালালউদ্দীন যদুর মাধ্যেমেই বাংলা মুলুকে মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। বাংলার মুসলমানদের নিরাপত্তাও সুদৃঢ় হলো সেই সুবাদে। ইসলামের বিধানগুলি রাজ্যময় নতুন ভাবে প্রবর্তিত হলো এবং মুসলিম আইনের পবিত্র ধারাগুলিও চালু হলো পুনরায়।

জালালউদ্দীনের তখ্‌তে বসার পরপরই ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা রাজপ্রাসাদ, রাজবাহিনী আর রাজকর্মচারীদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলো। দেশের অন্যত্রও এমনই এক মানসিকতা পরিলক্ষিত হলো। এটা লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে জালালউদ্দীন ঘোষণা দিয়ে দিলো যে, স্বেচ্ছায় কেউ ইসলাম কবুল করলে তার কিছু বলার নেই। কিন্তু ভয়ে বা চাপে পড়ে কোন ব্যক্তিরই ইসলাম গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কোথাও কোন চাপ সৃষ্টি হলে সুলতানকে তা সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করতে হবে। সে ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা সুলতান নিজে গ্রহণ করবে। হিন্দু মুসলিম সকল প্রজাকে সকল প্রকারে হেফাজত করা সুলতানেরই দায়িত্ব।

সুলতানের এ ঘোষণায় হিন্দু মুসলিম সকল শ্রেণীর প্রজার মধ্যে মজবুত হলো শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত।

মসনদ দখলের পর থেকেই অত্যন্ত ব্যস্ত আছে জালালউদ্দীন। সর্বত্র নিজের দখল প্রতিষ্ঠা ও শাসনযন্ত্র পুনর্বিন্যাসে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে তাকে যে, কোন আত্মীয় স্বজন বা আপনজনদের দিকে সে নজর দেয়ার ফুরসুতই কিছু পায়নি। এরই মধ্যে এক সময় জালালউদ্দীনের সামনে এসে দাঁড়ালো কেদারনাথ। বললো-হুজুর, দিদিমণি সালাম জানিয়েছেন আপনাকে।

কাজ থেকে মাথা তুলে হতভম্বের মতো জালালউদ্দীন প্রশ্ন করলো-দিদিমণি! কোন দিদিমণি?

কেদার নাথ বললো-যমুনা দিদি মণি।

যমুনা।

জালালউদ্দীন হকচকিয়ে গেল। নিজেকে তার অকস্মাৎ অপরাধী বলে মনে হলো। কারারুদ্ধ থাকা কালে সে প্রতিদিনই খোঁজ নিয়েছে যমুনার। যমুনাতো নিয়েছেই। কারা মুক্তির পর থেকে সে এক এমন আবর্তে পতিত হয় যে, যমুনার কথা দু' একবার তার দিলে উদয় হলেও, যমুনার খোঁজ নেয়ার তিল পরিমাণ অবকাশ তার ছিল না। সুফী সাহেবের খানকার পাশে শিবিরে বসে তৌহিদবেগ যমুনার বিয়ের গল্পটা করেছিল। মসনদে বসার পর একবার তার যমুনার কথা



www.pathagar.com

খেয়াল হয়েছে এবং মোহন চাঁদের কাছে–যমুনা প্রিত্রালয়েই আছে এবং আপাতত কুশলেই আছে–এটুকু সংবাদ নিতেই এক নয়া ঝামেলা এসে পড়ায় তাকে সেইদিকেই নজর ফেরাতে হয়েছে, যমুনার আর খবর নেয়ার আদৌ ফুরসুৎ পায়নি। কেদারনাথের মুখে যমুনার নাম শুনে জালালউদ্দীন ব্যস্ত হয় উঠলো। ব্যস্তকণ্ঠে বললো–যমুনা। কোথায় সে? কেমন আছে? কোথা থেকে সালাম দিয়েছে আমকে?

কেদারনাথ বললো–জি, অন্দর মহলের বাগিচার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন উনি।

কিছু সভাসদদের সাথে কাগজ পত্র নিয়ে সে ব্যস্ত ছিল তখন। সভাসদদের উদ্দেশ্যে–'আমাকে মাফ করবেন আমি একটু আসি'–বলে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল জালালউদ্দীন।

জালালউদ্দীনের কারামুক্তির পর থেকেই যমুনা সান্যালের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। যদু নারায়ণ জালাল হওয়ার পর থেকেই সে কোন সময় খুব একটা স্বস্তির মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই কারা মুক্তির সাথে সাথেই তার অবস্থা হয় অত্যন্ত শোচনীয়। অনেক আগে থেকেই সে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল বলে তাকে সন্দেহ করে অনেকে এবং সে কারণে তাকে সীমাহীন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। অবনীনাথের মেয়ে না হলে হয়তো মহেন্দ্রদেবের ফৌজের হাতে মরতে হতো তাকে। কিন্তু মরতে তাকে না হলেও, খোদ অবনীনাথ সান্যালই নানারকম গঞ্জনা ও নির্যাতনে তার জীবন বিষময় করে তোলে। গঞ্জনা সইতে না পেরে যমুনার এক সময় –বাড়ি থেকে পালিয়ে জালালউদ্দীনের দলের সাথে যোগ দেয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু দলটির অবস্থান নির্ণয় করতে করতেই জালালউদ্দীনের কাফেলা রাজধানী থেকে বেরিয়ে যমুনা সান্যালের নাগালের অনেক দূরে চলে যায়। আজ আর সে যাতনা নেই তার। কিন্তু পরিস্থিতির এই পরিবর্তন না ঘটলে, যমুনার এ দুর্ভোগ শেষ হতোনা আমৃত্যু।

বাগিচার পাশে গিয়ে যমুনাকে দেখেই চমকে উঠলো জালালউদ্দীন। যেন চামড়া দিয়ে ঢাকা কয়েক খানা হাড়ের একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। জালালউদ্দীন বিহবল কণ্ঠে বললো–যমুনা।

নতমস্তকে যমুনা সান্যাল ক্ষীণকণ্ঠে বললো–আমাদের প্রতি জনাবের কি আদেশ তাই জানতে এসেছি আমি।

জালালউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো–তোমাদের প্রতি আদেশ মানে!

আমার বাপ আমাকে তাই জানতেই পাঠিয়েছেন।

তোমার বাপ তোমাকে পাঠিয়েছেন?

জি, হাঁ।

তুমি নিজের ইচ্ছায় আসোনি?

জিনা।

কারণ?

আমার নিজের আর এখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

কোন প্রয়োজনই নেই তোমার?

কি আর থাকবে বলুন?



www.pathagar.com

যমুনার কথার ধরনে জালালউদ্দীন তাজ্জব বনে গেল। সে আহত কণ্ঠে বললো–যমুনা!

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে যমুনা সান্যাল বললো–আপনি ভরসা দিলে, আমার বাবা কিছু কথা বলবেন আপনার সঙ্গে।

তোমার কোন কথা নেই?

জিনা।

আশ্চর্য! কোথায় তোমার বাবা?

বাড়িতেই আছেন তিনি। এ কয়দিন ঘর থেকে একবারও বেরোননি।

কেন?

সেটা তিনিই ভাল জানেন। হয়তো কিছুটা ভয়ে!

ভয়ে? কেন ভয় কিসের?

আপনার সাথে তাঁর অতীত আচরণ তো এত সত্বর ভোলার মত নয়।

চলো, আমিই যাবো তোমাদের বাড়িতে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ যমুনার রুগ্ন শরীরে তখন কাঁপুনী ধরে গিয়েছিল। সে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললো–আপনি যাবেন আমাদের বাড়িতে?

আবার তাজ্জব হলো জালালউদ্দীন। আহতও হলো আবার। জিজ্ঞাসু নেত্রে বললো মানে!

আপনি বাংলা মুলুকের সুলতান। আপনার কাছে এতটা কেউ আশা করতে পারে?

কেউ না পারুক, তুমি পারো না?

যমুনার বুকে তখন পুঞ্জিভূত অভিমান। এখন সে প্রায় মৃত্যু পথ যাত্রী। গঞ্জনায় লাঞ্ছনায় কি হা'ল হয়েছে তার, মসনদে বসার পরে আর তার খোঁজই নেয়নি জালালউদ্দীন। নওকর নফর দাসদাসী কারো মারফতই নয়। ইতিমধ্যেই সে খুন হয়ে গেলেও হয়তো আর কিছুই এসে যেতোনা জালালউদ্দীনের। তাই সে অভিমান ভরেই জবাব দিলো–জি, না।

জালালউদ্দীনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। সে বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে বললো–যমুনা!

ধমক খেয়ে যমুনা একটু চমকে উঠলো। তারপরই সে আস্তে আস্তে টলে পড়তে লাগলো।

তা লক্ষ্য করেই জালালউদ্দীন জাপ্‌টে ধরলো যমুনাকে। যমুনা সান্যাল সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল।

জালালউদ্দীনের হাঁক ডাকে কয়েকজন দাসদাসী ছুটে এলো। বাতাস আর পানির ঝাপ্‌টা দেয়ার ফলে খানিকটা সুস্থ বোধ করলেও যমুনা শুধু কাঁপতেই লাগলো থর থর করে। তার আর দাঁড়ানোর সাধ্য রইলো না।

অগত্যা তাকে তুলে নিয়ে জালালউদ্দীন শাহীমহলের এক কামরায় এনে শুইয়ে দিলো এবং কয়েকজন মহিলাকে তার খেদমতে নিয়োগ করে হেকিম ডাকতে লোক পাঠালো।

মহল থেকে বেরিয়ে এসেই জালালউদ্দীন তলব দিলো অবনীনাথকে। অবনীনাথ এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালে জালালউদ্দীন কোন ভূমিকা না করে সরাসরি প্রশ্ন করলো–যমুনা যে অসুস্থ তা আপনি জানতেন?

অবনীনাথ নতমস্তকে বললেন জি, জানতাম।



www.pathagar.com

খুবই সে অসুস্থ সেটা?

জি, তাও জানতাম। ইদানিং সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

তা জেনেও আপনি তাকে কেন আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন?

তাকে স্বচোখে দেখে জনাবের দিলে যদি করুণার কিছু উদ্রেক হয় সেই জন্যে।

করুণা।

জনাবের ঘোষণা আমি শুনেছি। ওটা শোনার পর থেকেই আমার নিজেকে আর পরিবারকে নিয়ে আমার তামাম দুর্ভাবনা কেটে গেছে। এখন যত ভাবনা এই মেয়েটাকে নিয়ে।

কি বলতে চান আপনি?

জনাবের এজাযত পেলে রাজধানী থেকে আমি সপরিবারে আমার গ্রামের পৈতৃক ভিটেয় চলে যাবো এবং যে কয়দিন বাঁচি, সেখানেই নিরিবিলিতে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবো। কিন্তু এই মেয়েটাই এখন হয়েছে সমস্যা।

আর একটু খোলাশা করে বলুন।

মেয়েটাকে কিছুতেই কোথাও বিয়ে দিতে পারিনি। আমার যত দূর জানা আছে, জনাবের মুখ চেয়েই সে কোন বিয়েতে রাজী হয়নি। এখন তার ব্যাপারে জনাবের কোন নির্দেশ কিছু আছে কিনা–সেটা জানার অপেক্ষাতেই আছি।

সীমাহীন বিস্ময়ে অবনীনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইলো জালালউদ্দীন। এই সেই অবনীনাথ। পরিস্থিতির সাথে কি আশ্চর্যভাবে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এই ধরনের লোকেরা। কিছুকাল নীরবে চেয়ে থাকার পর জালালউদ্দীন বললো–একদিনতো আপনি আমার সাথেই তার বিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন?

জি, তা ছিলাম।

আজও যদি তাকেই আমি বিয়ে করতে চাই?

তাহলে যে মেয়ের আমার এ জীবনের তামাম সাধনা সফল হবে–এইটুকুই বলতে পারি।

আরো অধিক তাজ্জব হয়ে জালালউদ্দীন বললো আপনি বলছেন এ কথা?

জি, আমিই বলছি জনাব। মানুষ যে অদৃষ্টের দাস, তার সব কিছুই যে নিয়ন্ত্রণ করেন ওপরের ঐ একজন, আগে এতটা না ভাবলেও, আজ এটা স্বীকার আমাকে করতেই হবে।

সান্যাল মহাশয়।

মেয়ে আমার এ রাজ্যের রাণী হোক, এমন একটা আকাঙ্খা আমার মনে দুর্বার ছিল একদিন। আমার সেই আকাঙ্খাই বিধাতা যদি পূরণ করেন এইভাবে, তাহলে বিধাতা সৃষ্ট এই হেরফেরটুকু মেনে নিতে আর আপত্তি কেন থাকবে আমার? বরং জনাবের এ অনুগ্রহে ধন্যই হবো আমি।

কিন্তু আগেতো আপনাকে এমন কথা বলতে কখনও শুনিনি। আপনার এমন মানসিকতার পরিচয় কিছু পাইনি।

ঐ তো বললামই জনাব, অদৃষ্টই বলুন আর পরিস্থিতিই বলুন, মানুষ তার দাস।

www.pathagar.com

আবার কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে জালালউদ্দীন বললো–তাহলে আপনি জেনে নিন, যমুনা এখন আমার মহলে আরো অধিক অসুস্থ হয়ে আছে। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে সে যদি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তার যদি আপত্তি কিছু না থাকে, তাহলে যমুনাই হবে এ মুলুকের বেগম।

অবনীনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সুলতান তাকে গ্রহণ না করলে তাকে নিয়ে ভয়ানক একটা সমস্যাই হতো অবনীনাথের। তিনি খুশী হয়ে বললেন–পরম করুণাময় জনাবের মঙ্গল বিধান করুন।

অবনীনাথ বিদেয় হলেন।

দু'একদিনের মধ্যেই যমুনা সান্যালের শরীরের দ্রুত উন্নতি ঘটতে লগলো। তা দেখে জালালউদ্দীন নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় শাসন কার্যে মনোনিবেশ করলেন। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শাসন কার্যের পুনর্গঠন সমাপ্ত হলো এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সাথে দেশ চলতে লাগেলো।

জালালউদ্দীনের অনুরোধে বাহালুল খাঁ, রায় রাজ্যধর রায় এবং মুসীবতে সাহায্যকারী অন্যান্য তামাম ব্যক্তিবর্গ যোগ্যতানুসারে সেনাবাহিনীর ও শাহী দরবারের বিভিন্ন পদ অলংকৃত করলেন। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হলেন আরো অনেকে। শুধু তৌহিদবেগই কোন পদ পদবী গ্রহণে আদৌ সম্মত হলো না।

একদিন জালালউদ্দীন এ ব্যাপারে তৌহিদবেগকে নিয়ে বসলো এবং সিপাহ সালারের পদ গ্রহণের জন্যে তাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করতে লাগলো। তৌহিদবেগ এর জবাবে হাসি মুখে বললো–দোস্ত, সুলতানের দোস্ত হয়ে থাকাটাকেই বড় মনে করি আমি। নকরীটাকে বড় মনে করিনে।

জালালউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো–মানে।

তৌহিদ বেগ বললো–মানে এর অন্য কিছুই নয়। সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজশাহর আমল থেকে এ যাবত চরম বিপদ সংকুল পরিবেশে জান বাজী রেখে এই যে জেহাদ করেছি আমি, এর পেছনে কোন পদ–পদবী বা স্বার্থের কোন হাতছানি ছিল না। আর সেই আশাতেই এই জেহাদে ব্রতী হলে, এতটা মনোবলও কখনও আমার থাকতোনা। এই জেহাদের পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলা মুলুকে মুসলমান শাসন ফিরিয়ে আনা। আর বাংলা মুলুকে আমার কওমের হেফাজতি নিশ্চিত করা। আমার তিনকুলে কেউ নেই। অমার নিজস্ব চাহিদাও কিছু নেই। এই একটাই মাত্র এ জিন্দেগীর চাহিদা ছিল আমার। আল্লাহ পাক আমার সে চাহিদা ষোল কলায় পূরণ করে দিয়েছেন। এরপর আর কি আকাঙ্খা থাকতে পারে আমার?

শুনে জালালউদ্দীন কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তৌহিদবেগের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এরপর সে বললো–দোস্ত, তবু বেঁচে থাকার জন্যে তো একটা অবলম্বন কিছু চাই মানুষের? আর সেই জন্যেই–

তাকে থামিয়ে দিয়ে তৌহিদবেগ বললো–কাজ নিয়েই থাকবো আমি, বেকার বসে থাকবো না।

অর্থাৎ?



www.pathagar.com

আমি ফৌজী উস্তাদ হবো। আমার কওমের ঝান্ডা শক্ত হাতে ধরে রাখার মতো কিছু মজবুত হাত আমি তৈয়ার করে রেখে যাবো–এই আমার ইরাদা।

দোস্ত।

যে কয়দিন বেঁচে থাকি, আমার কওমের ছেলেদের আমি ফৌজী শিক্ষা দেয়ার একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই এবং আমার বাকী জীবনটুকু আমি আমার ঐ প্রতিষ্ঠান নিয়েই থাকতে চাই।

শুনে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ তৌহিদবেগকে আবেগে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো–মারহাবা! মারহাবা! দোস্ত, আপনি শুধু আমারই নন, আমার এই গোটা দেশ ও জাতির এক অবিস্মরণীয় গৌরব। আপনার এই ইরাদা পূরণের সর্ববিধ সহায়তা করার মওকা আমাকে দেবেন আপনি, এই প্রেক্ষিতে এই আরজটুকু বিনীতভাবে পেশ করছি আমি।

হো–হো–করে হেসে উঠে তৌহিদবেগ বললো–

মঞ্জুর!

## ২৩

সুলতান জালালউদ্দীন তাজ্জব হলো যমুনা সান্যালের আচরণে। যমুনার মান ভাঙ্গতে বিপুল সময় ব্যয় করতে হলো তাকে। তৌহিদবেগ তাজ্জব হলো। তটিনীর আচরণে। সুদূর বাঁশবাড়ি থেকে তার খোঁজে রাজপ্রাসাদে হাজির হলো তটিনী।

কয়েকদিন ধরে যাবো যাবো করেও একদিকে জালালউদ্দীন ও অন্যদিকে কাজ এই দুইয়ের চাপে তাজউদ্দীন ওরফে তৌহিদবেগের অদ্যাবধি যাওয়াই হয়নি বাঁশবাড়িতে। অথচ রাঁজা গণেশের মৃত্যু সংবাদ অনেক আগেই বাঁশবাড়িতে পৌঁছেছে। জালালউদ্দীনের মসনদ লাভ ও এখন বাসী খবর বাঁশ বাড়িতে। তবু তাজউদ্দীনের কোন খবর নেই। লড়াই জেহাদ থেমে গেছে। দেশে এখন পূর্ণ শান্তি বিরাজমান। তবু তাজউদ্দীনের এত দিনও বাঁশবাড়িতে ফিরে না আসার পেছনে কি ইতিহাস থাকতে পারে? ইদানিং আবার তৌহিদবেগের নাম ডাকে ছেয়ে গেছে গোটা দেশ। তাজউদ্দীনের নাম গন্ধও পাওয়া যায়না কারো মুখে। ব্যাপার কি?

স্বাভাবিক ভাবেই বাঁশবাড়ির বিশ্বাস পরিবার এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো। তুমুল লড়াই হয়ে গেছে জালালউদ্দীনের মসনদ প্রাপ্তির পেছনে। শত শত সৈনিকের লাশের ওপর দিয়েই মুসলমানদের এ বিজয় এসেছে। শুধু হিন্দু সেপাইই পড়েনি, অনেক মুসলমান সেপাইএর



www.pathagar.com

মাথাও গড়িয়ে পড়েছে একটার পর একটা। তটিনীকে আর থামানো যায় কোন যুক্তি দেখিয়ে?

নাছোড়বান্দা তটিনীর কারণে মুহসীন বিশ্বাসকেই রাজধানীতে আসতে হলো তটিনীর সঙ্গী হয়ে। রাজধানীর নানা স্থানে ঘুরে ফিরে দেখে, শেষ অবধি শাহী মহলের দ্বারে এসে আটকে গেল দুইজন। অপরিচিত মামুলী এক বৃদ্ধ এবং বোরকা পরা অচেনা এক আউরাতকে সদর ফটকের প্রহরীরা শাহী মহলে ঢুকতে দিতে নারাজ। নিরুপায় হয়ে মুহসীন বিশ্বাস প্রহরীদের কাছে তঁদের পরিচয় দিয়ে বললেন–বাপজানেরা, আমরা তাজউদ্দীনের লোক। তাজউদ্দীনের সাথে মোলাকাত করার ইরাদায় আমরা বাঁশবাড়ি থেকে এসেছি। মেহেরবানি করে হয় আমাদের ভেতরে যেতে দিন, নয় তাকে ডেকে দিন।

শাহী ফটকের এই প্রহরীরা নয়া আদমী। তৌহিদবেগের নাম এরা হাজার বার শুনেছে, কিন্তু তাজউদ্দীন নামের সাথে পরিচিত নয় এরা। তাদের একজন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো–কোন্ তাজউদ্দীনের? কি করে সে?

জবাবে মুহসীন বিশ্বাস বললেন–সেপাই তাজউদ্দীন। জবরদস্ত সেপাই।

হো–হো করে হেসে উঠলো প্রহরীরা। এদের আর একজন কিছুটা ব্যঙ্গ করে বললো–আরে বুঢ্ঢা, সেপাই কি একজন আছে সুলতানের? হাজার হাজার সেপাই। এর মধ্যে কার নাম তাজউদ্দীন, কোথায় সে থাকে, এ হদিস কেমন করে পাবে তুমি, আর কোথা থেকেই বা দেবো আমরা। বরং তোমরা সুলতানের সামারিক ঘাটিতে যাও সেখানে গিয়ে খোঁজ করলে পেতেও পারো তাকে।

তৃতীয় প্রহরী তার সঙ্গীর কথায় প্রতিবাদ করে বললো ঘাঁটিতে গেলেই যে খোঁজ পাবে সেই তাজউদ্দীনের, এ কথা তুমি কেমন করে বলছো? কয়দিন আগে যে তুমুলকান্ড হয়ে গেল, তাতে সে যে মারাই যায়নি, এটা বলবে কে?

একথা কানে যেতেই বোরকার তলে থর থর করে কেঁপে উঠলো তটিনী। সে মুহসীন বিশ্বাসকে বললো–না, অন্য কোথাও যাবো না। আমাদের প্রাসাদের মধ্যেই যেতে হবে। শুনেছি, সুলতানের সাথে খুবই পরিচয় ছিল তার। দরকার হলে সুলতানের সাথেই মোলাকাত করবো আমরা।

মুহসীন বিশ্বাসের হুঁশ হলো। তিনি প্রহরীদের ফের বললেন–এই যে, শুনুন। মেহেরবানি করে ভেতরেই আপনারা যেতে দিন আমাদের। খোদ সুলতানের সাথে খাতির ছিল তাজউদ্দীনের। সুলতানের কাছেই যাবো আমরা।

আবার হেসে উঠলো প্রহরীরা। এবার সত্যি সত্যিই বিগ্‌ড়ে গেল তারা। প্রথম জন বললো–যা ব্বাবা! এ বুঢ্ঢাতো সেরেফ এক দিওয়ানা আদমী দেখছি। ভাগো–ভাগো এখান থেকে। মুহসীন বিশ্বাস থতমত করে বললেন–কেন, বাবা?

আরে মিয়া একজন সেপাই এর সাথে সুলতানের খাতির ছিল–এ কথা শুনলেও তো তোমাদের কয়েদ করবে সেপাইরা। খোদ সুলতানকে নিয়ে ঠাট্টা?



www.pathagar.com

জিদ ধরলেন মুহসীন বিশ্বাস। বললেন–না বাবারা, পাগল–মাতাল যা–ই আপনারা বলুন, সত্যি সত্যিই সুলতানের সাথে দোস্তী ছিল তার। জব্বোর দস্তী।

ভড়কে গেল প্রহরীরা। বললো–মানে?

সুলতান যখন কুমার ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর সাথে খাতির ছিলো তাজউদ্দীনের।

প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। যদি ঘটনা সত্যি হয়, তাহলে তো এদের ফিরিয়ে দেয়ার অপরাধে মাথা যাবে তাদের।

এদের একজন মুহসীন বিশ্বাসকে প্রশ্ন করলো তৌহিদবেগ সাহেবের সাথে কোনো পয়পরিচয় ছিল না? জবাবে মুহসীন বিশ্বাস বললেন হ্যাঁ, হ্যাঁ–শুনেছি তাঁর সাথেও পরিচয় ছিল তার। তাঁকে পেলেও হবে।

তাহলে এক কাজ করুন। প্রাসাদের ভেতরেই যান। তবে খোদ সুলতানের মহলের দিকে না গিয়ে যুবরাজ বা শাহজাদা মহলের দিকে যান। ওখানে তৌহিদবেগ হুজুর আছেন। উনিই সব সেপাই চালিয়েছেন। আগে তাঁর কাছেই খোঁজ নিন। তিনি যদি সুলতানের কাছে যেতে দেন, তবেই যাবেন। তাছাড়া কিন্তু মারা পড়বেন, বলে দিলাম।

আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

প্রহরীদের একজন এদের সাথে করে নিয়ে গিয়ে শাহাজাদা মহলের প্রধান কক্ষের আঙ্গিনায় পৌঁছে দিয়ে এলো।

বিশাল এক মহল। দুইতলা ইমারত। সারি সারি কক্ষ। চারদিক চকচকে তকতকে। লোকজন তেমন কোন দিকে বেশী একটা নেই। নীচতলার বারান্দায় শুধু দু'একজন চাকর বাকর ঘুরছে। এদের একজনের কাছে গিয়ে তৌহিদ বেগের কথা বলতেই সে মহসীন বিশ্বাসকে বললো–ঐ যে উঠে যান ঐ সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায়। ওখানে গিয়ে যেটা সব চেয়ে বড় কক্ষ ওর ভেতরে যান। ওখানেই উনি আছেন। একাই আছেন হুজুর।

মহসীন বিশ্বাস ও তটিনী দুইজনেই অবাক হলো। এত সহজে এরা যেতে পারবে তৌহিদ বেগের কাছে, এটা কল্পনাও তারা করেনি। কিন্তু নসীবগুণে এই লোকটা ছিল আধ পাগলা ও সাদাদিলের লোক। তাই কোন চিন্তা না করে সত্য কথাটা সে সহজ ভাবেই বলে গেল।

কিন্তু মুহসীন বিশ্বাসদের চিন্তা করার অবকাশ নেই তখন। তারা মরিয়া হয়েই এসেছে। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে গেল। এখানেও কক্ষের সামনে প্রশস্ত এক বারান্দা। মাঝের কক্ষই সব চেয়ে বড় এবং সুগঠিত। ওপর তলায় উঠতেই তারা দেখলো–ঐ বড় কক্ষটির সামনে থেকে দুজন সশস্ত্র প্রহরী ব্যস্ত হয়ে পাশের কামরায় ঢুকলো। তারা বুঝে দেখলো–এইটেই তাদের মওকা। প্রহরীদের পাল্লায় পড়লে হয়তো আবার আর এক ফ্যাসাদ হবে। তাই তারা দ্রুতপদে তৌহিদবেগের কক্ষের সামনে চলে এলো।

খোলাই ছিল দুয়ার। কক্ষের মধ্যে একাইছিল তৌহিদবেগ। সে দরজার দিকে পেছন দিয়ে দেয়ালে টাঙ্গানো একটা মানচিত্র পাঠ করছিলো।

তটিনী বিশ্বাসই ব্যস্ত হয়ে আগে গেল দরজার কাছে। তাজউদ্দীনের চিন্তায় সে তখন দিশেহারা। না জানি কি সংবাদ তাকে কার কাছে শুনতে হয়। নারী সুলভ সংকোচের সে এখন



www.pathagar.com

উর্ধে। সে দরজার কাছে ছুটে এসে কক্ষের মধ্যে এক পা রেখে বললো–দোষ নেবেন না হুজুর। আপনি কি তৌহিদ বেগ সাহেব? সেপাই তাজউদ্দীনের কোন খবর দিতে পারেন হুজুর?

কণ্ঠে এবং বক্তব্যে চমকে উঠলো তৌহিদ বেগ। সে দ্রুতবেগে পেছন ফিরে দাঁড়াতেই চমকে গেল তটিনীও। সে প্রচন্ড বিস্ময়ের সাথে আওয়াজ দিলো একি! তাজউদ্দীন! আপনি! বেঁচে আছেন আপনি?

ছুটে এলো তটিনী। ছুটে এলো তৌহিদ বেগ ওরফে তাজউদ্দীনও। একই রকম বিস্মিত কণ্ঠে তৌহিদ বেগও আওয়াজ দিলো–এ্যাঁ! তটিনী, তুমি! কি তাজ্জব ব্যাপার! তুমি এখানে?

মুখের বোরকা সরিয়ে তটিনীও বিপুল বিস্ময়ে বললো –আমারও তো ঐ একই কথা– আপনি এখানে? এটা নাকি তৌহিদ বেগ সাহেবের কক্ষ?

মুচকি হেসে তৌহিদ বেগ বললো–হ্যাঁ।

তাহলে তিনি কোথায়?

এই তো তোমার সামনে।

মানে!

আমিই সেই তৌহিদ বেগ।

সে কি!!

বিস্ময়ে, বিভ্রান্তিতে, উচ্ছ্বাসে, আবেগে, থর থর কাঁপতে লাগলো তটিনী। মুহসীন বিশ্বাস দরজার ওপর হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এতক্ষণ। এ কথায় তিনিও চমকে গিয়ে বললেন– এ্যাঁ! বলো কি বাবা? তুমিই সেই তৌহিদ বেগ! বাংলার অদ্বিতীয় বাহাদুর, দেশ বরেণ্য বীর, সেই তৌহিদ বেগ তুমিই?

নতমস্তকে স্মিতহাস্যে তৌহিদ বেগ বললো–বাহাদুর কিনা জানিনে, তবে আমিই সেই তৌহিদ বেগ বড় আব্বা! দায়ে পড়েই সব পরিচয় গোপন করে গেছি। আমার সব কসুর মেহেরবানি করে মাফ করে দেবেন।

কি তাজ্জব–কি তাজ্জব–

কি জানি কি বুঝে খুশীতে অধীর হয়ে মুহসীন বিশ্বাস দরজা থেকে অন্যদিকে সরে গেলেন।

তটিনী বিশ্বাস ইতিমধ্যেই শক্ত হয়ে গেছে। নিজেকে সে সংযত করে নিয়েছে। মুহসীন বিশ্বাস সরে যেতেই সে প্রশ্ন করলো–তার মানে, বাংলার এই তামাম জেহাদের মূল ব্যক্তি যিনি, তিনি আপনি?

তৌহিদ বেগ হেসে জবাব দিলো–হ্যাঁ আমিই।

বাঁশবাড়ীর মরিয়ম বিশ্বাসের বারান্দায় যে নালায়েক আর নাদান নির্বোধ তাঁত বুনতো বসে বসে, সেই আপনি?

জি হ্যাঁ।

এক গালে সাত সাতটা চড় মারলেও 'রা' শব্দটি যার মুখ দিয়ে বেরোনোর কোন সম্ভাবনা ছিল না, সেই আপনি?



www.pathagar.com

তটিনীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগলো। তৌহিদবেগ ঐ একই ভাবে জবাব দিলো–হ্যাঁ।

ফের তটিনী প্রশ্ন করলো হাজার রকম অপমান আর লাঞ্ছনা হজম করতে যে অভ্যস্ত, সেই আপনি?

তৌহিদবেগ এবার হাসি মুখে উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলো হ্যাঁ–হ্যাঁ। বলছিই তো, আমিই সেই তৌহিদবেগ।

ফেটে পড়লো তটিনী। সে ততোধিক উচ্চকণ্ঠে বললো–প্রতারক, বেইমান, বিশ্বাস ঘাতক! আমাদের গরীব আর গেঁয়ো মানুষ পেয়ে এইভাবে আমাদের নিয়ে খেলে গেছেন এতদিন। এতই আমরা খেলার পুতুল আপনার কাছে? ছিঃ–ছিঃ–ছিঃ! এই রকম এক মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকের পেছনে বেয়াকুফের মতো ছুটে বেড়াচ্ছি আমি! ধিক আমার আকাঙ্খাকে! ধিক আমার জিন্দেগীকে। আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো তটিনী। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দ্রুত বেগে ঘুরে দাঁড়ালো সে। তা লক্ষ্য করে তৌহিদ বেগ দৌড়ে গিয়ে তটিনীকে জড়িয়ে ধরে বললো আহ্হা! এতে এত উতলা হবার কি আছে? থামো–থামো। আমার কথা শোনো।

প্রবল আপত্তির সাথে তটিনী বিশ্বাস বললো–না–না, কোন কথা আর আমি শুনবো না। ঢের আক্কেল হয়েছে আমার। মরীচিকার পেছনে আর আমি ছুটবোনা।

তটিনী বিশ্বাস প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। তৌহিদ বেগ আরো তাকে শক্ত করে বাহু বন্ধনে বেঁধে এবার শক্ত কণ্ঠে বললো–তুমি শুনতে না চাইলেও আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারিনে।

তটিনী বিশ্বাস বিস্মিত কণ্ঠে বললো–মানে?

মানে, তুমি আমার বউ।

বউ?

হ্যাঁ বউ। আমি তোমার স্বামী। তোমাকে আটকে রাখার সে অধিকার তুমি নিজেই আমাকে দিয়েছো। এসো, পাগলামী না করে ঠান্ডা মাথায় বসো। আমার সব কথা শোনো।

মানে–আপনি–

হ্যাঁ আমি। তোমার স্বামী।

এবার তৌহিদ বেগের বুকের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে তটিনী বিশ্বাস নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এরপর মুহসীন বিশ্বাসকে ডেকে নিয়ে তটিনীকে শান্ত করতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো তৌহিদ বেগের।

তটিনী বিশ্বাস শান্ত হয়ে বসতেই একজন প্রহরী এসে সালাম দিয়ে বললো–হুজুর, জনাবে আলা!

তৌহিদ বেগ মুখতুলে অবাক হয়ে বললো–জনাবে আলা মানে? সুলতান বাহাদুর?

জি হ্যাঁ।



www.pathagar.com

কোথায় তিনি?

ঐ তো–

বলতেই সুলতান জালালউদ্দীন এসে তৌহিদ বেগের দরজার ওপর দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে একজন আউরাতকে দেখতে পেয়ে জালালউদ্দীন শরমিন্দা কণ্ঠে বললো–তওবা! আমি দুঃখিত দোস্ত! না জেনে হঠাৎ এসে পড়েছি।

বলেই ঘুরে দাঁড়ালো জালালউদ্দীন। তৌহিদবেগ দৌড়ে গিয়ে জালালউদ্দীনকে আটকালো এং উল্লাসের সাথে বললো–আরে দোস্ত, খামাখা শরম পাচ্ছেন কেন? আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।

হকচকিয়ে গিয়ে জালালউদ্দীন বললো–মানে!

তাজউদ্দীন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–আপনার বন্ধুপত্নী।

এ্যাঁ! উল্লাসে চীৎকার করে জালালউদ্দীন বললো সেকি! এই ব্যাপার? আরে এত ঝামেলার মধ্যে আবার এই কর্ম করলেন কবে?

একইভাবে উচ্ছ্বাসের সাথে তৌহিদবেগ বললো–আরে দোস্ত, কম্মটা আর করা হলো কখন?

তার অর্থ?

আসল নয়, হবু।

মানে হবুপত্নী?

জি–হাঁ।

বা–বা–বা! নসীবের কি খেল! দুই দোস্তের একই দশা!

খুশীর আধিক্যে সুলতান জালালউদ্দীন প্রায় শিশুর মতো নেচেই উঠলো। এরপর নিকটে এসে সংযত হয়ে সালাম দিতেই তটিনীও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা সালাম জানালো। মহসীন বিশ্বাস উঠে এসে মোসাফাহা করলেন এবং সকলেই শান্ত হয়ে বসে পরিচয় পর্ব শেষ করে খোশদিলে খোশ আলাপে রত হলেন। আলাপের এক ফাঁকে জালালউদ্দীন এক প্রহরীকে কানে কানে বললো–যমুনা, যমুনাকে বোলাও। জল্‌দি–

আলাপ চলাকালেই পরিচারিকা বেষ্টিতা হয়ে যমুনা এসে দাঁড়ালো। যমুনাকে দেখেই তটিনীর প্রতি ইঙ্গিত করে জালালউদ্দীন বললো–এই নাও তোমার এক নতুন সঙ্গি। কোন কথা নয়, কোন প্রশ্ন নয়। ইনাকে নিয়ে সোজা খাস মহলে চলে যাও। কয়দিনের জন্যে ইনি আমাদের মেহমান। তোমার সাথেই থাকবেন।

যমুনা সান্যাল বিস্মিত নজরে তাকাতেই জালালউদ্দীন বললো–আরে ঠ্যালা। কিছুই বুঝতে পারছোনা? আমার এই দোস্তের উনি হবু। বিলকুল তোমারই মতো অবস্থা। এছাড়াও, তুমি যমুনা ইনি তটিনী।

তৌহিদ বেগ বললো–না–না, আর তটিনী নয়। এখন তহমিনা। জালালউদ্দীন লাফিয়ে উঠে বললো–তাই? তাহলে এটাও আর যমুনা নয়, আজ থেকেই জাহানারা।



www.pathagar.com

হো-হো করে হেসে উঠলো দুই বন্ধু। যমুনার মুখেও হাসি ফুটে উঠলো। সে উল্লাসে ছুটে এসে তটিনীকে জড়িয়ে ধরে বললো-দিদি-

জালালউদ্দীন হৈ-হৈ করে উঠলো। বললো-আরে, দিদি বোন্‌ডি যা-ই হোক, সবই এখন অন্দর মহলে। পয় পরিচয় সব কিছুই ওখানে। এই পুরুষ মহলে নয়।

এবার উচ্চ শব্দে হেসে উঠলেন সকলেই। যমুনা, তটিনী, মুহসীন বিশ্বাস -সবাই। কতকটা জোর করেই তটিনীকে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বিদায় হলো যমুনা।

মুহসীন বিশ্বাসের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে দুই দোস্ত ওখানেই বসে তটিনী বিশ্বাসকে ঘিরে আলাপরত হলো। কিছুক্ষণ আলাপের পর তৌহিদবেগ বললো-দোস্ত, আমি তো এখানে আর দেরী করতে পারবো না। এদের নিয়ে আগামী কালই আমাকে বাঁশবাড়ি রওনা হতে হবে।

প্রবল আপত্তি করে জালালউদদীন বললো-তা কি করে হবে। এতবড় একটা জয়ের পর উৎসব করতে হবে না একটা? মগজে আমার একটা মস্তবড় পরিকল্পনা আছে। সেটা বাস্তবায়নের পর তবেই আপনার ছুটি।

পরিকল্পনা মানে?

একটা মহোৎসব করবো আমি। ঐ মহোৎসবে একদিকে একটা ব্রত উদযাপন করা হবে, অন্যদিকে এই হবু সমস্যার সমাধান করা হবে। এই না-জায়েজ অবস্থা তো অধিক কাল চলতে দেয়া যায় না।

তৌহিদ বেগ হেসে বললো-তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু ঐ ব্রত? ব্রতটা কি?

ব্রত একটা ব্রত। ভুলে যাচ্ছেন কেন, রাজা গণেশের আমি বাচ্চা। বাপ করেছেন সুবর্ণধেনু ব্রত। বাচ্চা তার তেমনি একটা ব্রত উদযাপন না করলে নাম থাকে বাপের?

অর্থাৎ?

আমার এ ব্রতও ধেনু সংক্রান্ত ব্রত। বাপ ছিলেন বড় লোক। তাই সোনার গরু দিয়ে তিনি ব্রত উদযাপন করে গেছেন। আমি তো আর বড়লোক নই। আমি প্রজার অর্থের আমানতদার। তাই আমি মামুলি ঐ আসল গরু দিয়েই এই ব্রত উদযাপন করবো। আমার এই ব্রতের পুরোহিত থাকবে পাকুরতলার ঐ বিশিষ্ট দশ বামুন।

অতঃপর তৌহিদবেগকে তার পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে দিয়ে বললো-বেশী সময় একান্তই যদি দিতে না পারেন, অন্তত দু'তিনটে দিন সময় আমাকে দিতেই হবে এর জন্যে।

তোহিদ বেগ বললো-তাহলে দোস্ত, ঐ তিনদিনই মঞ্জুর এর অধিক কিন্তু নয়।

www.pathagar.com

# ২৪

শাহী প্রাসাদে ধুম পড়ে গেল। জোরদার ভাবে চলতে লাগলো উৎসবের আয়োজন। পাত্রমিত্র, সভাসদ ও রাজধানীর গণ্যমান্য সবাইকে দাওয়াত করা হলো। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে ব্রত উদযাপন, দ্বিতীয় দিনে বিয়ে। সাজ সাজ রব উঠলো চারদিকে। শাহীমহলকে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত করা হলো। হরেক রকম বাজী ও রং তামাসার ব্যবস্থা করা হলো। তিন দিন পর জাকজমক ও মহা সমারোহে শুরু হলো অনুষ্ঠান।

প্রথম দিনে ব্রত। শাহী মহলের বাহির আঙ্গিনায় ব্রতের আয়োজন করা হলো। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পাকুড়তলায় ঐ দশ বামুন। ঐ বামুনদের দাওয়াত করে আনার জন্যে আগের দিনই একদল সেপাইয়ের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল– সসম্মানে না এলে বেঁধেই আনতে হবে তাদের। যে ভাবেই হোক, অনুষ্ঠানে তাদের হাজির করা চাই–ই–

আগের দিন সাঁঝওয়াক্তে এই বাহিনী বিদায় হতে গেলে, ঐ এলাকাতেই অন্য একটা জরুরী কাজ দেখা দেয়ায় তাদেরকে ঐ কাজটিও সেরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়।

ঐ বাহিনী বিদেয় হওয়ার খানিক পরেই জালালউদ্দীন চিন্তা করলো–প্রথম কাজটি শেষ করে ঐ ব্রাহ্মণদের আনতে যদি বিলম্ব করে সেপাইরা, তাহলে তো পণ্ড হবে ব্রত তার। এই চিন্তা মাথায় আসতেই সে আবার আর একদল সেপাইকে পাকুড়তলায় ঐ দশ বামুনকে আনার জন্যে তাদের সঠিক ঠিকানা দিয়ে প্রেরণ করলো।

সকাল থেকেই শুরু হলো অনুষ্ঠান। ব্রত মঞ্চ নানা সাজে সজ্জিত করা হলো। মঞ্চের নীচে দশদশ খানা আসন স্থাপন করা হলো। মঞ্চের সামনে সাত সাতটা লালচে রংএর হৃষ্টপুষ্ট গাভী এনে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। এক প্রহর বেলার কালে ঐ দশ বামুনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রত মঞ্চের সামনে এসে হাজির হলো সেপাইরা।

সুলতান জালাউদ্দীন মঞ্চের পাশেই ছিল। সে নিজে এসে বামুনদের অভ্যর্থনা জানালো এবং তাদের সমাদর করে নিয়ে গিয়ে ঐ দশ আসনে বসিয়ে দিলো। ব্যাপার কিছু অনুধাবন করতে না পেরে ভোলা ভট্টাচার্য বললেন–জনাব আমাদের কি জন্যে ডেকে এনেছেন এখানে সেতো কিছুই বুঝলাম না?

জালালউদ্দীন বিনয়ের সাথে বললো–ব্রত উদযাপনের কারণে ঠাকুর। ধেনু সংক্রান্ত ব্রত। এদেশে এ ব্রত উদযাপনের রীতিনীতি আপনারা ছাড়া আর কেউতো জানে না, তাই বাধ্য হয়েই এই তকলিফটুকু দিতে হলো আপনাদের।



www.pathagar.com

ভোলা ভট্টাচার্য বললেন–মানে?

জালালউদ্দীন বললো–মানে, আমার পিতার আমলে সুবর্ণ ধেনু ব্রতটা আপনাদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়েছে। আপনারাই তার পৌরোহিত্য করেছেন। আমার এই ব্রতটা তাই আপনাদের মাধ্যমেই উদযাপন করতে চাই আমি।

কিন্তু–

সামান্য একটু হেরফের এখানে আছে বটে। আমার পিতার গরু ছিল খাঁটি সোনার। আমার গরুগুলো জীবন্ত। সোনালী রংএরও পাইনি। তাই এই লালচে রংএর যোগাড় করেছি।

কিন্তু আমাদের কি করতে হবে এ ব্রতে?

আপাতত কিছুই নয়। আপনারা সেরেফ বসে থেকে দেখবেন সব। পরে যা করার তা আমিই বলে দেবো। কিন্তু হুশিয়ার, একপাও কেউ এখান থেকে নড়বেন না। নড়ার চেষ্টা করলে, চারদিকে লক্ষ্য করে দেখুন মউত আপনাদের সুনিশ্চিত।

বামুনেরা সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে নজর দিয়ে দেখলো–নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তাদের ঘিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতাধিক সেপাই।

এরপর শুরু হলো ব্রতের ক্রিয়া। ঐ বামুনদের সামনে ঐ সাত সাতটা গরু ওখানেই জবেহ্ করা হলো, গোস্ত বানানো হলো এবং ওখানেই ওদের সামনে রান্না–পাক সম্পন্ন করা হলো।

রান্না শেষে বড় বড় দশ দশখানা থালা এনে বামুনদের সামনে দেয়া হলো এবং অন্নের সাথে থালাগুলিতে ঐ গরুর গোস্ত পরিবেশন করা হলো। এসব দেখে হতবুদ্ধি বামুনেরা উচ্চে স্বরে রাম রাম করতে লাগলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে ফের জালালউদ্দীন এসে তাঁদের সামনে দাঁড়লো। সে বামুনদের উদ্দেশ্য করে বললো–শুধু মন্ত্র পাঠেই তো ব্রত উদযাপন হয়না। ক্রিয়াও কিছু করতে হয় সেই সাথে। এবার আপনাদের সেই ক্রিয়া সম্পাদনের পালা।

ভোলা ভট্টাচার্য বললো–কি ক্রিয়া করবো আমরা?

খাবেন। আপনাদের সামনে দেয়া খাদ্যগুলো ভক্ষণ করবেন আপনারা।

বামুনেরা তাজ্জব হয়ে প্রশ্ন করলেন–এই গোমাংস?

হ্যাঁ গোমাংস। না ঠিক গোমাংস নয়, বলুন, গো–অংশ।

রাম–রাম–রাম। হুজুর, এ জুলুম?

জুলুম তো নয়। আপনাদের সম্মানে আপনাদের আমি প্রণামী দিচ্ছি এই গো–অংশ।

মানে!

মানে গরুর অংশ অর্থাৎ গরুর ভাগ নিতে তো আপনারা খুব পছন্দ করেন। অন্য কথায়, গরুর ভাগ নিতে আপনারা সিদ্ধহস্ত। সোনার গরুর ভাগ নেবেন আর আসল গরুর ভাগ নেবেন না, তা কি হয়?

হুজুর!



www.pathagar.com

সোনার ভাগ বস্তায় করে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এগুলো তো আর বস্তায় নেয়ার জিনিস নয়, উদরে নেয়ার জিনিস। কাজেই উদরে করেই নিয়ে যান এই গো-অংশ।

ব্রাহ্মণেরা ইতস্তত করতে লাগলেন। জালালউদ্দীন হুংকার দিয়ে সেপাইদের বললো-এই শুন, স্বেচ্ছায় যদি উদরে এরা না তোলে এগুলো, এদের উদর কেটে তার মধ্যে এই গোমাংস গুলো পুরে দাও।

সংগে সংগে খোলা তলোয়ার হাতে এক একজন বামুনকে ঘিরে চার চারজন সেপাই এস দাঁড়ালো। তারা অস্ত্র বাগিয়ে ধরতেই ব্রাহ্মণেরা চীৎকার করে বললো-দোহাই হুজুর। প্রাণে মারবেন না আমদের। এই যে এক্ষুণি আমরা খাচ্ছি।

বলেই তারা গপাগপ্ গিলতে লাগলো গোমাংস।

সুলতান এবার বললেন-এই হলো স্বার্থান্বেষী ভন্ডদের উপযুক্ত শাস্তি।

কিন্তু বামুনদের আর এখন কোন দিকেই কান নেই। আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা এক ধারছে মাংস ভক্ষণ করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখে ক্লিষ্ট হাসি হেসে জালালউদ্দীন ওখান থেকে চলে গেল।

ঠিক এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা অঘটন ঘটে গেল। পাকুড়তলার বামুনদের আনার ভার প্রথম যে সেপাইদলকে দেয়া ছিল, ঠিক এই মুহূর্তে তারা মহাদেব চক্রবর্তীকে এনে হাজির করলো সেখানে।

ত্রিহুতরাজ দেব সিংহের এজাবত নিয়ে রাজা গণেশের মৃত্যুর কয়দিন আগে রাজগুরু মহাদেব চক্রবর্তী বাংলা মুলুকে এসেছিলেন জরুরী এক কাজে। এখন অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। ভিন দেশে থাকার আর ইচ্ছে তাঁর ছিল না। এ মর্মে ত্রিহুতরাজকে কিছুটা আভাসও তিনি আসার আগে দিয়েছিলেন। নিজ ভিটেয় টোল-চতুষ্পাঠী নিয়ে বাকী জীবন কটিয়ে দেবেন-এই কথা যখন ভাবছিলেন, ঠিক তখনই নিহত হলেন গণেশ। এতে তিনি শংকায় পড়ে গেলেন। এ দেশের গতি অবস্থা আবার কোন দিকে ধাবিত হয়-তাঁর পক্ষে এদেশে থাকা সমুচিত হবে কিনা-এসব কিছু লক্ষ্য করে দেখছিলেন। এমন সময় তাঁকে ধরে আনলো সুলতানের সেপাইদল!

পাকুড়তলার বামুনদের আনার ভার এদের ওপরই সর্ব প্রথম দেয়া হয়। দ্বিতীয় দল গিয়ে যে ইতিমধ্যেই নিয়ে এসেছে বামুনদের , এরা তা জানতো না। পথের কাজ শেষ করতে তাদের কিছু বিলম্ব হয়। এরপর তারা পাকুড়তলায় গিয়ে ময়-মুরুব্বী গোছের তেমন কোন বামুন খুঁজে পায় না। এমন সময় তাদের নজরে পড়নে মহাদেব চক্রবর্তী। সুলতান এখানকার বামুন চান। কেন চান-তারা তা জানে না। তাই, নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল, বিবেচনায়-মহাদেব চক্রবর্তীকেই তুলে আনে তারা।

মহাদেব চক্রবর্তী হাজির হলেন যখন, তখন পাকুড়তলার বামুনেরা গোমাংস ভোজনে ব্যতিব্যস্ত আছেন। ওগুলো তারা কি খাচ্ছে-জনৈক কর্মকর্তাকে তিনি তা জিজ্ঞাসা করলে, কর্মকর্তাটি উত্তর দিলেন-গোমাংস।



www.pathagar.com

মহাদেব চক্রবর্তী চমকে উঠে রাম রাম করতে লাগলেন। এরপর আবার প্রশ্ন করলেন–স্বেচ্ছায় খাচ্ছে তারা?

উত্তর এলো–না, সুলতান তাদের ধরে এনে খাওয়াচ্ছেন।

উত্তর শুনে চক্রবর্তী মহাশয় রীতিমতো আতংকিত হয়ে উঠলেন। তাকেও তো ধরে আনাই হয়েছে। তবে কি এই জন্যে? এবার তিনি দৌড় দিয়ে পালাবেন, না কি করবেন, কিছুই স্থির করতে না পেরে ছটফট করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর সামনে এলো তৌহিদবেগ ওরফে তাজউদ্দীন। তাকে দেখেই চক্রবর্তী মহাশয় ছুটে গেলেন তার কাছে এবং তৌহিদবেগকে একরকম জড়িয়ে ধরেই বললেন–এই যে বাবা তাজউদ্দীন। একি জুলুম!

মহাদেব চক্রবর্তীকে এ সময়ে এখানে দেখে তৌহিদবেগ যারপরনাই তাজ্জব বনে গেলো। বললো–জুলুম।

হিন্দুদের এইভাবে জোর করে ধরে এনে মুসলমান বানাচ্ছেন আপনারা?

তৌহিদবেগ হেসে উঠে বললো–ও! ওদের ঐ অবস্থায় দেখে এ কথা বলছেন? ওরা ঐ সেই স্বর্ণলোভী বামুনেরা। ঐ দশজন বাদে এখানে এমনটি আর কাউকেই খুঁজে পাবেন না।

মানে?

মানে, অন্য কোন হিন্দুকেই আনা হয়নি এখানে। আর এভাবে মুসলমান বানানোর কোন দুর্মতি বা প্রবৃত্তি সুলতানের বা এই হুকুমাতের কোন লোকেরই নেই। আপনি সর্বত্র যাচাই করে দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা।

সত্যিই কি তাই?

আমাকে তো অন্তত চেনেন আপনি। আমি বেইমানী করি না।

মহাদেব চক্রবর্তী এবার আশ্বস্ত হয়ে বললেন–হ্যাঁ, তাতো জানি। কিন্তু আমাকে তাহলে ধরে আনা হলো কেন এখানে?

কি আশ্চর্য! আমি সেইটেই তো তাজ্জব হয়ে ভাবছি।

সঙ্গে সঙ্গে তৌহিদবেগ খোঁজ নিলো ব্যাপারটার। খোঁজ নিয়ে জানলো–এই মারাত্মক ভুল সেপাইরা করেছে।

তৌহিদবেগের হুকুমে তৎক্ষণাৎ ঐ সেপাইদের ধরে আনা হলো এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের পায়ে ধরে ক্ষমা নেয়ানো হলো। এরপর তৌহিদবেগ চক্রবর্তীকে সমাদরে নিয়ে গিয়ে মেহমান খানায় বসালো এবং বামুন ঠাকুর ডেকে চক্রবর্তীর আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলো।

ইত্যবসরে পরস্পর আলাপ আলোচনার মাঝে তৌহিদবেগ চক্রবর্তীর মনের তামাম সংশয় বিদূরিত করলো এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের হঠাৎ এই বাংলা মুলুকে আসার প্রসঙ্গাদি সম্বন্ধেও অবহিত হলো। আলাপ–আলোচনা অন্তে চক্রবর্তী মহাশয় বললেন –এদেশে থাকার ইচ্ছেটাই ছিলনা আমার। আপনার সাথে আলাপ করে ফের থাকার ইচ্ছেই হচ্ছে। কিন্তু আপনার মতো এতটা সুন্দর মনমানসিকতা যদি আপনাদের সুলতানের না থাকে, তাহলে আবার ফ্যাসাদ কিছু হয় কিনা, এ সংশয়টা থেকেই যাচ্ছে মনে।



www.pathagar.com

তৌহিদবেগ এ সম্বন্ধেও তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললো– এ শংকাও আপনার বিলকুল অমূলক। সুলতানকে এখনও দেশের লোক ঠিকমতো জানে না। যখন সবাই জানবে, তখন তার নির্মল মানসিকতা দেখে দেশবাসী সকলে তাজ্জবই হবে রীতিমতো–এ আশ্বাসও আপনাকে দিতে পারি আমি।

কথোপোকথন শেষ করে চক্রবর্তীকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে এলো তৌহিদবেগ।

তৌহিদবেগ বেরিয়ে এসে সুলতান জালালউদ্দীনকে ঘটনাটি জানালো এবং চক্রবর্তীর মনের শংকার কথাও বললো। শুনে জালালউদ্দীন গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো–এ শংকা যদি কারো মনে আসে তাহলে সে দোষ তার নয়। সে দোষ সুলতানের আর সুলতানের প্রশাসন যন্ত্রের। সুলতানের মানসিকতা আর প্রশাসন যন্ত্রের প্রক্রিয়া যদি কারো দিলে শংকার সৃষ্টি করে, তাহলে শংকিত তো হবেই দেশের মানুষ।

তৌহিদবেগ বললো–না, মহাদেব চক্রবর্তীর শংকা এসেছে পাকুরতলার বামুনদের ঐ দশা দেখে।

উত্তরে জালালউদ্দীন বললো–ইনাদের কথা আলাদা। তবে সার্বিক কথা–যা বললাম তাই–ই।

বিশ্রামাদির পর মহাদেব চক্রবর্তী বিদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তাঁর তদবীরে নিয়োজিত অনুচরদের একজন বললো–মহাশয়, আপনার যাবার তামাম ব্যবস্থা সুলতান বাহাদুর নিজে করে রেখেছেন।

চক্রবর্তী বিস্মিত হয়ে বললেন–কি রকম?

অনুচরটি বললো–সুলতানের লোকের ভুলের জন্যে আপনাকে এই তক্‌লিফ পেতে হয়েছে। তাই যেতে যাতে আপনার আর কোন তকলিফ না হয়, সে জন্যে তিনি আগে থেকেই পাল্‌কী প্রস্তুত রেখেছেন।

বলো কি!

সেই সাথে তিনি জানিয়েছেন, আপনার বিদায়ের আগে তিনি দুটো কথা বলবেন আপনার সাথে।

আমার সাথে?

জি–হ্যাঁ। আগেই উনি আসতেন। কিন্তু আপনি বিশ্রামে ছিলেন বলেই আপনাকে উনি বিরক্ত করতে আসেননি। এখন আপনি এজাযত দিলেই, সুলতানকে আমরা খবর দিতে পারি।

তার মানে! খোদ সুলতান আসবেন আমার সাথে দেখা করতে?

আমাকে ডেকে পাঠালেই তো ধন্য হতাম আমি।

তা কি করে হয়? আপনি যে তাঁর মেহমান। আপনি আপনার গৃহে থাকলে বা এখানে তাঁর মেহমান হয়ে না থাকলে, অবশ্যই ডেকেই উনি পাঠাতেন। কিন্তু কোন মেহমানকে যে ডেকে পাঠানো বেয়াদবী।



www.pathagar.com

শুনে মহাদেব চক্রবর্তী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন–আমি যদি নিজে যাই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে, তাহলে কি রুষ্ট হবেন উনি?

না, তা'হবেন কেন? আপনি স্বেচ্ছায় গেলেতো আর তাঁর বেয়াদবী হলো না। তা ছাড়া, উনি এখন অবসরই আছেন।

কোথায় আছেন উনি?

তৌহিদবেগ সাহেবের ঘরে বসে দুই জনে আলাপ করছেন।

তৌহিদবেগ।

ঐ যে, যিনি আপনার সাথে সাথেই ছিলেন এতক্ষণ।

উনি তো তাজউদ্দীন।

উনিই তৌহিদবেগ।

তাজ্জব!

আপনার বিশ্রামের পর উনারা দুইজনই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে, অপেক্ষা করছেন ওখানে।

সে কি! চলো–চলো–

অনুচরদের সাথে মহাদেব চক্রবর্তী তৌহিদবেগের দুয়ারে এস দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই তৌহিদবেগ বললো–এই সেই চক্রবর্তী মহাশয়।

শুনে জালালউদ্দীন নিজে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো এবং সমাদরে তাঁকে সামনের একটি আসনে বসিয়ে দিয়ে নিজেও আসন গ্রহণ করলো। এরপর জালালউদ্দীন বললো–আমি আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। তবু মহাশয়ের সাথে দুটো কথা বলার তাকিদে আমি অপেক্ষা করে আছি।

চক্রবর্তী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন–জনাবের অশেষ কৃপা। বলুন কি সে কথা?

জালালউদ্দীন বললো–মহাশয়, প্রথমেই আমি আমার লোকদের কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওরা নাদান লোক, অদ্না আদমী। না বুঝে মারাত্মক এক অন্যায় করে ফেলেছে। ওদের আপনি মেহেরবানি করে ক্ষমা করলে আমি প্রীত হবো।

চক্রবর্তী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন–না–না, একি বলছেন জনাব। প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে আমি বুঝেছি এটা স্রেফ একটা ভুল। ভুল মানুষই করে। এটা বুঝতে পেরেই ওদের আমি অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এটা নিয়ে জনাব ফের ব্যস্ত হলে আমারই নিদারুণ লজ্জার ব্যাপার হয় সেটা। জালালউদ্দীন বললো–আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য হলাম। আপনার যাবার মুহূর্তে আমি আর একটা কথা বলতে চাই–যদি কিছু মনে আপনি না করেন।

আদৌ নয় আদৌ নয়। কৃপা করে বলুন।

আমার সময় খুবই কম। ব্যস্ত আছি খুবই। আর তাই এত সত্বর যেতে দিচ্ছি আপনাকে। নইলে দু'একদিন মেহমানদারী করার সুযোগ না দিয়ে যেতে আপনাকে দিতাম না।

জনাব দরাজ দিল।



www.pathagar.com

মহাশয়, বন্ধুবর এই তৌহিদবেগের কাছে আমি আপনার পান্ডিত্য, সততা, এবং সর্বোপরি আপনার সদাচরণ ও সদাশয়তার এন্তার তারিফ শুনেছি। আপনার মতো মানুষ যে কোন দেশেরই গৌরব।

মহাদেব চক্রবর্তী এ কথায় চঞ্চল হয়ে উঠতে গেলেন। জালালউদ্দীন তাঁকে হাত ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন-পাকুড়তলার ব্রাহ্মণদের প্রতি আমার আচরণ দেখে আপনি শংকিত হয়ে পড়েছেন। পাকুড়তলার বামুনদের আমি তাদের কৃত অপরাধের সাজা দিয়েছি মাত্র, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের ওপর ইসলাম চাপাতে যাইনি। জোর করে ইসলাম প্রচার হয় না বা তা করাও হয় না কখনও। কোন ধর্মই কারো ওপর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়ার আর এক নাম জুলুম। জুলুমকারীকে আল্লাহপাক কখনও পছন্দ করেন না। আমার জন্মদাতা রাজা গণেশ হিন্দু ছিলেন। কোন হিন্দুর পক্ষে বাংলার মসনদে বসাটা দোষের নয়। কিন্তু কোন রাজা বা সুলতান যদি মনে করেন, তাঁর রাজ্যে তাঁর ধর্মের লোকেরাই শুধু থাকবে এবং অন্যদের হত্যা করে বা ধর্মান্তরিত করে অন্যধর্ম দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে, তাহলে তা শুধু জুলুমই নয়, মনুষ্যত্বের বিরোধী এক জঘন্য অপরাধ। এদের ওপর আল্লাহর লানত নামবেই। রাজা যে কোন ধর্মের লোকই হোননা কেন, ভিন্ন ধর্মের প্রতি তাঁর ঈর্ষা, দ্বেষ বা ক্রোধ থাকলে চলবে না। ভিন্ন ধর্মের লোকদের হেফাজত করা রাজারই দায়িত্ব। জুলুম তো দূরের কথা, বিধর্মীদের হেফাজত করার কঠোর নির্দেশ দীন ইসলামে বিদ্যমান।

জালালউদ্দীন একটু থামলো। তারপর ফের বললো-আপনি জ্ঞানী-গুণী-পন্ডিত ব্যক্তি। আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন নিজ ধর্মই যারা ভাল বোঝে না, দৃষ্টি যাদের সংকীর্ণ, নিজের ধর্মের প্রতিই যাদের আস্থা নেই অন্তরে, পরধর্মের প্রতি হিংসুটে হয় তারাই। অন্তর যার কলুষিত, কোন ধর্মেরই সে যোগ্য নয় এবং কোন ধর্মই তার ধর্ম নয়। রুচি যাদের ঘৃণ্য, দিল যাদের অপবিত্র, যারা স্বার্থান্বেষী, বেইমান, আপনপর কোন ধর্মের প্রতিই তাদের কোন শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। আর সে কারণে যে কোন ধর্মের প্রতিই তারা নির্মম হতে ইতস্তত বোধ করে না। কোন্ ধর্ম ঠিক-অঠিক, সেটা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু মানুষ আর মনুষত্ব নিয়ে তো কোন প্রশ্ন নেই। আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের প্রতি কোন ইমানদার জিদের বশে অন্যায় ভাবে নৃশংস হতে পারে না। স্বার্থান্বেষী গাদ্দার একজন মুসলমান এবং পাকুড়তলার ঐ বামুনদের মতো স্বার্থান্ধ আর মতলববাজ একজন ব্রাহ্মণ-এই দুইয়ের মধ্যে তিল পরিমাণ প্রভেদ নেই। এরা না ধর্ম, না দেশ, কারো জন্যেই গৌরবের কিছু নয়। এরা স্রেফ দেশ ও ধর্মের দুষ্টক্ষত।

আবার থামলো সুলতান জালালউদ্দীন। তৌহিদবেগ ও মহাদেব চক্রবর্তী উভয়েই তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন জালালউদ্দীনের প্রাণস্পর্শী উক্তিগুলো। যেন দম ফেলার কথাটাও ভুলে গেছেন তাঁরা।

দম নিয়ে জালালউদ্দীন ফের বললো-আপনার কাছে আমার আরজ, আপনি আপনার স্বদেশেই থাকুন। আপনার মত সদাশয় লোক সব দেশেরই অহংকার। আপনি থাকলে বাংলা মুলুকের গৌরবটাই বৃদ্ধি পাবে। অনিষ্ট কিছু হবে না। ইসলাম কবুল করা না করা একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনায় কেউ ইসলাম কবুল করলে তাকে খোশ



www.pathagar.com

আমদেদ জানানোর যেমন রেওয়াজ আছে, তেমনি কেউ তা না করলে তার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়াও ফের ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। তাছাড়া যে কোন ধর্মের লোকই হোক না কেন, কোন সদাশয় ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে না হয়, তার অবমাননা যে করে, সে আশরাফ-উল-মুখলুকাতের গোত্রভূক্ত নয়। তার একমাত্র পরিচয় সে দুরাচার।

আপনাকে আমি এ আশ্বাস দিচ্ছি, আপনি এদেশে থাকলে অবশ্যই দেখবেন, বাংলা মুলুকের তখ্‌তে বর্তমানে যে উপবিষ্ট, সে আর যা-ই হোক, অন্তত বেইমান বা দুরাচার নয় কোনক্রমেই।

জালালউদ্দীন নীরব হলো। মহাদেব চক্রবর্তীর অন্তর অমৃতের স্পর্শে সিক্ত হয়ে গেল। এক আসমানী জ্যোঃতির সুনিবিড় স্পর্শে তাঁর মুখমন্ডল হয়ে উঠলো জ্যোতির্ময়। তিনি বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দিল ঢেলে বললেন-পরম করুণাময়ের অপার করুণা জনাবের ওপর অঝরে বর্ষিত হোক।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুস্তাফিজ

www.pathagar.com

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ-বিন-বখ্‌তিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয় (১২০৩ খৃঃ) থেকে দাউদ খান কাররানীর রাজমহলের যুদ্ধ (১৫৭৬ খৃঃ) বাংলা মুলুকের পৌনে চারশো বছরের ইতিহাস। গৌড়-পাণ্ডুয়া- তান্ডার মুসলমান শাসনের এক অবিস্মরণীয় ও ঐতিহ্যময় ইতিহাস। সাধারণের কাছে এ ইতিহাস আজও প্রায় অন্ধকারে। এই সময়ের মধ্যে এই বাঙ্গালা মুলুকের ইতিহাসে এত বিচিত্র ঘটনাবলী আছে, যা নিয়ে অসংখ্য কাব্য, মহাকাব্য ও গল্প-উপন্যাস হতে পারে এবং যা হলে এই সময়ের ইতিহাস সহজেই জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আসতে পারে।

এমনই এক বোধ নিয়ে লেখক আপাতত সাতখানা উপন্যাসের মাধ্যমে এই পৌনে চারশো বছরের ইতিহাসকে যথাসাধ্য জনগণের নাগালের মধ্যে আনার কাজে হাত দিয়েছেন। এখন তার এই সাতখানা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সিরিজটি লেখাও প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'বখতিয়ারের তলোয়ার,' 'গৌড় থেকে সোনার গাঁ,' 'যায় বেলা অবেলায়,' 'বিদ্রোহী জাতক', 'বার পাইকার দুর্গ,' 'রাজবিহঙ্গ', শেষ প্রহরী'। উল্লেখ্য, এই উপন্যাসগুলো প্রত্যেকটিই এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস। কোনটাই কোনটার অবশিষ্ট অংশ নয়।

অন্যগুলোর মতো 'বিদ্রোহী জাতক'ও উপন্যাস, ইতিহাস নয়। ইতিহাসের নিস্তব্ধতাকে কল্পনা দিয়ে সরব করতে হয়েছে। তবে কল্পনা পৃথক থেকে উপন্যাসের চাহিদাটুকুই পূরণ করেছে শুধু, ইতিহাসের মধ্যে তাকে আদৌ ঢোকানো হয়নি বা ঐতিহাসিক সত্যকে ক্ষুণ্ন করা হয়নি।